নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৯২০

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে)। বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪ সালে)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদক মণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) : ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা-পরিষদ সম্পাদিত নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (চতুর্থ খণ্ড) : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪/২৫শে মে ২০০৭। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮/মে ২০১১। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ সেল], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), NAZRUL RACHANABALI, Central Board for the development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively). Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993. Nazrul Birth Centenary edition [Vol. IV] : May 2007. First Reprint (Birth Centenary edition) : May 2011. Published by Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price : Taka 200.00 only.

ISBN 948-07-4928-5

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত (১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সংগীতকাররূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব সুগুছালো মানুষ ছিলেন না। ফলে জীবিতকালে তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল ; তার তুলনায় অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছিল অনেক বেশি। গত অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে সেসব রচনা নানা রূপে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের মত একজন কবির রচনাবলীর প্রকাশ আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার কারণে সে-দায়িত্ব আমাদের আরও বেশি। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এ-দায়িত্ব পালনেরও সূচনা।

এরই ফল নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০)। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কাব্যগ্রন্থ চক্রবাক, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা ; অনুবাদ-কবিতা রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, গীতি সংকলন চন্দ্রবিন্দু, সুরসাকী, জুলফিকার ; গীতিনাট্য আলেয়া ও শিউলিমালা গল্পগ্রন্থ।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, ভাষাবিদ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪ ॥ ২৫শে মে ২০০৭

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে এবং এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিক-বার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি

নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ চতুর্থ খণ্ডে চক্রবাক, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, চন্দ্রবিন্দু, সুরসাকী, জুলফিকার, আলেয়া, শিউলিমালা গ্রন্থ সংকলিত হলো। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একাধিক খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বই এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন'। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা

একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব মঈনুল হাসান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪ ।। ২৫শে মে ২০০৭

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

নজরুল-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্ত খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল ; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ['কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোন গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয় ; তারপর তাঁর যে-সকল রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে ; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন ?

নজরুলের কবি-জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয় ;
নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়। ...
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয় ;
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয় !
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি না ক, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি !
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি ?
চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি ?

কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ;
সে-প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার অহ্লাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ-সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস-রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,— —সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্ম সংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন-রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য-বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাঙলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুঙ্কারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম-কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া ncopaganism-এর সাহায্য-গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত nco-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudopaganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি-আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথয় প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ-প্যাগান নন, তিনি কখনও কখনও কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের অনুপ্রাণিত ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে পড়েছেন pseudo-pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি-বেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত

রয়ে গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও প্রেম-বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। নজরুল-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবীদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএবি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি-লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকা — আবদুল কাদির

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্ম-বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *নজরুল-রচনাবলী* পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু *নজরুল-রচনাবলী* সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত *নজরুল-রচনাবলী*রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

নজরুল-রচনাবলী পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত *নজরুল-রচনাবলীর* বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে *নজরুল-রচনাবলীর* সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে *অগ্নি-বীণার* পরে *বিষের বাঁশী* এবং তারপরে *দোলন-চাঁপা* বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে *অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, বিষের বাঁশী*। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে *রচনাবলী*তে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, *সঙ্গীতাঞ্জলি, সন্ধ্যামণি, নবরাগমালিকা*। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন *বিষের বাঁশী* কিংবা *পূবের হাওয়া।* তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন *সর্বহারা*। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ *সঞ্চিতা* এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে *সঞ্চিতার* প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. *মক্তব-সাহিত্য* বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় *রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে *মক্তব-সাহিত্যের* উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

নজরুল-রচনাবলীর সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

নজরুল-রচনাবলীর সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা *নজরুল-রচনাবলীর* আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০।। ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

কবিতা

গান

ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের স্বাক্ষরযুক্ত ছবি
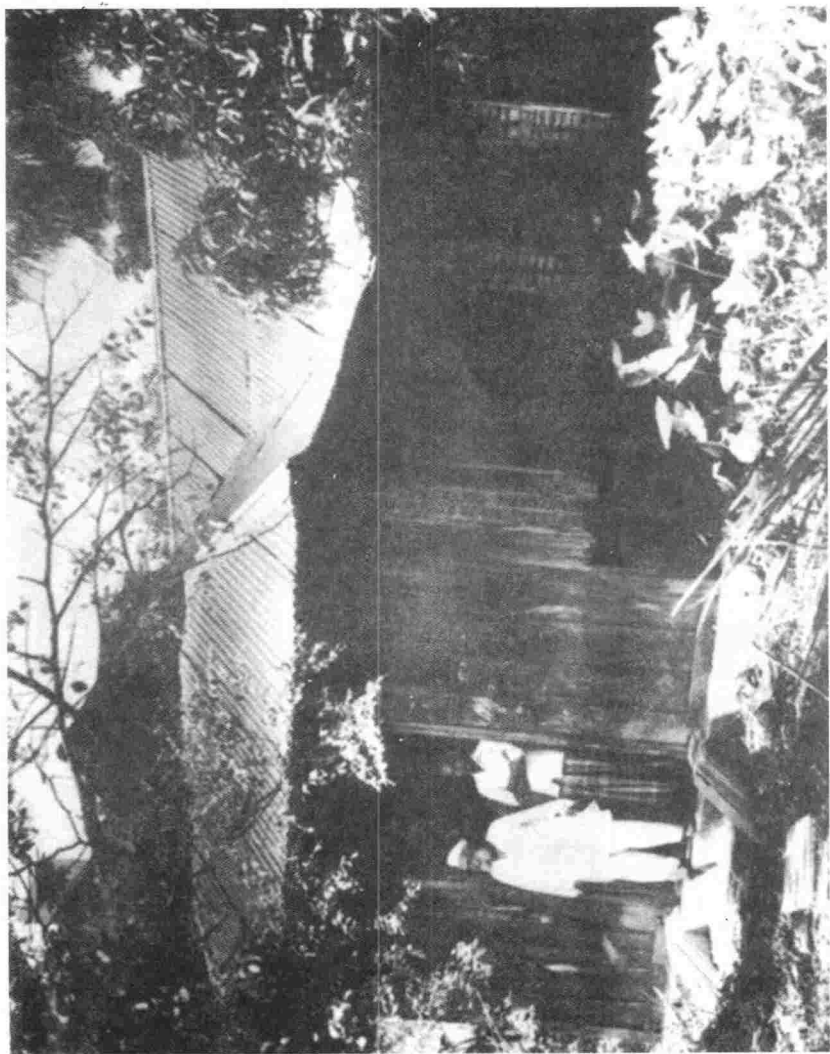
চট্টগ্রামের আজীজ মঞ্জিল : নজরুল, হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন্নাহার মাহমুদের স্মৃতি বিজড়িত। (১৯৮৫ সালে তোলা ছবি)

আমার এই লেখাগুলি— আমার আদরের—
ভাই-বোন বাহার ও নাহার কে
দিলাম।

কে তোমাদের ভালো?
বাহার আন গুলশানে গুল্, নাহার আন আলো।
বাহার এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান!
তোমরা দুটী ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটী বোঁটায় ফুটেছিলি এসে — নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের, নাগাল পেল বাণী,—
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

নজরুল ইসলাম

চট্টলা—
২১-৭-২৬

(৩২)

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাকো, সেইত মনে স্থান !
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
তোমার মাঝে উঠব বেঁচে — সেইত আমার প্রাণ !
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান !

নজরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম
২৮-৭-২৯
(মেঘে-ঢাকা দুপুর)

বাদল-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর.

~~তরঙ্গে সে ভেঙে যায়~~

ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্দ্ধে প্রিয়া স্থির!

খুঁজিলনা অনন্ত আকাশ,

তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কেহ!

কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা [illegible] বসন্ত ও শীত,

নিশিদিন শুনি ~~[illegible]~~ বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত!

নিখিল বিরহী কাঁদে, সিন্ধু, তব সাথে।

তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে,

এক দুখে এক বেদনায়

বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, এক যাতনায়!

সেই অশ্রু — সেই লোনাজল-

তব চক্ষে — হে বিরহী বন্ধু মোর! — করে টলমল!

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া

তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া!

নজরুল ইসলাম

([illegible] প্রকাশ)

চট্টগ্রাম
২৯-৭-২৬।

যেদিন ও-বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে ধূ ধূ মরুতল
ঘুরিবে একাকী তুমি, মরুদ্যান হয়ে
আসিব সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে!…

আঁখির নীহারে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো, বিদায়!

[illegible] নজরুল
চট্টগ্রাম
২৬-১-১৯২৬
রাত্রি

~~পরিবর্তন~~

~~পরিজনের কেমন হবে সুর।~~
~~উঠিতে মোরে হয় ডুবিতে ॥~~

(রাগ) দুর্গা — আদ্ধা কাওয়ালী

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া ॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার ভাঙা ঘাটে আমার সাধ-তরী
চাপিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া ॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি'।
ছলনা করে হাসি অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি আপনি কাঁদিয়া ॥
গাঁথিলে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি — সে আসে ফুল লয়ে!
কবি রে, জানি এ তাহারে মন দিয়ে
পেলি রে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া ॥

চট্টগ্রাম –
২৭-১-১৯২৯
বুধ:

চক্রবাক

উৎসর্গ

বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদি—
প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীচরণারবিন্দেষু

দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম। ...
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট, মহাপ্রাণ, কেন বারেবারে
মনে হলো এতদিনে দেখিনু দেবতা !
চোখ পুরে এল জল, বুক পুরে কথা।
ঠেকিল ললাটে কর আপনি বিস্ময়ে,
নব লোকে দেখা যেন নব পরিচয়ে।

কোথা যেন দেখেছিনু কবে কোন লোকে,
সে স্মৃতি দেখিনু তব অশ্রুসিক্ত চোখে।
চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি
তুমি নিলে বক্ষে টানি, কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারির ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরান স্নেহে—
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা-ক্ষত দেহে
বুলাইলে ব্যথা-হরা স্নিগ্ধ শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আছে আজো ধরা 'পর !

নূতন করিয়া ভালোবাসিনু মানবে,
যাহারা দিয়াছে ব্যথা তাহাদেরি স্তবে
ভরিয়া উঠিল বুক, গাহি নব গান !
ভুলি নাই, হে উদার, তব সেই দান !
উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্বাক
উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি
হয়তো জাগিবে মনে শুনি মোর গীতি !

শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হতে আন্-চরে, সেই গান গাই ! ...

ভালোবেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান !

[ওগো ও চক্রবাকী]

—ওগো ও চক্রবাকী,
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হলো যে চক্রবাকের আঁখি !
কোথা কোন্ লোকে কোন্ নদীপারে রহিলে গো তারে ভুলে ?
হেথা সাথী তব ডেকে ডেকে ফেরে ধরণীর কূলে কূলে।
দিবসে ঘুমালে সব ভুলে যার পাখায় বাঁধিয়া পাখা,
চঞ্চুতে যার আজিও তোমার চঞ্চুর চুমা আঁকা,
'রোদ লাগে' বলে যার ডানাতলে লুকাইতে নানা ছলে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁপিয়া তবু কেন পলে পলে ;
ভাদরের পারা আদরের ধারা যাচিয়া যাহার কাছে
কাহার পিছনে ছায়াটির মতো ফিরিয়াছ পাছে পাছে,—
আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে,
ভীরু মোর পাখি ! আঁধারে একাকী কোথা কোন্ বালুচরে ?

সাড়া দেয় বন, শন্ শন্ শন্—ঐ শোনো মোর ডাকে,
তটিনীর জল আঁখি ছলছল ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে,
ফিরায়ে আমার প্রতিধ্বনিরে সান্ত্বনা দেয় গিরি,
ও-পারের তীরে জিরিজিরি পাতা ঝুরিতেছে ঝিরি ঝিরি।
বিহগীর হায় ঘুম ভেঙে যায় বিহগ-পক্ষ-পুটে,
বলে, 'বিরহী রে, মোর সুখ-নীড়ে আয় আয় আয় ছুটে !
জুড়াইব ব্যথা, কাঁটা বিঁধে যথা সেথা দিব বুক পেতে,
ঐ কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে উড়ে যাব আকাশেতে !'
ঠোঁট-ভরা মধু আসে কুলবধূ, বলে, 'আঁধারের পাখি,
নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এত ডাকাডাকি ?

চলো তরুতলে, এই অঞ্চলে দিব সুখ-শেজ পাতি,
ভুলের কাননে ফুল তুলে মোরা কাটাইব সারা রাতি !'
অসীম আকাশ আসে মোর পাশ তারার দীপালি জ্বালি,
বলে, 'পরবাসী ! কোথা কাঁদো আসি ? হেথা শুধু চোরাবালি !

তোমার কাঁদনে আমার আগুনে নিভে যায় তারা-বাতি,
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এস মোরা হব সাথী !' ...
মানে না পরান, গেয়ে গেয়ে গান কূলে কূলে ফিরি ডাকি,
কোথা কোন্ কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী !
চাহি ও-পারের তীরে,
কভু না পোহায় বিরহের রাতি এতই দীরঘ কি রে ?
না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, বিরহের যবনিকা
পড়ে যায় মাঝে, নিভে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা।
মিলনের কূল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের স্রোত-বেগে,
অধরের হাসি বাসি হয়ে ওঠে নিশীথ-প্রভাতে জেগে !

একা নদীতীরে গহন তিমিরে আমি কাঁদি মনোদুখে,
হয়তো কোথায় বাঁধিয়া কুলায় তুমি ঘুম যাও সুখে।
আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এ-জীবনে শুকাবে না,
কাটিবে এ নিশি, আসিবে প্রভাত, —যতেক অচেনা চেনা
আসিবে সবাই ; আসিবে না তুমি তব চির-চেনা নীড়ে,
এ-পারের ডাক ও-পার ঘুরিয়া এ-পারে আসিবে ফিরে !
হয়তো জাগিয়া দেখিব প্রভাতে, আমারি আঁখির আগে
তুমি যাচিতেছ নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে।
জানি গো আমার কাটিবে না আর এই বিরহের নিশি,
খুঁজিবে বৃথাই আঁধারে তোমায় দশদিকে দশ দিশি।

যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি—
খুঁজিবে সাগর-মরু-প্রান্তর গিরিদরী বনভূমি।
তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়, ঝরা পালকের স্মৃতি—
এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি !

যদি পথ ভুলে আস এই কূলে কোনো দিন রাতে রানি,
প্রিয় ওগো প্রিয়, নিও তুলে নিও ঝরা এ পালকখানি।

তোমারে পড়িছে মনে

তোমারে পড়িছে মনে
আজি নীপ-বালিকার ভীরু-শিহরণে,
যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে
কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে—
তোমারে পড়িছে মনে।
হয়তো তেমনি আজি দূর বাতায়নে।
ঝিলিমিলি-তলে
ম্লান লুলিত অঞ্চলে
চাহিয়া বসিয়া আছ একা,
বারেবারে মুছে যায় আঁখি-জল-লেখা।
বারেবারে নিভে যায় শিয়রের বাতি,
তুমি জাগো, জাগে সাথে বরষার রাতি।
সিক্ত-পক্ষ পাখি
তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী
হয়তো তেমনি করি ডাকিছে সাথীরে,
তুমি চাহি আছ শুধু দূর শৈল-শিরে।
তোমার আঁখির ঘন নীলাঞ্জন-ছায়া
গগনে গগনে আজ ধরিয়াছে কায়া।...

আমি হেথা রচি গান নব নীপ-মালা—
স্মরণ-পারের প্রিয়া, একান্তে নিরালা
অকারণে ! —জানি আমি জানি
তোমারে পাবো না আমি। এই গান এই মালাখানি
রহিবে তাদেরি কণ্ঠে—যাহাদেরে কভু
চাহি নাই, কুসুমে কাঁটার মতো জড়ায়ে রহিল যারা তবু।
বহে আজি দিশাহারা শ্রাবণের অশান্ত পবন
তারি মতো ছুটে ফেরে দিকে দিকে উচাটন মন,
খুঁজে যায় মোর গীত-সুর
কোথা কোন্ বাতায়নে বসি তুমি বিরহ-বিধুর।

তোমার গগনে নেভে বারেবারে বিজলির দীপ,
আমার অঙ্গনে হেথা বিকশিয়া ঝরে যায় নীপ।
তোমার গগনে ঝরে ধারা অবিরল,
আমার নয়নে হেথা জল নাই, বুকে ব্যথা করে টলমল।
আমার বেদনা আজি রূপ ধরি শত গীত-সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে—বিরহিণী—তব তরে ঝুরে।

এ-পারে ও-পারে মোরা, নাই নাই কূল !
তুমি দাও আঁখি-জল, আমি দিই ফুল।

বাদল-রাতের পাখি

বাদল-রাতের পাখি !
কবে পোহায়েছে বাদলের রাতি, তবে কেন থাকি থাকি
কাঁদিছ আজিও 'বউ কথা কও' শেফালির বনে একা,
শাওনে যাহারে পেলে না, তারে কি ভাদরে পাইবে দেখা ? ...
তুমি কাঁদিয়াছ 'বউ কথা কও' সে-কাঁদনে তব সাথে
ভাঙিয়া পড়েছে আকাশের মেঘ গহিন শাওন-রাতে।

বন্ধু, বরষা-রাতি
কেঁদেছে যে সাথে সে ছিল কেবল বর্ষা-রাতেরি সাথী !

আকাশের জল-ভারাতুর আঁখি আজি হাসি-উজ্জ্বল ;
তেরছ-চাহনি জাদু হানে আজ, ভাবে তনু ঢলঢল।
কমল-দিঘিতে কমল-মুখীরা অধরে হিঙুল মাখে,
আলুথালু বেশ—ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ-আঁচলে ঢাকে।
শিউলি-তলায় কুড়াইতে ফুল আজিকে কিশোরী মেয়ে
অকারণ লাজে চমকিয়া ওঠে আপনার পানে চেয়ে।
শালুকের কুঁড়ি গুঁজিছে খোঁপায় আবেশে বিধুরা বধূ,
মুকুলি পুষ্প-কুমারীর ঠোঁটে ভরে পুষ্পল মধু।

আজি আনন্দ-দিনে
পাবে কি বন্ধু বধূরে তোমার, হাসি দেখে লবে চিনে?
সরসীর তীরে আম্রের বনে আজো যবে ওঠো ডাকি
বাতায়নে কেহ বলে কি, 'কে তুমি বাদল-রাতের পাখি!'
আজো বিনিদ্র জাগে কি সে রাতি তার বন্ধুর লাগি?
যদি সে ঘুমায়—তব গান শুনি চকিতে ওঠে কি জাগি?

ভিন-দেশি পাখি! আজিও স্বপন ভাঙিল না হায় তব,
তাহার আকাশে আজ মেঘ নাই—উঠিয়াছে চাঁদ নব!
ভরেছে শূন্য উপবন তার আজি নব নব ফুলে,
সে কি ফিরে চায় বাজিতেছে হায় বাঁশি যার নদীকূলে?
বাদল-রাতের পাখি!
উড়ে চল—যথা আজো ঝরে জল, নাহিকো ফুলের ফাঁকি!

স্তব্ধ রাতে

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,
ওরে মোর সাথী আঁখি-জল,
এইবার তুই নেমে আয়—
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়!

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল;
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়,
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়।
আঁখি-জল, তুই নেমে আয়—
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!...
ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তার আদি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?

ভিখারি সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাস নিতি অন্ধকারে?
পথ হতে আন্-পথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রসাদ যাচিস যার তারেই রহিলি শুধু ভুলি?

সকলে জানিবে তোর ব্যথা,
শুধু সে-ই জানিবে না কাঁটা-ভরা ক্ষত তোর কোথা?
ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী!
যাহারে সকল দিবি, তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর?
গানের গহীনে ডুবে কতদিন লুকাইবি এই আঁখি-লোর?
কেবলি গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে!
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য-পানে।

সে-ই শুধু জানিল না, যার তরে এত মালা-গাঁথা,
জলে-ভরা আঁখি তোর, ঘুমে-ভরা তার আঁখি-পাতা,
কে জানে কাটিবে কি না আজিকার অন্ধ এ নিশীথ,
হয়তো হবে না গাওয়া কাল তোর আধো-গাওয়া গীত,
হয়তো হবে না বলা, বাণীর বুদ্বুদে যাহা ফোটে নিশিদিন!
সময় ফুরায়ে যায়—ঘনায়ে আসিল সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন!

সময় ফুরায়ে যায়, চল্ এবে, বল্ আঁখি তুলি—
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লহ মোর ভিক্ষা-ঝুলি!
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই
ভিক্ষা-পাত্র লয়ে করে কভু আসি নাই।

ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মানিকে মণিতে,
ভরে নাই চিত্ত মোর! তাই শূন্য-চিতে
এসেছি বিবাগি আজি, ওগো রাজ-রানি,
চাহিতে আসিনি কিছু! সঙ্কোচে অঞ্চল মুখে দিও নাকো টানি।
জানাতে এসেছি শুধু—অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে—যাহারে গোপনে
চলে গেছি বন-পথে একদা একাকী,
বুক-ভরা কথা লয়ে—জল-ভরা আঁখি।
চাহিনিকো হাত পেতে তারে কোনোদিন,
বিলায়ে দিয়েছি তারে সব, ফিরে পেতে দিইনিকো ঋণ!

ওগো উদাসিনী,
তব সাথে নাহি চলে হাটে বিকিকিনি।
কারো প্রেম ঘরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারি করিয়া দেয় বহু দূরে ঠেলে !
জানিতে আসিনি আমি, নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছ কি না সেই নদী–কূলে,
যার ভাটি–টানে—
ভেসে যায় তরী মোর দূর শূন্য–পানে।
চাহি না তো কোনো কিছু, তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যথা করে বুক,
সুখ ফিরি করে ফিরি, তবু নাহি সহা যায়
আজি আর এ–দুখের সুখ। ...

আপনারে ছলিয়াছি, তোমারে ছলিনি কোনোদিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা দিয়ে গেনু ঋণ।

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন–পাশে নিশীথ জাগার সাথী !
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি !
আজ হতে হলো বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হলো বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি। ...

অস্ত–আকাশ–অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি
কাঁদিতেছে চাঁদ, 'মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি।'
নিশীথিনী যায় দূর বন–ছায়, তন্দ্রায় ঢুলুঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।—

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে ?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে ?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন–পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক–তরুর সারি !

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে
সারা রাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে !—
জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হতো যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার ! —তোমার শাখার পল্লবমর্মর
মনে হতো যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির শাড়ির আঁচলখানি।
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মতো নিবিড় আদর-ছাওয়া !

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি, —তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি।
হয়তো স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি,
বাতায়নে ঠেকি ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি।
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন !
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, 'করো বিদায়ের আয়োজন !'

—আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে !
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন ?
জানি—মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি !
হয়তো তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই করে,
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে ?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-ম'ল,
—বলো তাহে কার ক্ষতি ?
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী ! ...

হয়তো তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া পাখি,
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছে নিশীথে জাগেনিকো সাথে খুলি কেহ বাতায়ন।
—সব আগে আমি আসি
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালোবাসি!
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর, হোক বা না হোক দেখা।...

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
—নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।—

শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে—
ঐ পল্লব-জাফ্‌রি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে —দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি?
তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদনি ঘুমাবে যবে,
মূর্ছিতা হবে সুখের আবেশে, —সে আলোর উৎসবে
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর?
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে?
খড়্‌খড়ি খুলি চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ্‌-লোকে?—
—অথবা এমনি করি
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধেয়ানে সারা দিনমান ভরি?
মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, ঊর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে!
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!...

* * *

ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি।
যদি ভুল করে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি,
বন্ধ করিয়া দিও পুন তায় ! ... তোমার জাফ্‌রি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে—মাটিতে পেলে না যাকে !

কর্ণফুলী

—ওগো ও কর্ণফুলী,
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনাগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশি লোনা !
তুমি শুধু জল করো টলমল ; নাই তব প্রয়োজন
আমার দু ফোঁটা অশ্রুজলের এ গোপন আবেদন।
যুগ যুগ ধরি বাড়াইয়া বাহু তব দু ধারের তীর
ধরিতে চাহিয়া পারেনি ধরিতে, তব জল-মঞ্জীর
বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়াছ নিজ পথে !
কূলের মানুষ ভেসে গেল কত তব এ অকূল স্রোতে !
তব কূলে যারা নিতি রচে নীড় তারাই পেল না কূল,
দিশা কি তাহার পাবে এ অতিথি দু'দিনের বুলবুল !
—বুঝি প্রিয় সব বুঝি,
তবু তব চরে চখা কেঁদে মরে চখীরে তাহার খুঁজি !

* * *

তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভুলে-যাওয়া ভাগীরথী—
তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী ?
দেশ দেশ ঘুরে পেয়েছি কি দেখা মিলনের মোহানায়,
স্থলের অশ্রু নিশেষ হইয়া যথায় ফুরায়ে যায় ?
ওরে পার্বতী উদাসিনী, বল্ এ গৃহ-হারারে বল্,
এই স্রোত তোর কোন্ পাহাড়ের হাড়-গলা আঁখি-জল ?

বজ্র যাহারে বিঁধিতে পারেনি, উড়াতে পারেনি ঝড়,
ভূমিকম্পে যে টলেনি, করেনি মহাকালেরে যে ডর,
সেই পাহাড়ের পাষাণের তলে ছিল এত অভিমান ?
এত কাঁদে তবু শুকায় না তার চোখের জলের বান ?

তুই নারী, তুই বুঝিবি না নদী পাষাণ–নরের ক্লেশ,
নারী কাঁদে—তার সে আঁখিজলের আছে একদিন শেষ।
পাষাণ ফাটিয়া যদি কোনোদিন জলের উৎস বহে,
সে জলের ধারা শাশ্বত হয়ে রহে রে চির–বিরহে !
নারীর অশ্রু নয়নের শুধু ; পুরুষের আঁখি–জল
বাহিরায় গলে অন্তর হতে অন্তরতম তল !
আকাশের মতো তোমাদের চোখে সহসা বাদল নেমে
রৌদ্রের তাত ফুটে ওঠে সখি নিমিষে সে মেঘ থেমে !

*　　*　　*

—ওগো ও কর্ণফুলী !

তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান–ফুল খুলি ?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে,
'সাম্পান'–নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে ?
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান–ফুল গেল খুলি,
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী ?

যে গিরি গলিয়া তুমি বও নদী, সেথা কি আজিও রহি
কাঁদিছে বন্দি চিত্রকূটের যক্ষ চির–বিরহী ?
তব এত জল একি তারি সেই মেঘদূত–গলা বাণী ?
তুমি কি গো তার প্রিয়–বিরহের বিধুর স্মরণখানি ?
ঐ পাহাড়ে কি শিরীরে স্মরিয়া ফারেসের ফরহাদ,
আজিও পাথর কাটিয়া করিছে জিন্দেগি বরবাদ ?
সারা গিরি হলো শিরী–মুখ হায়, পাহাড় গলিল প্রেমে,
গলিল না শিরী ! সেই বেদনা কি নদী হয়ে এলে নেমে ?
ঐ গিরি–শিরে মজ্‌নুন্ কি গো আজিও দিওয়ানা হয়ে
লায়লির লাগি নিশিদিন জাগি ফিরিতেছে রোয়ে রোয়ে ?

পাহাড়ের বুক বেয়ে সেই জল বহিতেছ তুমি কি গো ?—
দুষ্মন্তের খোঁজে–আসা তুমি শকুন্তলার মৃগ ?

মহাশ্বেতা কি বসিয়াছে সেথা পুণ্ডরীকের ধ্যানে?—
তুমি কি চলেছ তাহারি সে প্রেম নিরুদ্দেশের পানে?—
যুগে যুগে আমি হারায়ে প্রিয়ারে ধরণীর কূলে কূলে
কাঁদিয়াছি যত, সে অশ্রু কি গো তোমাতে উঠেছে দুলে?

* * *

—ওগো চির উদাসিনী!
তুমি শোনো শুধু তোমারি নিজের বক্ষের রিনি রিনি।
তব টানে ভেসে আসিল যে লয়ে ভাঙা 'সাম্পান'-তরী,
চাহনি তাহার মুখ-পানে তুমি কখনো করুণা করি।
জোয়ারে সিন্ধু ঠেলে দেয় ফেলে তবু নিতি ভাটি-টানে
ফিরে ফিরে যাও মলিন বয়ানে সেই সিন্ধুরই পানে!
বন্ধু, হৃদয় এমনি অবুঝ কারো সে অধীন নয়!
যারে চায় শুধু তাহারেই চায়—নাহি মানে লাজ ভয়।
বারেবারে যায় তারি দরজায়, বারেবারে ফিরে আসে!
যে আগুনে পুড়ে মরে পতঙ্গ—ঘোরে সে তাহারি পাশে!

তব জলে আমি ডুবে মরি যদি, নহে তব অপরাধ,
তোমার সলিলে মরিব ডুবিয়া, আমারি সে চির-সাধ!
আপনার জ্বালা মিটাতে এসেছি তোমার শীতল তলে,
তোমারে বেদনা হানিতে আসিনি আমার চোখের জলে!
অপরাধ শুধু হৃদয়ের সখি, অপরাধ কারো নয়!
ডুবিতে যে আসে ডোবে সে একাই, তটিনী তেমনি বয়!

* * *

সারিয়া এসেছি আমার জীবনে কূলে ছিল যত কাজ,
এসেছি তোমার শীতল নিতলে জুড়াইতে তাই আজ!
ডাকোনিকো তুমি, আপনার ডাকে আপনি এসেছি আমি
যে বুকের ডাক শুনেছি শয়নে স্বপনে দিবস-যামী।
হয়তো আমারে লয়ে অন্যের আজো প্রয়োজন আছে,
মোর প্রয়োজন ফুরাইয়া গেছে চিরতরে মোর কাছে!
—সে কবে বাঁচিতে চায়,
জীবনের সব প্রয়োজন যার জীবনে ফুরায়ে যায়!

জীবন ভরিয়া মিটায়েছি শুধু অপরের প্রয়োজন,
সবার খোরাক জোগায়ে নেহারি উপবাসী মোরই মন!
আপনার পানে ফিরে দেখি আজ—চলিয়া গেছে সময়,
যা হারাবার তা হারাইয়া গেছে, তাহা ফিরিবার নয়!
হারায়েছি সব; বাকি আছি আমি, শুধু সেইটুকু লয়ে
বাঁচিতে পারি না, যত চলি পথে তত উঠি বোঝা হয়ে!

বহিতে পারি না আর এই বোঝা, নামানু সে ভার হেথা;
তোমার জলের লিখনে লিখিনু আমার গোপন ব্যথা!
ভয় নাই প্রিয়, নিমিষে মুছিয়া যাইবে এ জল-লেখা,
তুমি জল—হেথা দাগ কেটে কভু থাকে না কিছুরি রেখা!
আমার ব্যথায় শুকায়ে যাবে না তব জল কাল হতে,
ঘূর্ণাবর্ত জাগিবে না তব অগাধ গভীর স্রোতে।
হয়তো ঈষৎ উঠিবে দুলিয়া, তারপর উদাসিনী,
বহিয়া চলিবে তব পথে তুমি বাজাইয়া কিঙ্কিণী!
শুধু লীলাভরে তেমনি হয়তো ভাঙিয়া চলিবে কূল,
তুমি রবে, শুধু রবে নাকো আর এ গানের বুলবুল!

তুষার-হৃদয় অকরুণা ওগো, বুঝিয়াছি আমি আজি—
দেউলিয়া হয়ে কেন তব তীরে কাঁদে 'সাম্পান'-মাঝি!

শীতের সিন্ধু

ভুলি নাই পুন তাই আসিয়াছি ফিরে
ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয়, তব সেই তীরে!
কূল-হারা কূলে তব নিমেষের লাগি
খেলিতে আসিয়া হায় যে কবি বিবাগী
সকলি হারায়ে গেল তব বালুচরে,—
ঝিনুক কুড়াতে এসে—গেল আঁখি ভরে
তব লোনা জল লয়ে,—তব স্রোত-টানে
ভাসিয়া যে গেল দূর নিরুদ্দেশ পানে!
ফিরে সে এসেছে আজ বহু বর্ষ পরে,
চিনিতে পারো কি বন্ধু, মনে তারে পড়ে?

বর্ষার জোয়ারে যারে তব হিন্দোলায়
দোলাইয়া ফেলে দিলে দুরাশা-সীমায়,
ফিরিয়া সে আসিয়াছে তব ভাটি-মুখে,
টানিয়া লবে কি আজ তারে তব বুকে?

খেলিতে আসিনি বন্ধু, এসেছি এবার
দেখিতে তোমার রূপ বিরহ-বিথার।
সে-বার আসিয়াছিনু হয়ে কুতূহলী,
বলিতে আসিয়া —দিনু আপনারে বলি।
কৃপণের সম আজ আসিয়াছি ফিরে
হারায়েছি মণি যথা সেই সিন্ধু-তীরে!
ফেরে না তা যা হারায়—মণি-হারা ফণী
তবু ফিরে ফিরে আসে! বন্ধু গো, তেমনি
হয়তো এসেছি বৃথা চোরা বালুচরে!—
যে চিতা জ্বলিয়া, —যায় নিভে চিরতরে,
পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মশানে
তবু ঘুরে মরে কেন, —কেন যে কে জানে!
প্রভাতে ঢাকিয়া আসি কবরের তলে
তারি লাগি আধো-রাতে অভিসারে চলে
অবুঝ মানুষ, হায়! —ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝিবে না তুমি কোনোদিন!

হয়তো হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায়
হারায় সে চিরতরে! এ জনমে তার
দিশা নাহি মিলে, বন্ধু! —তুমি পারাবার,
পারাপার নাহি তব, তোমার অতলে
যা ডোবে তা চিরতরে ডোবে আঁখিজলে!
জানিলে সাঁতার, বন্ধু, হইলে ডুবুরি
করিতাম কবে তব বক্ষ হতে চুরি
রত্নহার! কিন্তু হায়, জিনে শুধু মালা
কি হইবে বাড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা!
বন্ধু, তব রত্নহার মোর তরে নয়—
মালার সহিত যদি না মেলে হৃদয়!

হে উদাসী বন্ধু মোর, চির আত্মভোলা,
আজ নাই বুকে তব বর্ষার হিন্দোলা!
শীতের কুহেলি-ঢাকা বিষণ্ন বয়ানে
কিসের করুণা মাখা! কূলের শিথানে
এলায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে,
বিশীর্ণ কপোল বালু-উপাধানে থুয়ে!
তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ ডুবে যায়
তেমনি উঠিয়া দূর গগন-সীমায়,
ছায়া এসে পড়ে তার তোমার মুকুরে,
কায়াহীন মায়াবীর মায়া বুকে পুরে
ফুলে ফুলে কূলে কূলে কাঁদো অভিমানে,
আছাড়ি তরঙ্গ-বাহু ব্যর্থ শূন্য পানে।
যে কলঙ্কী নিশিদিন ধায় শূন্য পথে—
সে দেখে না, কোথা, কোন্ বাতায়ন হতে,
কে তারে চাহিছে নিতি! সে খুঁজে বেড়ায়
বুকের প্রিয়ারে ত্যাজি পথের প্রিয়ায়!

ভয় নাই বন্ধু ওগো, আসিনি জানিতে
অন্ত তব, পেতে ঠাঁই অন্তহীন চিতে!
চাঁদ না সে চিতা জ্বলে তব উপকূলে—
কি হবে জানিয়া মোর? কার চিত্তমূলে
কে কবে ডুবিয়া হায়, পাইয়াছে তল?
এক ভাগ থল সেথা, তিন ভাগ জল!

এসেছি দেখিতে তারে সেদিন বর্ষায়
খেলিতে দেখেছি যারে উদ্দাম লীলায়
বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে! সেদিন শ্রাবণে
ছলছল জল-চুড়ি-বলয়-কঙ্কণে
শুনিয়াছি যে-সংগীত, যার তালে তালে
নেচেছে বিজলি মেঘে, শিখী নীপ-ডালে।
যার লোভে অতি দূর অস্তদেশ হতে
ছুটে এসেছিনু এই উদয়ের পথে!—
ওগো মোর লীলা-সাথী অতীত বর্ষার,
আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার!

চলে গেছে আজি সেই বরষার মেঘ,
আকাশের চোখে নাই অশ্রুর উদ্বেগ,
গরজে না গুরু গুরু গগনে সে বাজ,
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
রোয়ে রোয়ে বহে নাকো পুবালি বাতাস,
শ্বসে না ঝাউয়ের শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস,
নাই সেই চেয়ে-থাকা বাতায়ন খুলি
সেই পথে—মেঘ যথা যায় পথ ভুলি।
না মানিয়া কাজলের ছলনা নিষেধ
চোখ ছেপে জল ঝরা, —কপোলের স্বেদ
মুছিবার ছলে আঁখি-জল মোছা সেই,
নেই বন্ধু, আজি তার স্মৃতিও সে নেই!

থরথর কাঁপে আজ শীতের বাতাস,
সেদিন আশার ছিল সে দীরঘ-শ্বাস—
আজ তাহা নিরাশায় কেঁদে বলে, হায়,—
'ওরে মূঢ়, যে যায় সে চিরতরে যায়!
যাহারে রাখিবি তুই অন্তরের তলে
সে যদি হারায় কভু সাগরের জলে
কে তাহারে ফিরে পায়? নাই, ওরে নাই,
অকূলের কূলে তারে খুঁজিস বৃথাই!
যে-ফুল ফোটেনি ওরে তোর উপবনে
পুবালি হাওয়ার শ্বাসে বরষা-কাঁদনে,
সে ফুল ফুটিবে না রে আজ শীত-রাতে
দু'ফোঁটা শিশির আর অশ্রুজল-পাতে!'

আমার সান্ত্বনা নাই জানি বন্ধু জানি,
শুনিতে এসেছি তবু—যদি কানাকানি
হয় তব কূলে কূলে আমার সে ডাক!
এ কূলে বিরহ-রাতে কাঁদে চক্রবাক,
ও-কূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ বিরহ একি শুধু বিরহ একার?
কুহেলি-গুণ্ঠন টানি শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, নিঃশব্দ সংগীতে
ভরে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে জাগি
ব্যথিয়া ওঠে না বুক কভু কারো লাগি?

গুণ্ঠন খুলিয়া কভু সেই আধো রাতে
ফিরিয়া চাহ না তব কূলে কল্পনাতে ?
চাঁদ সে তো আকাশের, এই ধরা-কূলে
যে চাহে তোমায় তারে চাহ না কি ভুলে ?

তব তীরে অগস্ত্যের সম লয়ে তৃষা
বসে আছি, চলে যায় কত দিবা-নিশা !
যাহারে করিতে পারি চুমুকেতে পান
তার পদতলে বসি গাহি শুধু গান !
জানি বন্ধু, এ ধরার মৃৎপাত্রখানি
ভরিতে নারিল যাহা—তারে আমি আনি
ধরিব না এ অধরে ! এ মম হিয়ার
বিপুল শূন্যতা তাহে নহে ভরিবার !
আসিয়াছি কূলে আজ, কাল প্রাতে ঝুরে
কূল ছাড়ি চলে যাব দূরে বহুদূরে।

বলো বন্ধু, বলো, জয় বেদনার জয় !
যে-বিরহে কূলে কূলে নাহি পরিচয়,
কেবলি অনন্ত জল অনন্ত বিচ্ছেদ,
হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ ;
যে-বিরহে গ্রহ-তারা শূন্যে নিশিদিন
ঘুরে মরে ; গৃহবাসী হয়ে উদাসীন—
উল্কা-সম ছুটে যায় অসীমের পথে,
ছোটে নদী দিশাহারা গিরিচূড়া হতে ;
বারেবারে ফোটে ফুল কণ্টক-শাখায়,
বারেবারে ছিঁড়ে যায়, তবু না ফুরায়
মালা-গাঁথা যে-বিরহে, যে-বিরহে জাগে
চকোরী আকাশে আর কুমুদী তড়াগে ;
তব বুকে লাগে নিতি জোয়ারের টান,
যে-বিষ পিইয়া কণ্ঠে ফুটে ওঠে গান—
বন্ধু, তার জয় হোক ! এই দুঃখ চাহি
হয়তো আসিব পুন তব কূল বাহি।
হেরিব নতুন রূপে তোমারে আবার,
গাহিব নতুন গান। নব অশ্রুহার
গাঁথিব গোপনে বসি। নয়নের ঝারি
বোঝাই করিয়া দিব তব তীরে ডারি।

হয়তো বসন্তে পুন তব তীরে তীরে
ফুটিবে মঞ্জরী নব শুষ্ক তরু-শিরে।
আসিবে নূতন পাখি শুনাইতে গীতি,
আসিবে না শুধু একা তব এ অতিথি !

যে-দিন ও-বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে ধূ ধূ মরুতল
পুড়িবে একাকী তুমি মরুদ্যান হয়ে
আসিব সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে !
আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো বিদায় !

পথচারী

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দু'ধারে দু'কূল দুঃখ-সুখের—মাঝে আমি স্রোত-বারি !
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হতে
বিরাম-বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আন্‌পথে।
নিজ বাস হলো চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণপরে
বাহিরিনু পথে গিরি-পর্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে !
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চলে।

জননীরে ভুলি যে পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশি শুনি,
যে পথে পলায় শশকেরা শুনি ঝর্নার ঝুনঝুনি,
পাখি উড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় আকাশ-যানে,—
সেই পথ ধরি পলাইনু আমি ! সেই হতে ছুটে চলি
গিরি দরী মাঠ পল্লির বাট সোজা বাঁকা শত গলি।

—কোন্ গ্রহ হতে ছিঁড়ি
উল্কার মতো ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি !

আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড়, ভাবে উহাদেরি তার এসেছি পাহাড় চিরে।
উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপ–হারী !
উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা,
দেখে নাই—জ্বলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা !

—হায়, কত হতভাগী—
আমিই কি জানি—মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি !

বাজিয়াছে মোর তটে তটে জানি ঘটে ঘটে কিঙ্কিণী,
জল–তরঙ্গে বেজেছে বধূর মধুর রিনিকিঝিনি।
বাজায়েছে বেণু রাখাল–বালক তীর–তরুতলে বসি,
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের শশী।
জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দু'তীরে বিছায়ে স্নেহ,
দিঘি হতে ডাকে পদ্মমুখীরা, 'থির হও বাঁধি গেহ !'

আমি বয়ে যাই—বয়ে যাই আমি কুলুকুলু কুলুকুলু,
শুনি না—কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।
সদাগর–জাদি মণি–মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরী
ভাসে মোর জলে, —'ছলছল' বলে আমি দূরে যাই সরি !
আঁকড়িয়া ধরে দু'তীর বৃথাই জড়ায়ে তন্তুলতা,
ওরা দেখে নাই আবর্ত মোর, মোর অন্তর–ব্যথা।

লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,
আমি বলি চল্ ছল্ ছল্ ছল্ ওরে বধূ তোরে চিনি !
কূল ছেড়ে আয় রে অভিসারিকা, মরণ–অকূলে ভাসি !
মোর তীরে তীরে আজো খুঁজে ফিরে তোরে ঘরছাড়া বাঁশি।
সে পড়ে ঝাঁপায়ে জলে,
আমি পথে ধাই—সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা–তলে !

জানি নাকো হায় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চলেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল খনে খনে।
সম্মুখ–টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই—এই আছে নাই—এই ঘর এই পর !
ওরে চল্ চল্ ছল্ ছল্ ছল্ কি হবে ফিরায়ে আঁখি ?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে চক্রবাকী !

ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যায় কূলের কুলায়–বাসী,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে আমার কাদায়–ছিটানো হাসি।
ওরা চলে যায়, আমি জাগি হায় লয়ে চিতাগ্নি শব,
ব্যথা–আবর্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব !

ওরে বেনোজল, ছল্ ছল্ ছল্ ছুটে চল্ ছুটে চল্ !
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী !
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত–সমুদ্র–বারি !

মিলন–মোহনায়

হায় হাবা মেয়ে, সব ভুলে গেলি দয়িতের কাছে এসে !
এত অভিমান এত ক্রন্দন সব গেল জলে ভেসে !
কূলে কূলে এত ফুলে ফুলে কাঁদা আছাড়ি–পিছাড়ি তোর,
সব ভুলে গেলি যেই বুকে তোরে টেনে নিল মনোচোর !
সিন্ধুর বুকে লুকাইলি মুখ এমনি নিবিড় করে,
এমনি করিয়া হারাইলি তুই আপনারে চিরতরে—
যে দিকে তাকাই নাই তুই নাই ! তোর বন্ধুর বাহু
গ্রাসিয়াছে তোরে বুকের পাঁজরে—ক্ষুধাতুর কাল–রাহু !

বিরহের কূলে অভিমান যার এমন ফেনায়ে উঠে,
মিলনের মুখে সে ফিরে এমনি পদতলে পড়ে লুটে ?
এমনি করিয়া ভাঙিয়া পড়ে কি বুক–ভাঙা কান্নায়,
বুকে বুক রেখে নিবিড় বাঁধনে পিষে গুঁড়ো হয়ে যায় ?
তোর বন্ধুর আঙুলের ছোঁয়া এমনি কি জাদু জানে,
আবেশে গলিয়া অধর তুলিয়া ধরিলি অধর পানে !
একটি চুমায় মিটে গেল তোর সব সাধ সব তৃষা,
ছিন্ন লতার মতন মুরছি পড়িলি হারায়ে দিশা !
—একটি চুমার লাগি
এতদিন ধরে এত পথ বেয়ে এলি কি রে হতভাগী ?
গাঙ–চিল আর সাগর–কপোত মাছ ধরিবার ছলে,
নিলাজি লো, তোর রঙ্গ দেখিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে।

দু'ধারের চর অবাক হইয়া চেয়ে আছে তোর মুখে,
সবার সামনে লুকাইলি মুখ কেমনে বঁধুর বুকে?
নীলিম আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেঘ-গুণ্ঠন ফেলে
বৌ-ঝির মতো উঁকি দিয়ে দেখে কুতূহলী-আঁখি মেলে।
'সাম্পান'-মাঝি খুঁজে ফেরে তোরে ভাটিয়ালি গানে কাঁদি,
খুঁজিয়া নাকাল দু'ধারের খাল—তোর হেরেমের বাঁদি!
হায় ভিখারিনি মেয়ে,
ভুলিলি সবারে, ভুলিলি আপনা দয়িতেরে বুকে পেয়ে!
তোরি মতো নদী আমি নিরবধি কাঁদি রে প্রিতম লাগি,
জন্ম-শিখর বাহিয়া চলেছি তাহারি মিলন মাগি!
যার তরে কাঁদি—ধার করে তারি জোয়ারের লোনা জল
তোর মতো মোর জাগে না রে কভু সাধের কাঁদন-ছল।
আমার অশ্রু একাকী আমার, হয়তো গোপনে রাতে
কাঁদিয়া ভাসাই, ভেসে ভেসে যাই মিলনের মোহনাতে,
আসিয়া সেথায় পুন ফিরে যাই। —তোর মতো সব ভুলে
লুটায়ে পড়ি না—চাহে না যে মোরে তারি রাঙা পদমূলে!
যারে চাই তারে কেবলি এড়াই কেবলি দি তারে ফাঁকি;
সে যদি ভুলিয়া আঁখি পানে চায় ফিরাইয়া লই আঁখি!
—তার তীরে যবে আসি
অশ্রু-উৎসে পাষাণ চাপিয়া অকারণে শুধু হাসি!
অভিমানে মোর আঁখিজল জমে করকা-বৃষ্টি* সম,
যারে চাই তারে আঘাত হানিয়া ফিরে যায় নির্মম!

একা মোর প্রেম ছুটিবে কেবলি নিচু প্রান্তর বেয়ে,
সে কভু উর্ধ্বে আসিবে না উঠে আমার পরশ চেয়ে—
চাহি না তাহারে! বুকে চাপা থাক আমার বুকের ব্যথা,
যে বুক শূন্য নহে মোরে চাহি—হব নাকো ভার সেথা!
সে যদি না ডাকে কি হবে ডুবিয়া ও-গভীর কালো নীরে,
সে হউক সুখী, আমি রচে যাই স্মৃতি-তাজ তার তীরে!
মোর বেদনার মুখে চাপিয়াছি নিতি যে পাষাণ-ভার
তা দিয়ে রচিব পাষাণ-দেউল সে পাষাণ-দেবতার!

কত স্রোতধারা হারাইছে কূল তার জলে নিরবধি,
আমি হারালাম বালুচরে তার, গোপন-ফল্গুনদী!

---

* শিলা-বৃষ্টি।

গানের আড়াল

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—
এইটুকু শুধু রবে পরিচয়? আর সব অবসান?
অন্তর-তলে অন্তরতর যে ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনোদিন পরিচয়?

হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয়তো কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রনরনি,—
উপকূলে বসে শুনেছ সে সুর, বোঝো নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর, দুলেছে দুল হয়ে শুধু কানে?

হায়, ভেবে নাহি পাই—
যে চাঁদ জাগাল সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই
সাগরের সেই ফুলে ফুলে কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন?
সুরের আড়ালে মূর্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ?
আমার গানের মালার সুবাস ছুঁল না হৃদয়ে আসি?
আমার বুকের বাণী হলো শুধু তব কণ্ঠের ফাঁসি?.

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে—
প্রভাত যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে!
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি
জানি; তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি।
যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল রক্তে ফাটিয়া পড়ি,
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি—
দেখো নাই তারে! —মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি!

ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়!
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি—
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি!

তুমি মোরে ভুলিয়াছ

তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক !—
সেদিন যে জ্বলেছিল দীপালি-আলোক
তোমার দেউল জুড়ি—ভুল তাহা ভুল !
সেদিন ফুটিয়াছিল ভুল করে ফুল
তোমার অঙ্গনে, প্রিয় ! সেদিন সন্ধ্যায়
ভুলে পরেছিলে ফুল নোটন-খোঁপায় !

ভুল করে তুলি ফুল গাঁথি বর-মালা
বেলাশেষে বারেবারে হয়েছ উতালা
হয়তো বা আর কারো লাগি ! ... আমি ভুলে
নিরুদ্দেশ তরী মোর তব উপকূলে
না চাহিতে বেঁধেছিনু, গেয়েছিনু গান,
নীলাভ তোমার আঁখি হয়েছিল ম্লান
হয়তো বা অকারণে ! গোধূলি-বেলায়
হয়তো বা অকারণে ম্লানিমা ঘনায়
তোমার ও-আঁখিতলে ! হয়তো তোমার
পড়ে মনে, কবে যেন কোন্ লোকে কার
বধূ ছিলে ; তারি কথা শুধু মনে পড়ে !
—ফিরে যাও অতীতের লোক-লোকান্তরে
এমনি সন্ধ্যায় বসি একাকিনী গেহে !
দুখানি আঁখির দীপ সুগভীর স্নেহে
জ্বালাইয়া থাকো জাগি তারি পথ চাহি !
সে যেন আসিছে দূর তারালোক বাহি
পারাইয়া অসীমের অনন্ত জিজ্ঞাসা,
সে দেখেছে তব দীপ, ধরণীর বাসা !

তারি লাগি থাকো বসি নব বেশ পরি
শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত সুন্দরী !
হায়, সেথা আমি কেন বাঁধিলাম তরী,
কেন গাহিলাম গান আপনা পাসরি ?
হয়তো সে গান মম তোমার ব্যথায়
বেজেছিল। হয়তো বা লেগেছিল পায়
আমার তরীর ঢেউ। দিয়েছিল ধুয়ে
চরণ-অলক্ত তব। হয়তো বা ছুঁয়ে

গিয়েছিল কপোলের আকুল কুন্তল
আমার বুকের শ্বাস। ও-মুখ-কমল
উঠেছিল রাঙা হয়ে। পদ্মের কেশর
ছুঁইলে দখিনা বায়, কাঁপে থরথর
যেমন কমল-দল ভঙ্গুর মৃণালে
সলাজ সঙ্কোচে সুখে পল্লব-আড়ালে,
তেমনি ছোঁয়ায় মোর শিহরি শিহরি
উঠেছিলে বারেবারে সারা দেহ ভরি !
চেয়েছিলে আঁখি তুলি, ডেকেছিলে যেন
প্রিয় নাম ধরে মোর—তুমি জানো কেন !
তরী মম ভেসেছিল যে নয়ন-জলে
কূল ছাড়ি নেমে এলে সেই সে অতলে।
বলিলে, —'অজানা বন্ধু, তুমি কি গো সেই,
জ্বালি দীপ গাঁথি মালা যার আশাতেই
কূলে বসে একাকিনী যুগ যুগ ধরি ?
নেমে এসো বন্ধু মোর ঘাটে বাঁধো তরী !'

বিস্ময়ে রহিনু চাহি ও-মুখের পানে
কী যেন রহস্য তুমি—কী যেন কে জানে—
কিছুই বুঝিতে নারি ! আহ্বানে তোমার
কেন জাগে অভিমান, জোয়ার দুর্বার
আমার আঁখির এই গঙ্গা-যমুনায় !—
নিরুদ্দেশ যাত্রী, হায়, আসিলি কোথায় ?
একি তোর খেয়ানের সেই জাদুলোক,
কল্পনার ইন্দ্রপুরী ? একি সেই চোখ
ধ্রুবতারা সম যাহা জ্বলে নিরন্তর
ঊর্ধ্বে তোর ? সপ্তর্ষির অনন্ত বাসর ?
কাব্যের অমরাবতী ? একি সে ইন্দিরা,
তোরি সে কবিতা-লক্ষ্মী ? —বিরহ-অধীরা
একি সেই মহাশ্বেতা, চন্দ্রাপীড়-প্রিয়া ?
উন্মাদ ফরহাদ যারে পাহাড় কাটিয়া
সৃজিতে চাহিয়াছিল—একি সেই শিরি ?
লায়লি এই কি সেই, আসিয়াছে ফিরি
কায়েসের খোঁজে পুন ? কিছু নাহি জানি !
অসীম জিজ্ঞাসা শুধু করে কানাকানি
এপারে ওপারে, হায় ! ... তুমি তুলি আঁখি

কেবলি চাহিতেছিলে ! দিনান্তের পাখি
বনান্তে কাঁদিতেছিল—'কথা কও বউ !'
ফাগুন ঝুরিতেছিল ফেলি ফুল-মউ !

কাহারে খুঁজিতেছিলে আমার এ চোখে
অবসান-গোধূলির মলিন আলোকে ?
জিজ্ঞাসার, সন্দেহের শত আলো-ছায়া
ও-মুখে সৃজিতেছিল কী যেন কি মায়া !
কেবলি রহস্য হায়, রহস্য কেবল,
পার নাই সীমা নাই অগাধ অতল !
এ যেন স্বপনে-দেখা কবেকার মুখ,
এ যেন কেবলি সুখ কেবলি এ দুখ !
ইহারে দেখিতে হয়—ছোঁয়া নাহি যায়,
এ যেন মন্দার-পুষ্প দেব-অলকায় !
ইহারি স্ফুলিঙ্গ যেন হেরি রূপে রূপে,
নিশীথে এ দেখা দেয় যেন চুপে চুপে
যখন সবারে ভুলি। ধরার বন্ধন
যখন ছিঁড়িতে চাহি, স্বর্গের স্বপন
কেবলি ভুলাতে চায়, এই সে আসিয়া
রূপে রসে গন্ধে গানে কাঁদিয়া হাসিয়া
আঁকড়ি ধরিতে চাহে, —মাটির মমতা !
পরান-পোড়ানি শুধু, জানে নাকো কথা !
বুকে এর ভাষা নাই, চোখে নাই জল,
নির্বাক ইঙ্গিত শুধু শান্ত অচপল !
এ বুঝি গো ভাস্করের পাষাণ-মানসী
সুন্দর, কঠিন, শুভ্র। ভোরের উষসী,
দিনের আলোর তাপ সহিতে না জানে।
মাঠের উদাসী সুর বাঁশরির তানে,
বাণী নাই, শুধু সুর, শুধু আকুলতা !
ভাষাহীন আবেদন দেহ-ভরা কথা !
এ যেন চেনার সাথে অচেনার মিশা,—
যত দেখি তত হায় বাড়ে শুধু তৃষা।

আসিয়া বসিলে কাছে তৃপ্ত মুক্তানন,
মনে হলো—আমি দিঘি, তুমি পদ্মবন !

পূর্ণ হইলাম আজি, হয় হোক ভুল,
যত কাঁটা তত ফুল, কোথা এর তুল?
তোমারে ঘিরিয়া রবো আমি কালো জল,
তরঙ্গের উর্ধ্বে রবে তুমি শতদল,
পূজারির পুষ্পাঞ্জলি সম। নিশিদিন
কাঁদিব ললাট হানি তীরে তৃপ্তিহীন!
তোমার মৃণাল-কাঁটা আমার পরানে
লুকায়ে রাখিব, যেন কেহ নাহি জানে।
... কত কি যে কহিলাম অর্থহীন কথা,
শত যুগ-যুগান্তের অন্তহীন ব্যথা।
শুনিলে সে সব জাগি বসিয়া শিয়রে,
বলিলে, 'বন্ধু গো, হেরো দীপ পুড়ে মরে
তিলে তিলে আমাদের সাথে! আর নিশি
নাই বুঝি, দিবা এলে দূরে যাব মিশি!
আমি শুধু নিশীথের।' যখন ধরণী
নীলিমা-মঞ্জুষা খুলি হেরে মুক্তামণি
বিচিত্র নক্ষত্রমালা—চন্দ্র-দীপ জ্বালি,
একাকী পাপিয়া কাঁদে 'চোখ গেল' খালি,
আমি সেই নিশীথের। —আমি কই কথা,
যবে শুধু ফোটে ফুল, বিশ্ব তন্দ্রাহতা
হয়তো দিবসে এলে নারিব চিনিতে,
তোমারে করিব হেলা, তব ব্যথা-গীতে
কেবলি পাইবে হাসি সবার সুমুখে,
কাঁদিলে হাসিব আমি সরল কৌতুকে,
মুছাব না আঁখি-জল। বলিব সবায়,
'তুমি শাঙনের মেঘ—যথায় তথায়
কেবলি কাঁদিয়া ফেরো, কাঁদাই স্বভাব!
আমি তো কেতকী নহি, আমার কি লাভ
ওই শাঙনের জলে? কদম্ব যূথীর
সখারে চাহি না আমি। শ্বেত-করবীর
সখি আমি। হেমন্তের সান্ধ্য-কুহেলিতে
দাঁড়াই দিগন্তে আসি, নিরশ্রু-সংগীতে
ভরে ওঠে দশ দিক! আমি উদাসিনী।
মুসাফির! তোমারে তো আমি নাহি চিনি!'
ডাকিয়া উঠিল পিক দূরে আম্রবনে
মুহুমুহু কুহুকুহু আকুল নিস্বনে।

কাঁদিয়া কহিনু আমি, 'শুন, সখি শুন,
কাতরে ডাকিছে পাখি কেন পুন পুন !
চলে যাব কোন্ দূরে, স্বরগের পাখি
তাই বুঝি কেঁদে ওঠে হেন থাকি থাকি।
তোমারই কাজল–আঁখি বেড়ায় উড়িয়া,
পাখি নয়—তব আঁখি ওই কোয়েলিয়া !'

হাসিয়া আমার বুকে পড়িলে লুটায়ে,
বলিলে, —'পোড়ারমুখি আম্রবনচ্ছায়ে
দিবানিশি ডাকে, শুনে কান ঝালাপালা !
জানি না তো কুহু–স্বরে বুকে ধরে জ্বালা !
উহার স্বভাব এই, তোমারি মতন
অকারণে গাহে গান, করে জ্বালাতন !
নিশি না পোহাতে বসি বাতায়ন–পাশে
হলুদ–চাঁপার ডালে, কেবলি বাতাসে
উহু উহু উহু করি বেদনা জানায় !
বুঝিতে নারিনু আমি পাখি ও তোমায় !'

নয়নের জল মোর গেল তলাইয়া
বুকের পাষাণ–তলে। উৎসারিত হিয়া
সহসা হারাল ধারা তপ্ত মরু–মাঝে।
আপনারে অভিশাপি ক্ষমাহীন লাজে !
কহিনু, 'কে তুমি নারী, এ কী তব খেলা ?
অকারণে কেন মোর ডুবাইলে ভেলা,
এ অশ্রু–পাথারে একা দিলে ভাসাইয়া ?
দু'হাতে আন্দোলি জল কূলে দাঁড়াইয়া,
অকরুণা, হাসো আর দাও করতালি !
অদূরে নৌবতে বাজে ইমন–ভূপালি
তোমার তোরণ–দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
—তোমার বিবাহ বুঝি ? ওই বাঁশুরিয়া
ডাকিছে বন্ধুরে তব ?' যুঝি ঢেউ সনে
শুধানু পরান–পণে। ... তুমি আনমনে
বারেক পশ্চাতে চাহি পড়িলে লুটায়ে
স্রোতজলে, সাঁতরিয়া আসি মম পাশে
'আমিও ডুবিব সাথে' বলিয়া তরাসে
জড়ায়ে ধরিলে মোরে বাহুর বন্ধনে ! ...

হইলাম অচেতন ! ... কিছু নাই মনে
কেমনে উঠিনু কূলে ! ... কবে সে কখন
জড়াইয়া ধরেছিলে মালার মতন
নিশীথে পাথার-জলে, —শুধু এইটুক
সুখ-স্মৃতি ব্যথা সম চির-জাগরূক
রহিল বুকের তলে ! ... আর কিছু নাই ! ...
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি এ-কূলে বৃথাই,
হে চির-রহস্যময়ী ! ও-কূলে দাঁড়ায়ে
তেমনি হাসিছ তুমি সান্ধ্য-বনচ্ছায়ে
চাহিয়া আমার মুখে ! তোমার নয়ন
বলিছে সদাই যেন, 'ডুবিয়া মরণ
এবার হলো না, সখা ! আজো যার সাধ
বাঁচিতে ধরার 'পরে। স্বপনের চাঁদ
হয়তো বা দিবে ধরা জাগ্রত এ-লোকে,
হয়তো নামিবে তুমি অশ্রু হয়ে চোখে,
আসিবে পথিক-বন্ধু হয়ে প্রিয়তম
বুকের ব্যথায় মোর—পুষ্পে গন্ধ সম !
অঞ্জলি হইতে নামি তোমার পূজার
জড়াইয়া রবো বক্ষে হয়ে কণ্ঠহার !'

নিশীথের বুক-চেরা তব সেই স্বর,
সেই মুখ সেই চোখ করুণা-কাতর
পদ্মা-তীরে তীরে রাতে আজো খুঁজে ফিরি !
কত নামে ডাকি তোমা, —'মহাশ্বেতা, শিরী,
লায়লি, বকৌলি, তাজ, দেবী, নারী, প্রিয়া !'
—সাড়া নাহি মিলে কারো ! ফুলিয়া ফুলিয়া
বয়ে যায় মেঘনার তরঙ্গ বিপুল,
কখনো এ-কূল ভাঙে কখনো ও-কূল !

পার হতে নারি এই তরঙ্গের বাধা,
ও যেন 'এসো না' বলে পায়ে-ধরে-কাঁদা
তোমার নয়ন-স্রোত ! ও যেন নিষেধ,
বিধাতার অভিশাপ, অনন্ত বিচ্ছেদ,
স্বর্গ ও মর্তের মাঝে যেন যবনিকা ! ...
আমাদের ভাগ্যে বুঝি চিররাত্রি লিখা !
নিশীথের চখা-চখি, দুইপারে থাকি
দুইজনে দুইজন ফিরি সদা ডাকি !

কোথা তুমি? তুমি কোথা? যেন মনে লাগে,
কত যুগ দেখি নাই! কত জন্ম আগে
তোমারে দেখেছি কোন্ নদীকূলে গেহে,
জ্বালো দীপ বিষাদিনী ক্লান্ত দেহে!
বারেবারে কাঁপে কর, কাঁপে দীপশিখা,
আঁখির নিমিখ কাঁপে, আকাশ-দীপিকা
কাঁপে তারারাজি—যেন আঁখি-পাতা তব,—
এইটুকু পড়ে মনে! কবে অভিনব
উঠিলে বিকশি তুমি আপনার মাঝে,
দেখি নাই! দেখিব না—কত বিনা কাজে
নিজেরে আড়াল করি রাখিছ সতত
অপ্রকাশ সুগোপন বেদনার মতো।
আমি হেথা কূলে কূলে ফিরি আর কাঁদি,
কুড়ায়ে পাব না কিছু? বুকে যাহা বাঁধি
তোমার পরশ পাব—একটু সান্ত্বনা!
চরণ-অলক্ত-রাঙা দু'টি বালুকণা,
একটি নূপুর, ম্লান বেণি-খসা ফুল,
কবরীর সোঁদা-ঘষা পরিমল-ধূল,
আধখানি ভাঙা চুড়ি রেশমি কাচের,
দলিত বিশুষ্ক মালা নিশি-প্রভাতের,
তব হাতে লেখা মম প্রিয় ডাক-নাম
লিখিয়া ছিঁড়িয়া-ফেলা আধখানি খাম,
অঙ্গের সুরভি-মাখা ত্যক্ত তপ্ত বাস,
মহুয়ার মদ সম মদির নিশ্বাস
পূরবের পরিস্থান হতে ভেসে-আসা,—
কিছুই পাব না খুঁজি? কেবলি দুরাশা।
কাঁদিবে পরান ঘিরি? নিরুদ্দেশ পানে।
কেবলি ভাসিয়া যাব শ্রান্ত ভাটি-টানে?
তুমি বসি রবে ঊর্ধ্বে মহিমা-শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ-দেবী? কভু মোর তরে
নামিবে না প্রিয়া রূপে ধরার ধূলায়?
লো কৌতুকময়ী! শুধু কৌতুক-লীলায়
খেলিবে আমারে লয়ে? —আর সবি ভুল?
ভুল করে ফুটেছিলে আঙিনায় ফুল?
ভুল করে বলেছিলে 'সুন্দর'? অমনি—
ঢেকেছ দু'হাতে মুখ ত্বরিতে তখনি!

বুঝি কেহ শুনিয়াছে, দেখিয়াছে কেহ
ভাবিয়া আঁধার কোণে লীলায়িত দেহ
লুকাওনি সুখে লাজে? কোন্ শাড়িখানি
পরেছিলে বাছি বাছি সে সন্ধ্যায় রানি?

হয়তো ভুলেছ তুমি, আমি ভুলি নাই!
যত ভাবি ভুল তাহা—তত সে জড়াই
সে ভুলে সাপিনী সম বুকে ও গলায়!
বাসি লাগে ফুলমেলা। —ভুলের খেলায়
এবার খোয়াব সব, করিয়াছি পণ।
হোক ভুল, হোক মিথ্যা, হোক এ স্বপন,
—এইবার আপনারে শূন্য রিক্ত করি
দিয়া যাব মরণের আগে! পাত্র ভরি
করে যাব সুন্দরের করে বিষপান!
তোমারে অমর করি করিব প্রয়াণ
মরণের তীর্থ-যাত্রী!
ওগো বন্ধু, প্রিয়,
এমনি করিয়া ভুল দিয়া ভুলাইও
বারেবারে জন্মে জন্মে গ্রহে গ্রহান্তরে!
ও-আঁখি-আলোক যেন ভুল করে পড়ে
আমার আঁখির 'পরে। গোধূলি-লগনে
ভুল করে হই বর, তুমি হও ক'নে
ক্ষণিকের লীলা লাগি! ক্ষণিক চমকি
অশ্রুর শ্রাবণ-মেঘে হারাইও সখি! ...

তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক!
নিশি-শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক!

সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর,
তোমার পরশ লভি হইনু সুন্দর—
তুমি তাহা জানিলে না!
... সত্য হোক প্রিয়া
দীপালি জ্বলিয়াছিল—গিয়াছে নিভিয়া!

কলিকাতা
২০-৩-২৮

হিংসাতুর

হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে? দেখো নাই আর কিছু?
সম্মুখে শুধু রহিলে তাকায়ে, চেয়ে দেখিলে না পিছু!
সম্মুখ হতে আঘাত হানিয়া চলে গেল যে-পথিক
তার আঘাতেরি ব্যথা বুকে ধরে জাগো আজো অনিমিখ্?
তুমি বুঝিলে না, হায়,
কত অভিমানে বুকের বন্ধু ব্যথা হেনে চলে যায়!

আঘাত তাহার মনে আছে শুধু, মনে নাই অভিমান?
তোমারে চাহিয়া কত নিশি জাগি গাহিয়াছে কত গান,
সে জেগেছে একা—তুমি ঘুমায়েছ বেভুল আপন সুখে,
কাঁটার কুঞ্জে কাঁদিয়াছে বসি সে আপন মনোদুখে,
কুসুম-শয়নে শুইয়া আজিকে পড়ে না সে-সব মনে,
তুমি তো জানো না, কত বিষজ্বালা কণ্টক-দংশনে!
তুমি কি বুঝিবে বালা,
যে আঘাত করে বুকের প্রিয়ারে, তার বুকে কত জ্বালা!

ব্যথা যে দিয়াছে—সম্মুখে ভাসে নিষ্ঠুর তার কায়া,
দেখিলে না তব পশ্চাতে তারি অশ্রু-কাতর ছায়া! ...
অপরাধ শুধু মনে আছে তার, মনে নাই কিছু আর?
মনে নাই, তুমি দলেছ দু'পায়ে কবে কার ফুলহার?

কাঁদায়ে কাঁদিয়া সে রচেছে তার অশ্রুর গড়খাই,
পার হতে তুমি পারিলে না তাহা, সে-ই অপরাধী তাই?
সে-ই ভালো, তুমি চিরসুখী হও, একা সে-ই অপরাধী!
কি হবে জানিয়া, কেন পথে পথে মরুচারী ফেরে কাঁদি!

হয়তো তোমারে করেছে আঘাত, তবুও শুধাই আজি,
আঘাতের পিছে আরো-কিছু কিগো ও-বুকে ওঠেনি বাজি?
মনে তুমি আজ করিতে পারো কি—তব অবহেলা দিয়া
কত সে কঠিন করিয়া তুলেছ তাহার কুসুম-হিয়া?

মানুষ তাহারে করেছে পাষাণ—সেই পাষাণের ঘায়
মুরছায়ে তুমি পড়িতেছ বলে সেই অপরাধী, হায়?
তাহারি সে অপরাধ—
যাহার আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে তোমার মনের বাঁধ!

কিন্তু কেন এ অভিযোগ আজি? সে তো গেছে সব ভুলে!
কেন তবে আর রুদ্ধ দুয়ার ঘা দিয়া দিতেছ খুলে?
শুষ্ক যে-মালা আজিও নিরালা যত্নে রেখেছে তুলি
ঝরায়ো না আর নাড়া দিয়ে তার পবিত্র ফুলগুলি!
সেই অপরাধী, সেই অমানুষ, যত পারো দাও গালি!
নিভেছে যে-ব্যথা দয়া করে সেথা আগুন দিও না জ্বালি!

'মানুষ', 'মানুষ' শুনে শুনে নিতি কান হলো ঝালাপালা!
তোমরা তারেই অমানুষ বলো—পায়ে দলো যার মালা!
তারি অপরাধ—যে তার প্রেম ও অশ্রুর অপমানে
আঘাত করিয়া টুটায়ে পাষাণ অশ্রু-নিঝর আনে!

কবি অমানুষ—মানিলাম সব! তোমার দুয়ার ধরি
কবি না মানুষ কেঁদেছিল প্রিয় সেদিন নিশীথ ভরি?
দেখেছ ঈর্ষা—পড়ে নাই চোখে সাগরের এত জল?
শুকালে সাগর—দেখিতেছ তার সাহারার মরুতল!
হয়তো কবিই গেয়েছিল গান, সে কি শুধু কথা-সুর?
কাঁদিয়াছিল যে—তোমারি মতো সে মানুষ বেদনাতুর!

কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবে না, রানি,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে বুদ্বুদ-বাণী!
তুমি কি বুঝিবে, কত ক্ষত হয়ে বেণুর বুকের হাড়ে
সুর ওঠে হায়, কত ব্যথা কাঁদে সুর-বাঁধা বীণা-তারে!

সেদিন কবিই কেঁদেছিল শুধু? মানুষ কাঁদেনি সাথে?
হিংসাই শুধু দেখেছ, দেখোনি অশ্রু নয়ন-পাতে?
আজো সে ফিরিছে হাসিয়া গাহিয়া? —হায়, তুমি বুঝিবে না,
হাসির ফূর্তি উড়ায় যে—তার অশ্রুর কত দেনা!

বর্ষা-বিদায়

ওগো বাদলের পরী !
যাবে কোন্ দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী !
ওগো ও ক্ষণিকা, পুব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব ?
পহিল্ ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন্ দেশ অভিনব ?

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু।
কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রু সম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।

ওগো ও কাজল-মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে !
কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।

ওগো ও জলের দেশের কন্যা ! তব ও বিদায়-পথে
কাননে কাননে কদম-কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে।
তোমার আদরে মুকুলিতা হয়ে উঠিল যে বল্লরী
তরুর কণ্ঠ জড়াইয়া তারা কাঁদে দিবানিশি ভরি।

'বৌ-কথা-কও' পাখি
উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নে বৃথা বউ করে ডাকাডাকি।
চাঁপার গেলাস গিয়াছে ভাঙিয়া, পিয়াসী মধুপ এসে
কাঁদিয়া কখন গিয়াছে উড়িয়া কমল-কুমুদী-দেশে।

তুমি চলে যাবে দূরে,
ভাদরের নদী দুকূল ছাপায়ে কাঁদে ছলছল সুরে !

যাবে যবে দূর হিম-গিরি-শিরে, ওগো বাদলের পরি,
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহারেও স্মরি ?
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা,—
কে জানে কী ভাল বিধুর ব্যথা—না মধুর পবিত্রতা !

সেথা মহিমার ঊর্ধ্ব শিখরে নাই তরলতা হাসি,
সেথা রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে হয় না বাসি।
সেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা-নূপুর খুলি,
চলিতে চকিতে চমকি উঠো না, কবরী উঠে না দুলি।

সেথা রবে তুমি ধেয়ান-মগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি 'স্ফটিক-জল' !

সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে

দেখা দিলে রাঙা মৃত্যুর রূপে এতদিনে কি গো রানি?
মিলন-গোধূলি-লগনে শুনালে চির-বিদায়ের বাণী।
যে ধূলিতে ফুল ঝরায় পবন
রচিলে সেথায় বাসর-শয়ন,
বারেক কপোলে রাখিয়া কপোল, ললাটে কাঁকন হানি,
দিলে মোর 'পরে সকরুণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি।

নিশি না পোহাতে জাগায়ে বলিলে, 'হলো যে বিদায় বেলা।'
তব ইঙ্গিতে ও-পার হইতে এপারে আসিল ভেলা।
আপনি সাজালে বিদায়ের বেশে
আঁখি-জল মম মুছাইলে হেসে,
বলিলে, 'অনেক হইয়াছে দেরি, আর জমিবে না খেলা !
সকলের বুকে পেয়েছ আদর, আমি দিনু অবহেলা।'

'চোখ গেল উহু চোখ গেল' বলে কাঁদিয়া উঠিল পাখি,
হাসিয়া বলিলে, 'বন্ধু, সত্যি চোখ গেল ওর না কি?'
অকূল অশ্রু-সাগর-বেলায়
শুধু বালু নিয়ে যে-জন খেলায়,
কি বলিব তারে, বিদায়-খনেও ভিজিল না যার আঁখি !
শ্বসিয়া উঠিল নিশীথ-সমীর, 'চোখ গেল' কাঁদে পাখি !

দেখিনু চাহিয়া ও-মুখের পানে—নিরশ্রু নিষ্ঠুর !
বুকে চেপে কাঁদি, প্রিয় ওগো প্রিয়, কোথা তুমি কত দূর?

এত কাছে তুমি গলা জড়াইয়া
কেন হুহু করে ওঠে তবু হিয়া,
কী যেন কী নাই কিসের অভাব এ বুকে ব্যথা-বিধুর!
চোখ-ভরা জল, বুক-ভরা কথা, কণ্ঠে আসে না সুর।

হেনার মতন বক্ষে পিষিয়া করিনু তোমারে লাল,
ঢলিয়া পড়িলে দলিত কমল জড়ায়ে বাহু-মৃণাল!
কেঁদে বলি, 'প্রিয়া, চোখে কই জল?
হলো না তো ম্লান চোখের কাজল!'
চোখে জল নাই—উঠিল রক্ত—সুন্দর কঙ্কাল!
বলিলে, 'বন্ধু, চোখেরই তো জল, সে কি রহে চিরকাল?'

ছল ছল ছল কেঁদে চলে জল, ভাঁটি-টানে ছুটে তরী,
সাপিনীর মতো জড়াইয়া ধরে শশীহীন শর্বরী।
কূলে কূলে ডাকে কে যেন, 'পথিক,
আজও রাঙা হয়ে ওঠেনি তো দিক!
অভিমানী মোর! এখনি ছিঁড়িবে বাঁধন কেমন করি?
চোখে নাই জল—বক্ষের মোর ব্যথা তো যায়নি মরি!'

কেমনে বুঝাই কী যে আমি চাই, চির-জনমের প্রিয়া!
কেমনে বুঝাই—এত হাসি গাই তবু কাঁদে কেন হিয়া!
আছে তব বুকে করুণার ঠাঁই,
স্বর্গের দেবী—চোখে জল নাই!
কত জীবনের অভিশাপ এ যে, কতবার জনমিয়া—
পারিজাত-মালা ছুঁইতে শুকালে—হারাইলে দেখা দিয়া।

ব্যর্থ মোদের গোধূলি-লগন এই সে জনমে নহে,
বাসর-শয়নে হারায়ে তোমায় পেয়েছি চির-বিরহে!
কত সে লোকের কত নদনদী
পারায়ে চলেছি মোরা নিরবধি,
মোদের মাঝারে শত জনমের শত সে জলধি বহে।
বারেবারে ডুবি বারেবারে উঠি জন্ম-মৃত্যু-দহে।

বারেবারে মোরা পাষাণ হইয়া আপনারে থাকি ভুলি,
ক্ষণেকের তরে আসে কবে ঝড়, বন্ধন যায় খুলি।

সহসা সে কোন্ সন্ধ্যায়, রানি,
চকিতে হয় গো চির-জানাজানি !
মনে পড়ে যায় অভিশাপ-বাণী, উড়ে যায় বুলবুলি।
কেঁদে কও, 'প্রিয়, হেথা নয়, হেথা লাগিয়াছে বহু ধূলি?'

মুছি পথধূলি বুকে লবে তুলি মরণের পারে কবে,
সেই আশে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে !
কে জানিত হায় মরণের মাঝে
এমন বিয়ের নহবত বাজে !
নব-জীবনের বাসর-দুয়ারে কবে 'প্রিয়া' 'বধূ' হবে—
সেই সুখে, প্রিয়া, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে !

অপরাধ শুধু মনে থাক

মোর অপরাধ শুধু মনে থাক !
আমি হাসি, তার আগুনে আমারি
অন্তর হোক পুড়ে খাক !
অপরাধ শুধু মনে থাক !

নিশীথের মোর অশ্রুর রেখা
প্রভাতে কপোলে যদি যায় দেখা,
তুমি পড়িও না সে গোপন লেখা
গোপনে সে লেখা মুছে যাক !
অপরাধ শুধু মনে থাক !

এ উপগ্রহ কলঙ্ক-ভরা
তবু ঘুরে ঘিরি তোমারি এ ধরা,
লইয়া আপন দুখের পসরা
আপনি সে খাক ঘুরপাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

জ্যোৎস্না তাহার তোমার ধরায়
যদি গো এতই বেদনা জাগায়,
তোমার বনের লতায় পাতায়
কালো মেঘে তার আলো ছা'ক।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

তোমার পাখির ভুলাইতে গান
আমি তো আসিনি, হানিনি তো বাণ,
আমি তো চাহিনি, কোনো প্রতিদান,
এসে চলে গেছি নির্বাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

কত তারা কাঁদে কত গ্রহে চেয়ে
ছুটে দিশাহারা ব্যোমপথ বেয়ে,
তেমনি একাকী চলি গান গেয়ে
তোমারে দিইনি পিছু-ডাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

কত ঝরে ফুল, কত খসে তারা,
কত সে পাষাণে শুকায় ফোয়ারা,
কত নদী হয় আধ-পথে হারা,
তেমনি এ স্মৃতি লোপ পা'ক।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

আঙিনায় তুমি ফুটেছিলে ফুল
এ দূর পবন করেছিল ভুল,
শ্বাস ফেলে চলে যাবে সে আকুল—
তব শাখে পাখি গান গা'ক।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

প্রিয় মোর প্রিয়, মোরই অপরাধ,
কেন জেগেছিল এত আশা সাধ !
যত ভালোবাসা, তত পরমাদ,
কেন ছুঁইলাম ফুল-শাখ।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

আলেয়ার মতো নিভি, পুন জ্বলি,
তুমি এসেছিলে শুধু কুতূহলী,
আলেয়াও কাঁদে কারো পিছে চলি—
এ কাহিনী নব মুছে যাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক !

আড়াল

আমি কি আড়াল করিয়া রেখেছি তব বন্ধুর মুখ?
না জানিয়া আমি না জানি কতই দিয়াছি তোমায় দুখ।
তোমার কাননে দখিনা পবন
এনেছিল ফুল পূজা-আয়োজন,
আমি এনু ঝড় বিধাতার ভুল—ভণ্ডুল করি সব,
আমার অশ্রু-মেঘে ভেসে গেল তব ফুল-উৎসব।

মম উৎপাতে ছিঁড়েছে কি প্রিয়, বক্ষের মণিহার?
আমি কি এসেছি তব মন্দিরে দস্যু ভাঙিয়া দ্বার?
আমি কি তোমার দেবতা-পূজার
ছড়ায়ে ফেলেছি ফুল-সম্ভার?
আমি কি তোমার স্বর্গে এসেছি মর্তের অভিশাপ?
আমি কি তোমার চন্দ্রের বুকে কালো কলঙ্ক-ছাপ?

ভুল করে যদি এসে থাকি ঝড়, ছিঁড়িয়া থাকি মুকুল,
আমার বরষা ফুটায়েছে তার অনেক অধিক ফুল!
পরায়ে কাজল ঘন বেদনার
ডাগর করেছি নয়ন তোমার,
কূলের আশয় ভাঙিয়া করেছি সাত সাগরের রানি,
সে দিয়াছে মালা, আমি সাজায়েছি নিখিল সুষমা ছানি।

দস্যুর মতো হয়তো খুলেছি লাজ-অবগুণ্ঠন,
তব তরে আমি দস্যু, করেছি ত্রিভুবন লুণ্ঠন!

তুমি তো জানো না, নিখিল বিশ্ব
কার প্রিয়া লাগি আজিকে নিঃস্ব?
কার বনে ফুল ফোটাবার লাগি ঢালিয়াছি এত নীর,
কার রাঙা পায়ে সাগর বাঁধিয়া করিয়াছি মঞ্জীর।

তুমি না চাহিতে আসিয়াছি আমি—সত্য কি এইটুক?
ফুল ফোটা-শেষে ঝরিবার লাগি ছিলে না কি উৎসুক?
নির্মম-প্রিয়-নিষ্ঠুর হাতে
মরিতে চাহনি আঘাতে আঘাতে?
তুমি কি চাহনি মিলনের মাঝে নিবিড় পীড়ন-জ্বালা?
তুমি কি চাহনি কেহ এসে তব ছিঁড়ে দেয় গাঁথা-মালা?

পাষাণের মতো চাপিয়া থাকিনি তোমার উৎস-মুখে,
আমি শুধু এসে মুক্তি দিয়াছি আঘাত হানিয়া বুকে!
তোমার স্রোতেরে মুক্তি দানিয়া
স্রোতমুখে আমি গেলাম ভাসিয়া।
রহিবার যে—সে রয়ে গেল কূলে, সে রচুক সেথা নীড়!
মম অপরাধে তব স্রোত হলো পুণ্য তীর্থ-নীর!

রূপের দেশের স্বপন-কুমার স্বপনে আসিয়াছিনু,
বন্দিনী! মম সোনার ছোঁয়ায় তব ঘুম ভাঙাইনু।
দেখো মোরে পাছে ঘুম ভাঙিয়াই,
ঘুম না টুটিতে তাই চলে যাই,
যে আসিল তব জাগরণ-শেষে মালা দাও তারি গলে,
সে থাকুক তব বক্ষে—রহিব আমি অন্তর-তলে।

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায়ে যখন দাঁড়াবে আঙিনা-মাঝে,
শুনিও কোথায় কোন্ তারা-লোকে কার ক্রন্দন বাজে!
আমার তারার মলিন আলোকে
ম্লান হয়ে যাবে দীপশিখা চোখে,
হয়তো অদূরে গাহিবে পথিক আমারি রচিত গীতি—
যে গান গাহিয়া অভিমান তব ভাঙাতাম সাঁঝে নিতি।

গোধূলি-বেলায় ফুটিবে উঠানে সন্ধ্যা-মণির ফুল,
তুলসী-তলায় করিতে প্রণাম খুলে যাবে বাঁধা চুল।
কুন্তল-মেঘ-ফাঁকে অবিরল
অকারণে চোখে ঝরিবে গো জল,
সারা শর্বরী বাতায়নে বসি নয়ন-প্রদীপ জ্বালি
খুঁজিবে আকাশে কোন্ তারা কাঁপে তোমারে চাহিয়া খালি।

নিষ্ঠুর আমি—আমি অভিশাপ, ভুলিতে দিব না, তাই
নিশ্বাস মম তোমারে ঘিরিয়া শ্বসিবে সর্বদাই।
তোমারে চাহিয়া রচিনু যে গান
কণ্ঠে কণ্ঠে লভিবে তা প্রাণ,
আমার কণ্ঠ হইবে নীরব, নিখিল-কণ্ঠ-মাঝে
শুনিবে আমারি সেই ক্রন্দন সে গান প্রভাতে সাঁঝে!

নদীপারের মেয়ে

নদীপারের মেয়ে!
ভাসাই আমার গানের কমল তোমার পানে চেয়ে।
আলতা-রাঙা পা দু'খানি ছুপিয়ে নদী-জলে
ঘাটে বসে চেয়ে আছ আঁধার অস্তাচলে।
নিরুদ্দেশে ভাসিয়ে-দেওয়া আমার কমলখানি
ছোঁয় কি গিয়ে নিত্য সাঁঝে তোমার চরণ, রানি?

নদীপারের মেয়ে!
গানের গাঙে খুঁজি তোমায় সুরের তরী বেয়ে।
খোঁপায় গুঁজে কনক-চাঁপা, গলায় টগর-মালা,
হেনার গুছি-হাতে বেড়াও নদীকূলে বালা।
শুনতে কি পাও আমার তরীর তোমায়-চাওয়া গীতি?
ম্লান হয়ে কি যায় ও-চোখে চতুর্দশীর তিথি?

নদীপারের মেয়ে!
আমার ব্যথার মালঞ্চে ফুল ফোটে তোমায়-চেয়ে।

শীতল নীরে নেয়ে ভোরে ফুলের সাজি হাতে,
রাঙা উষার রাঙা সতিন দাঁড়াও আঙিনাতে।
তোমার মদির শ্বাসে কি মোর গুলের সুবাস মেশে?
আমার বনের কুসুম তুলি পরো কি আর কেশে?

নদীপারের মেয়ে!
আমার কমল অভিমানের কাঁটায় আছে ছেয়ে।
তোমার সখায় পুজো কি মোর গানের কমল তুলি?
তুলতে সে-ফুল মৃণাল-কাঁটায় বেঁধে কি অঙ্গুলি?
ফুলের বুকে দোলে কাঁটার অভিমানের মালা,
আমার কাঁটার ঘায়ে বোঝো আমার বুকের জ্বালা?

১৪০০ সাল

[কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' পড়িয়া]

আজি হতে শত বর্ষ আগে
কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদেরে
শত অনুরাগে,
আজি হতে শত বর্ষ আগে!

ধেয়ানী গো, রহস্য-দুলাল!
উতারি ঘোমটাখানি তোমার আঁখির আগে
কবে এল সুদূর আড়াল?
অনাগত আমাদের দখিন-দুয়ারি
বাতায়ন খুলি তুমি, হে গোপন হে স্বপন-চারী,
এসেছিলে বসন্তের গন্ধবহ-সাথে,
শত বর্ষ পরে যথা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি রাতে!
নেহারিলে বেদনা-উজ্জ্বল আঁখি-নীরে,
আনমনা প্রজাপতি নীরব পাখায়
উদাসীন, গেলে ধীরে ফিরে!

আজি মোরা শত বর্ষ পরে
যৌবন-বেদনা-রাঙা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি অনুরাগ-ভরে।
জড়িত জাগর ঘুমে শিথিল শয়নে
শুনিতেছে প্রিয়া মোর তোমার ইঙ্গিত-গান
সজল নয়নে।
আজো হায়
বারেবারে খুলে যায়
দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন,
গুমরি গুমরি কাঁদে উচাটন বসন্ত-পবন
মনে মনে বনে বনে পল্লব-মর্মরে,
কবরীর অশ্রুজল বেণি-খসা ফুল-দল
পড়ে ঝরে ঝরে!

ঝিরিঝিরি কাঁপে কালো নয়ন-পল্লব,
মধুপের মুখ হতে কাড়িয়া মধুপী পিয়ে পরাগ-আসব!
কপোতের চঞ্চুপুটে কপোতীর হারায় কূজন,
পরিয়াছে বনবধূ যৌবন-আরক্তিম কিংশুক-বসন!
রহিয়া রহিয়া আজো ধরণীর হিয়া
সমীর-উচ্ছ্বাসে যেন ওঠে নিশ্বসিয়া!

তোমা হতে শত বর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি, হে কবীন্দ্র,
অনুরাগ-ভরে!
আজি এই মদালসা ফাগুন-নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে!
চতুরালি, ধরিয়াছি তোমার চাতুরি!
করি চুরি
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে,
কাব্য হয়ে, গান হয়ে, সিক্তকণ্ঠে রঙিলা স্বপনে।
আজিকার যত ফুল—বিহঙ্গের যত গান
যত রক্ত-রাগ
তব অনুরাগ হতে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ!
আজি নব-বসন্তের প্রভাত-বেলায়
গান হয়ে মাতিয়াছ আমাদের যৌবন-মেলায়!

আনন্দ-দুলাল ওগো হে চির অমর !
তরুণ তরুণী মোরা জাগিতেছি আজি তব
মাধবী বাসর !
যত গান গাহিয়াছ ফুল-ফোটা রাতে—
সবগুলি তার
একবার—তা'পর আবার
প্রিয়া গাহে, আমি গাহি, আমি গাহি প্রিয়া গাহে সাথে !
গান-শেষে অর্ধরাতে স্বপনেতে শুনি
কাঁদে প্রিয়া, ওগো কবি ওগো বন্ধু ওগো মোর গুণী—
স্বপ্ন যায় থামি,
দেখি, বন্ধু, আসিয়াছ প্রিয়ার নয়ন-পাতে
স্বপ্ন যায় নামি !

মন লাগে, শত বর্ষ আগে
তুমি জাগো—তব সাথে আরো কেহ জাগে
দূরে কোন্ ঝিলিমিলি-তলে
লুলিত অঞ্চলে।
তোমার ইঙ্গিতখানি সংগীতের করুণ পাখায়
উড়ে যেতে যেতে সেই বাতায়নে ক্ষণিক তাকায়,
ছুঁয়ে যায় আঁখি-জল-রেখা,
নুয়ে যায় অলক-কুসুম,
তারপর যায় হারাইয়া,—তুমি একা বসিয়া নিঝ্‌ঝুম !
সে কাহার আঁখিনীর-শিশির লাগিয়া
মুকুলিকা বাণী তব কোনোটি বা ওঠে মুঞ্জরিয়া,
কোনোটি বা তখনো গুঞ্জরি ফেরে মনে
গোপনে স্বপনে !

সহসা খুলিয়া গেল দ্বার,
আজিকার বসন্ত-প্রভাতখানি দাঁড়াল করিয়া নমস্কার !
শতবর্ষ আগেকার তোমারি সে বাসন্তিকা দূতী
আজি নব নবীনেরে জানায় আকূতি ! ...

হে কবি-শাহান-শাহ্ ! তোমারে দেখিনি মোরা,
সৃজিয়াছ যে তাজমহল—

শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কালের কপোলে ঝলমল—
বিস্ময়ে-বিমুগ্ধ মোরা তাই শুধু হেরি,
যৌবনেরে অভিশাপি—'কেন তুই শতবর্ষ করিলি রে দেরি?'
হায়, মোরা আজ
মোম্‌তাজে দেখিনি, শুধু দেখিতেছি তাজ!

শত বর্ষ পরে আজি, হে কবি-সম্রাট!
এসেছে নূতন কবি—করিতেছে তব নান্দীপাঠ!
উদয়াস্ত জুড়ি আজো তব
কত না বন্দনা-ঋক ধ্বনিয়া উঠিছে নব নব।
তোমারি সে হারা-সুরখানি
নববেণু-কুঞ্জ-ছায়ে বিকশিয়া তোলে নব বাণী।

আজি তব বরে
শত বেণু-বীণা বাজে আমাদের ঘরে।
তবুও পুরে না হিয়া ভরে নাকো প্রাণ,
শতবর্ষ সাঁতরিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তব গান।
মনে হয়, কবি,
আজো আছো অস্তপাট আলো করি
আমাদেরি রবি!

আজি হতে শত বর্ষ আগে
যে-অভিবাদন তুমি করেছিলে নবীনেরে
রাঙা অনুরাগে,
সে-অভিবাদনখানি আজি ফিরে চলে
প্রণামী-কমল হয়ে তব পদতলে!

মনে হয়, আসিয়াছ অপূর্ণের রূপে
ওগো পূর্ণ, আমাদেরি মাঝে চুপে চুপে!
আজি এই অপূর্ণের কম্প্র কণ্ঠস্বরে
তোমারি বসন্তগান গাহি তব বসন্ত-বাসরে—
তোমা হতে শত বর্ষ পরে!

চক্রবাক

এপার ওপার জুড়িয়া অন্ধকার
মধ্যে অকূল রহস্য-পারাবার,
তারি এই কূলে নিশি নিশি কাঁদে জাগি
চক্রবাক সে চক্রবাকীর লাগি।
ভুলে-যাওয়া কোন্ জন্মান্তর পারে
কোন্ সুখ-দিনে এই সে নদীর ধারে
পেয়েছিল তারে সারা দিবসের সাথী,
তারপর এল বিরহের চির-রাতি,—
আজিও তাহার বুকের ব্যথার কাছে,
সেই সে স্মৃতির পালক পড়িয়া আছে।

কেটে গেল দিন, রাত্রি কাটে না আর,
দেখা নাহি যায় অতি দূর ঐ পার।
এপারে ওপারে জনম জনম বাধা,
অকূলে চাহিয়া কাঁদিছে কূলের রাধা।
এই বিরহের বিপুল শূন্য ভরি
কাঁদিছে বাঁশরি সুরের ছলনা করি !
আমরা শুনাই সেই বাঁশরির সুর,
কাঁদি—সাথে কাঁদে নিখিল ব্যথা-বিধুর।

কত তেরো নদী সাত সমুদ্র পার
কোন্ লোকে কোন্ দেশে গ্রহ-তারকার
সৃজন-দিনের প্রিয়া কাঁদে বন্দিনী,
দশদিশি ঘিরি নিষেধের নিশীথিনী।

এ পারে বৃথাই বিস্মরণের কূলে
খোঁজে সাথী তার, কেবলি সে পথ ভুলে।
কত পায় বুকে কত সে হারায় তবু—
পায়নি যাহারে ভোলেনি তাহারে কভু।

তাহারি লাগিয়া শত সুরে শত গানে
কাব্যে, কথায়, চিত্রে, জড় পাষাণে,
লিখিছে তাহার অমর অশ্রু-লেখা।

নিরন্ধ্র মেঘ বদলে ডাকিছে কেকা!
আমাদের পটে তাহারি প্রতিচ্ছবি,
সে গান শুনাই—আমরা শিল্পী কবি।
এই বেদনার নিশীথ-তমসা-তীরে
বিরহী চক্রবাক খুঁজে খুঁজে ফিরে
কোথা প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাথে
ডাকে সাথী তার মিলনের মোহনাতে।

আমরা শিশির, আমাদের আঁখি-জলে
সেই সে আশার রাঙা রামধনু ঝলে।

কুহেলিকা

তোমরা আমায় দেখতে কি পাও আমার গানের নদী-পারে?
নিত্য কথার কুহেলিকায় আড়াল করি আপনারে।
সবাই যখন মত্ত হেথায় পান করে মোর সুরের সুরা,
সবচেয়ে মোর আপন যে জন সে-ই কাঁদে গো তৃষ্ণাতুরা।
আমার বাদল-মেঘের জলে ভরল নদী সপ্ত পাথার,
ফটিক-জলের কণ্ঠে কাঁদে তৃপ্তি-হারা সেই হাহাকার!
হায় রে, চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায় তন্দ্রাহারা বিশ্ব-নিখিল,
কলঙ্ক তার নেয় না গো কেউ, রইল জুড়ে চাঁদেরি দিল্!

সন্ধ্যা

উৎসর্গ

মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'র
কর-শতদলে
ও
বীর সেনানায়কের
শ্রীচরণাম্বুজে

সন্ধ্যা

—সাতশো বছর ধরি
পূর্ব-তোরণ-দুয়ারে চাহিয়া জাগিতেছি শর্বরী।
লজ্জায়-রাঙা ডুবিল যে রবি আমাদের ভীরুতায়,
সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি যুগে যুগে হায়।
মোদের রুধিরে রাঙাইয়া তুলি মৃত্যুরে নিশিদিন,
শুধিতেছি মোরা পলে পলে ভীরু পিতা-পিতামহ-ঋণ !

লক্ষ্মী ! ওগো মা ভারত-লক্ষ্মী ! বল্, কতদিনে বল্—
খুলিবে প্রাচী-র রুদ্ধ-দুয়ার-মন্দির-অর্গল ?
যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মাখি ডুবিল সন্ধ্যা-রবি,
সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি !
কোটি লাঞ্ছনা-রক্ত-ললাট-পুব-মন্দির-দ্বারে
মুছে যায় নিতি ললাট-রক্ত রাঙাতে পূর্বাশারে,
'ঐ এল ঊষা' ফুকারে ভারত হেরি সে রক্ত-রেখা,
যে আশার বাণী লিখি মা রক্তে, বিধাতা মুছে সে লেখা !

সন্ধ্যা কি কাটিবে না ?
কত সে জনম ধরিয়া শুধিব এক জনমের দেনা ?
কোটি কর ভরি কোটি রাঙা হৃদি-জবা লয়ে করি পূজা,
না দিস্ আশিস, চণ্ডীর বেশে নেমে আয় দশভুজা।
মোদের পাপের নাহি যদি ক্ষয়, যদি না প্রভাত হয়,
প্রলয়ঙ্করী বেশে আসি কর্ ভীরুর ভারত লয়।
অসুরের হাতে লাঞ্ছনা আর হানিস্‌নে শঙ্করী,
মরিতেই যদি হয় মা, দে বর, দেবতার হাতে মরি !

তরুণ তাপস

রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল !
নাম্ রে ধূলায়—বর্তমানের মর্তপানে চল্।
ভবিষ্যতের স্বর্গ লাগি
শূন্যে চেয়ে আছিস্ জাগি,
অতীত কালের রত্ন মাগি
নামলি রসাতল।
অন্ধ মাতাল ! শূন্য পাতাল হাতালি নিষ্ফল॥

ভোল্ রে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল্।
তরুণ তাপস ! নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তোল্।

আদিম যুগের পুঁথির বাণী
আজো কি তুই চল্‌বি মানি ?
কালের বুড়ো টান্‌ছে ঘানি
তুই সে বাঁধন খোল্।
অভিজাতের পান্‌সে বিলাস-দুখের তাপস ! ভোল্॥

আমি গাই তারি গান

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজি ধরি অসি খরশান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিশ্বাসে
জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।
যারা ভেঙে চলে অপ-দেবতার মন্দির-আস্তানা,
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়ি-খানা।

যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল,
মিথ্যা মোহের পূজা-মুদ্গর ভাঙনের গদা লয়ে।
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে
দু'হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল। গোরস্থানেরে চষে
ছুঁড়ে ফেলে যত শব কঙ্কাল বসাল ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা।

গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান ! ...
—সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি।
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে,
নব জগতের দূর সন্ধানী অসীমের পথ-চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী !
সাগর-গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগ্দিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হতে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাঁহাদের গান গাহি।
গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে !
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী ঊষা ঘুম টুটি ঐ হাসে !

জীবন-বন্দনা

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে-ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র মরুর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।
এল দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী-মেরির যিশু—
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মতো ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে!
খেয়াল-খুশিতে কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুন চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।

আমি মরু-কবি—গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোনো বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডুক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

ভোরের পাখি

ওরে ও ভোরের পাখি !
আমি চলিলাম তোদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ রাখি।
তোদের কিশোর তরুণ গলার সতেজ দৃপ্ত সুরে
বাঁধিলাম বীণা, নিলাম সে সুর আমার কণ্ঠে পুরে।
উপলে নুড়িতে চুড়ি-কিঙ্কিণী বাজায়ে তোদের নদী
যে গান গাহিয়া অকূলে চাহিয়া চলিয়াছে নিরবধি—
তারি সে গতির নূপুর বাঁধিয়া লইলাম মম পায়ে,
এরি তালে মম ছন্দ-হরিণী নাচিবে তমাল-ছায়ে।

যে গান গাহিলি তোরা,
তারি সুর লয়ে ঝরিবে আমার গানের পাগল-ঝোরা।
তোদের যে গান শুনিয়া রাতের বনানী জাগিয়া ওঠে,
শিশু অরুণেরে কোলে করে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে,
গোঠে আনে ধেনু বাজাইয়া বেণু রাখাল বালক জাগি,
জল নিতে যায় নব আনন্দে নিশীথের হৃতভাগী,
শিখিয়া গেলাম তোদের সে গান ! তোদের পাখার খুশি—
যাহার আবেগে ছুটে আসে জেগে পুর-আঙিনায় উষী,
যাহার রণনে কুঞ্জে কাননে বিকাশে কুসুম-কুঁড়ি,
পলাইয়া যায় গহন-গুহায় আঁধার নিশীথ-বুড়ি,
সে খুশির ভাগ আমি লইলাম। অমনি পক্ষ মেলি
গাহিব ঊর্ধ্বে, ফুটিবে নিম্নে আবেশে চম্পা বেলি !

তোদের প্রভাতী ভিড়ে
ভিড়িলাম আমি, নিলাম আশয় তোদের ক্ষণিক নীড়ে।

ওরে ও নবীন যুবা !
তোদের প্রভাত-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিলরুবা।
তোদের চোখের যে জ্যোতি-দীপ্তি রাঙায় রাতের সীমা,
রবির ললাট হতে মুছে নেয় গোধূলির মলিনিমা,
যে-আলোক লভি দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে,
অকম্প যার শিখা সন্ধ্যার ম্লান অঞ্চল-তলে,
তোদের সে আলো আমার অশ্রু-কুহেলি-মলিন চোখে
লইলাম পুরি ! জাগে 'সুন্দর' আমার ধেয়ান-লোকে !

কাল-বৈশাখী

১

বারেবারে যথা কাল-বৈশাখী ব্যর্থ হলো রে পুব-হাওয়ায়,
দধীচি-হাড়ের বজ্র-বহ্নি বারেবারে যথা নিভিয়া যায়,
কে পাগল সেথা যাস্ হাঁকি—
'বৈশাখী কাল-বৈশাখী !'
হেথা বৈশাখী-জ্বালা আছে শুধু, নাই বৈশাখী-ঝড় হেথায়।
সে জ্বালায় শুধু নিজে পুড়ে মরি, পোড়াতে কারেও পারিনে, হায়॥

২

কাল-বৈশাখী আসিলে হেথায় ভাঙিয়া পড়িত কোন্ সকাল
ঘুণ-ধরা বাঁশে ঠেকা-দেওয়া ঐ সনাতন দাওয়া, ভগ্ন চাল।
এলে হেথা কাল-বৈশাখী
মরা গাঙে যেত বান্ ডাকি,
বদ্ধ জাঙাল যাইত ভাঙিয়া, দুলিত এ দেশ টাল্‌মাটাল।
শ্মশানের বুকে নাচিত তাথৈ জীবন-রঙ্গে তাল-বেতাল॥

৩

কাল-বৈশাখী আসেনি হেথায়, আসিলে মোদের তরু-শিরে
সিন্ধু-শকুন বসিত না আসি ভিড় করে আজ নদীতীরে।
জানি না কবে সে আসিবে ঝড়
ধূলায় লুটাবে শত্রুগড়,
আজিও মোদের কাটেনিকো শীত, আসেনি ফাগুন বন ঘিরে।
আজিও বলির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া ওঠেনি মন্দিরে॥

৪

জাগেনি রুদ্র, জাগিয়াছে শুধু অন্ধকারের প্রমথ-দল,
ললাট-অগ্নি নিবেছে শিবের ঝরিয়া জটার গঙ্গাজল।
জাগেনি শিবানী—জাগিয়াছে শিবা,
আঁধার সৃষ্টি—আসেনিকো দিবা,
এরি মাঝে হায়, কাল-বৈশাখী স্বপ্ন দেখিলি কে তোরা বল্ !
আসে যদি ঝড়, আসুক, কুলোর বাতাস কে দিবি অগ্রে চল্॥

নগদ কথা

দুন্দুভি তোর বাজ্‌ল অনেক
অনেক শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর,
মুখস্থ তোর মন্ত্ররোলে
মুখর আজি পূজার আসর,—
কুম্ভকর্ণ দেব্‌তা ঠাকুর
জাগবে কখন সেই ভরসায়
যুদ্ধভূমি ত্যাগ করে সব
ধন্না দিলি দেব্‌-দরজায়
দেব্‌তা-ঠাকুর স্বর্গবাসী
নাক ডাকিয়া ঘুমান সুখে,
সুখের মালিক শোকে কি—কে
কাঁদছে নিচে গভীর দুখে।
হত্যা দিয়ে রইলি পড়ে
শত্রু হাতে হত্যা-ভয়ে,
করবি কি তুই ঠুঁটো ঠাকুর
জগন্নাথের আশিস্‌ লয়ে।
দোহাই তোদের ! রেহাই দে ভাই
উঁচুর ঠাকুর দেব্‌তাদেরে,
শিব চেয়েছিস্‌—শিব দিয়েছেন
তোদের ঘরে ষণ্ড ছেড়ে।
শিবের জটার গঙ্গাদেবী
বয়ে বেড়ান ওদের তরী,
ব্রহ্মা তোদের রম্ভা দিলেন
ওদের দিয়ে সোনার জরি !
পূজার থালা বয়ে বয়ে
যে হাত তোদের হলো ঠুঁটো,
সে হাত এবার নিচু করে
টান না পায়ের শিকল্‌ দুটো।
ফুটো তোর ঐ টক্কা-নিনাদ
পলিটিক্সের ব্যারোয়ারিতে—

দোহাই থামা ! পারিস্ যদি
পড়্ নেমে ঐ লাল-নদীতে।
শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে
গয়া সবাই পেলি ক্রমে,
একটু দূরেই যমের দুয়ার
সেথাই গিয়ে দেখ্ না ভ্রমে।

জাগরণ

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি
ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশি !
ঘুমায় যারা মখ্‌মলের ঐ কোমল শয়ন পাতি
অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুখের রাতি।
আরাম-সুখের নিদ্রা তাদের ; তোর এ জাগার গান
ছোঁবে নাকো প্রাণ রে তাদের, যদিই বা ছোঁয় কান !

নির্ভয়ের ঐ সুখের কূলে বাঁধল যারা বাড়ি,
আবার তারা দেবে না রে ভয়ের সাগর পাড়ি।
ভিতর হতে যাদের আগল শক্ত করে আঁটা
'দ্বার খোলো গো' বলে তাদের দ্বারে মিথ্যা হাঁটা।
ভোল্ রে এ পথ ভোল্,
শান্তিপুরে শুনবে কে তোর জাগর-ডঙ্কা-রোল।

ব্যথাতুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে
তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের আফিম সর্বনেশে
ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুম-পুরে আসি
নতুন করে বাজা রে তোর নতুন সুরের বাঁশি !
নেশার ঘোরে জানে না হায়, এরা কোথায় পড়ে,
গলায় তাদের চালায় ছুরি কেই বা বুকে চড়ে,
এদের কানে মন্ত্র দে রে, এদের তোরা বোঝা,
এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা।

কর্ষণে যার পাতাল হতে অনুর্বর এই ধরা
ফুল-ফসলের অর্ঘ্য নিয়ে আসে আঁচল-ভরা,
কোন্ সে দানব হরণ করে সে দেব-পূজার ফুল—
জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, ভাঙ্ রে তাদের ভুল !

বর্বরদের অনুর্বর ঐ হৃদয়-মরু চষে
ফল ফলাতে পারে এরাই আবার ঘরে বসে।
বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে নগর বসায় যারা
রসাতলে পশ্‌বে মানুষ-পশুর ভয়ে তারা ?
তাদেরই ঐ বিতাড়িত বন্য পশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্য-সাজে সাজি।
টান মেরে ফেল্ মুখোশ তাদের, নখর দন্ত লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে !

তারাই দানব অত্যাচারী—যারা মানুষ মারে,
সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মারতে ডরাস্ কারে ?
এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা !
নতুন যুগের নতুন নকিব, বাজা নতুন বাঁশি,
স্বর্গ-রানি হবে এবার মাটির মায়ের দাসী !

জীবন

জাগরণের লাগল ছোঁয়াচ মাঠে মাঠে তেপান্তরে,
এমন বাদল ব্যর্থ হবে তন্দ্রা-কাতর কাহার ঘরে ?
তড়িৎ ত্বরা দেয় ইশারা, বজ্র হেঁকে যায় দরজায়,
জাগে আকাশ, জাগে ধরা—ধরার মানুষ কে সে ঘুমায় ?
মাটির নিচে পায়ের তলায় সেদিন যারা ছিল মরি,
শ্যামল তৃণাঙ্কুরে তারা উঠল বেঁচে নতুন করি।
সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাগুন-হোলি,
বজ্রাঘাতে ফুটল না যে, ফুটবে আনন্দে সে কলি !

যৌবন

—ওরে ও শীর্ণা নদী,
দু'তীরে নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি?
নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ-জোয়ারে কি দুলিবি না?
নাচিবে জোয়ারে পদ্মা গঙ্গা, তুই রবি চির-ক্ষীণা?
ভরা ভাদরের বরিষণ এসে বারেবারে তোর কূলে
জানাবে রে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবি না ভুলে?
দুই কূলে বাঁধি প্রস্তর-বাঁধ কূল ভাঙিবার ভয়ে
আকাশের পানে চেয়ে রবি তুই শুধু আপনারে লয়ে?
ভেঙে ফেল্ বাঁধ, আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-ঢল
তারে বুকে লয়ে দুলে ওঠ্ তুই যৌবন-টলমল।
প্রস্তর-ভরা দুই কূল তোর ভেসে যাক্ বন্যায়,
হোক উর্বর, হাসিয়া উঠুক ফুলে ফলে সুষমায়।
—একবার পথ ভোল্,
দূর সিন্ধুর লাগি তোর বুকে জাগুক মরণ-দোল!

তরুণের গান

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

নব জীবনের ফোরাত-কূলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর,
ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ুরোপ-এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর
এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই;
আজো নমরুদ ইব্রাহিমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল-তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরাজীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হতে।
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে-দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

চল্ চল্ চল্

কোরাস্ :

চল্ চল্ চল্ !
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

কোরাস্ :

ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদি-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ—
খোল্ রে নিঁদ্-মহল্।

কবে সে খোয়ালি বাদ্‌শাহি
সেই সে অতীতে আজো চাহি
যাস্‌ মুসাফির গান গাহি
ফেলিস্‌ অশ্রুজল।

যাক্‌ রে তখ্‌ত্‌-তাউস
জাগ্‌ রে জাগ্‌ বেহুঁশ !
ডুবিল রে দেখ্‌ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক রুশ,
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ্‌ হীনবল !
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল !
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥

ভোরের সানাই

বাজল কি রে ভোরের সানাই
নিঁদ-মহলার আঁধার-পুরে।
শুনছি আজান গগন-তলে
অতীত-রাতের মিনার-চূড়ে॥

সরাই-খানার যাত্রীরা কি
'বন্ধু জাগো' উঠ্‌ল হাঁকি ?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখি
গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে॥

আজ কি আবার কাবার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হতে।
নামল কি ফের হাজার স্রোতে
হেরা'র জ্যোতি জগৎ জুড়ে॥

আবার খালেদ তারিক মুসা
আনল কি খুন-রঙিন্‌ ভূষা
আস্‌ল ছুটে হাসিন্‌ উষা
নও-বেলালের শিরিন্‌ সুরে॥

তীর্থ-পথিক দেশ-বিদেশের
আর্‌ফাতে আজ জুটল কি ফের,
'লা-শরিক আল্লাহ্‌'-মন্ত্রের
নাম্‌ল কি বান পাহাড় 'তুরে'॥

আঁজ্‌লা ভরে আনল কি প্রাণ
কার্‌বালাতে বীর শহীদান,
আজকে রওশন জমিন-আস্‌মান
নওজোয়ানির সুর্‌খ্‌ নূরে॥

যৌবন-জল-তরঙ্গ

এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?
যে সিন্ধু-জলে ডাকিয়াছে বান—তাহারি তরে এ চন্দ্রোদয়,
বাঁধ বেঁধে থির আছে নালা ডোবা, চাঁদের উদয় তাদের নয়।
যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, মাঠে ঘাটে বাটে নেমেছে ঢল,
জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি শাপ দিক্ তাঁরে অনর্গল।
সারস মরাল ছুটে আয় তোরা! ভাসিল কুলায় যে-বন্যায়
সেই তরঙ্গে ঝাঁপায়ে দোল্ রে সর্বনাশের নীল দোলায়!

খর স্রোতজলে কাদা-গোলা বলে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদ্গব,
গলিত শবের ভাগাড়ের ওরা, ওরা মৃত্যুর করে স্তব।
ওরাই বাহন জরা-মৃত্যুর, দেখিয়া ওদের হিংস্র চোখ—
রে ভোরের পাখি! জীবন-প্রভাতে গাহিবি না নব পুণ্য-শ্লোক?

ওরা নিষেধের প্রহরী পুলিশ, বিধাতার নয়—ওরা বিধির!
ওরাই কাফের, মানুষের ওরা তিলে তিলে শুষে প্রাণ-রুধির!
বল্ তোরা নব-জীবনের ঢল! হোক ঘোলা—তবু এই সলিল
চির-যৌবন দিয়াছে ধরারে, গেরুয়া-মাটিরে করেছে নীল!
নিজেদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু-বীজাণু যারা জিয়ায়,
তারা কি চিনিবে—মহাসিন্ধুর উদ্দেশে ছোটে স্রোত কোথায়!
স্থাণু গতিহীন পড়ে আছে তারা আপনারে লয়ে বাঁধিয়া চোখ
কোটরের জীব, উহাদের তার নহে উদীচীর উষা-আলোক।

আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চ্যাঁচায় প্যাঁচারা, ওরা চ্যাঁচাক।
মোরা গাব গান, ওদেরে মারিতে আজো বেঁচে আছে দেদার কাক।
জীবনে যাদের ঘনাল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতের শুনে আজান
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক্ গালি—তোরা দিস্‌নে কান।
উহাদের তরে হতেছে কালের গোরস্থানে রে গোর-খোদাই,
মোদের প্রাণের রাঙা জলসাতে জরা-জীর্ণের দাওত নাই।

জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে বসে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল্,
আকাশের পাখি! উর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরি তোল্!

তোরা ঊর্ধের—অমৃত-লোকের, ছুড়ুক নীচেরা ধুলাবালি,
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনি ডিবে—কালি ঢালি!
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল;
ওরা দিক কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল—ওরা পশুর দল!

তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিজ পাঁক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক্!
শাখা ভরে আনে ফুল-ফল, সেথা নীড় রচি গাহে পাখিরা গান,
নিচের মানুষ তাই ছোঁড়ে ঢিল, তরুর নহে সে অসম্মান।

কুসুমের শাখা ভাঙে বাঁদরের উৎপাতে, হায়, দেখিয়া তাই—
বাঁদর খুশিতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই!
মাথার ঘায়েতে পাগল উহারা, নিস্নে তরুণ ওদের দোষ!
কাল হবে বা'র জানাজা যাহার, সে বুড়োর পরে বৃথা এ রোষ!

যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যেরে তোরা দানিবি তখ্ত,
ছুঁচো মেরে তার খোয়াস্নে মান, ফুরায়ে এসেছে ওদের ওক্ত্!
যে বন কাটিয়া বসাবি নগর তাহার শাখার দুটো আঁচড়
লাগে যদি গায়, সয়ে যা না ভাই, আছে তো কুঠার হাতের 'পর!
যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—
মানেনি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
ওরা দিক্ গালি, মোরা হাসি খালি বলিব 'ইন্না... রাজেউন!'

রীফ-সর্দার

তোমারে আমরা ভুলেছি আজ,
হে নবযুগের নেপোলিয়ন,
কোন্ সাগরের কোন্ সে পার
নিবু-নিবু আজ তব জীবন।

তোমার পরশে হলো মলিন
কোন্ সে দ্বীপের দীপালি-রাত,
বন্দিছে পদ সিন্ধুজল,
ঊর্ধ্বে শ্বসিছে ঝঞ্ঝাবাত।

তব অপমানে, বন্দী-রাজ,
লজ্জিত সারা নর-সমাজ,
কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বাস
আজি বীরত্বে হানিছে লাজ।

মোরা জানি আর জানে জগৎ
শত্রু তোমারে করেনি জয়,
পাপ অন্যায় কপট ছল
হইয়াছে জয়ী, শত্রু নয়!

সম্মুখে রাখি মায়া-মৃগ
পশ্চাৎ হতে হানে শায়ক
বীর নহে তারা ঘৃণ্য ব্যাধ
বর্বর তারা নর-ঘাতক।

হে মরু-কেশরী আফ্রিকার
কেশরীর সাথে হয়নি রণ,
তোমারে বন্দী করেছে আজ
সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।

কামানের চাকা যথা অচল
রৌপ্যের চাকি ঢালে সেথায়,
এরাই য়ুরোপী বীরের জাত
শুনে লজ্জাও লজ্জা পায়।

তুমি দেখাইলে আজও ধরায়
শুধু খ্রিস্টের রাসভ নাই,
আজও আসে হেথা বীর মানব,
ইব্‌নে-করিম কামাল-ভাই।

আজও আসে হেথা ইব্‌নে-সৌদ্,
আমানুল্লাহ্, পহ্‌লবি,
আজও আসে হেথা আল্‌তরাশ,
আসে সনৌসী—লাখ রবি।

*

তুমি দেখাইলে, পাহাড়ি গাঁয়
থাকে নাকো শুধু পাহাড়ি মেষ
পাহাড়েও হাসে তরুলতা
পাহাড়ের মতো অটল দেশ।

থাকে নাকো সেথা শুধু পাথর,
সেথা থাকে বীর শ্রেষ্ঠ নর,
সেথা বন্দরে বানিয়া নাই
সেথা বন্দরে নাই বাঁদর !

শির-দার তুমি ছিলে রীফের,
পরোনিকো শিরে শরিফি তাজ,
মামুলি সেনার সাথে সমান
করেছ সেনানী, কুচকাওয়াজ !

শুধু বীর নহ, তুমি মানুষ,
শাহি তখ্‌ত্ ছিল গিরি-পাষাণ,
রণভূমে ছিলে রণোন্মাদ,
দেশে ছিলে দোস্ত্ মেহেরবান।

রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত
নাচিতে লাগিল তাথৈ থৈ,
আসমান হতে রীফ-বাসীর
শিরে ছড়াইল আগুন-খৈ,

কচি বাচ্চারে নারীদেরে
মারিল বক্ষে বিঁধে সঙিন,
যুদ্ধে আহত বন্দীরে
খুন করে যার হাত রঙিন,

হয়েছে বন্দী তারা যখন—
(ওদের ভাষায়—হে 'বর্বর' !)
করিয়াছ ক্ষমা তাহাদেরে,
তাহাদের করে রেখেছ কর।

ওগো বীর ! বীর বন্দীদের,
করোনিকো তুমি অসম্মান,
তাদের নারী ও শিশুদেরে
দিয়েছো ফিরায়ে—হরোনি প্রাণ।

তুমি সভ্যতা-গর্বীদের
মিটাওনি শুধু যুদ্ধ-সাধ,
তাদেরে শিখালে মানবতা,
বীরও সে মানুষ, নহে নিষাদ।

*

বীরেরে আমরা করি সালাম,
শ্রদ্ধায় চুমি দস্ত্ দারাজ,
তোমারে স্মরিয়া কেন যেন
কেবলি অশ্রু ঝরিছে আজ।

তব পতনের কথা করুণ
পড়িতেছে মনে একে একে,
তব মহত্ত্ব তুমি নিজে
মানুষের বুকে গেলে লেখে।

মাসতুতো ভাই চোরে চোরে—
ফ্রান্স স্পেন করি আঁতাত্
হয়ে লাঞ্ছিত বারম্বার
হায়ওয়ান্ সাথে মিলাল হাত।

শয়তানি ছল ফেরেব-বাজ
ভুলাল দেশ-দ্রোহীর মন,
অর্থ তাদের করিল জয়
অস্ত্রে যাহারা জিনিল রণ।

স্বদেশবাসীরে কহ ডাকি
অশ্রু-সিক্ত নয়নে, হায়—
'ভাঙে নাই বাহু, ভেঙেছে মন,
বিদায় বন্ধু, চির-বিদায় !'

বলিলে, 'স্বদেশ ! রীফ-শরিফ !
পরানের চেয়ে প্রিয় আমার !
তুমি চেয়েছিলে মা আমায়,
সন্তান তব চাহে না আর !

'মা গো তোরে আমি ভালবাসি,
ভালবাসি মা তারও চেয়ে—
মোর চেয়ে প্রিয় রীফ-বাসী
তোর এ পাহাড়ি ছেলেমেয়ে !

'মা গো আজ তারা বোঝে যদি,
করিতেছি ক্ষতি আমি তাদের,
আমি চলিলাম, দেখিস তুই,
তারা যেন হয় আজাদ ফের !'

দেশবাসী-তরে, মহাপ্রেমিক,
আপনারে বলি দিলে তুমি,
ধন্য হইল বেড়ি-শিকল
তোমার দস্ত-পদ চুমি !

আজিকে তোমায় বুকে ধরি
ধন্য হইল সাগর-দ্বীপ,
ধন্য হইল কারা-প্রাচীর,
ধন্য হইনু বদ্-নসিব।

কাঠ-মোল্লার মৌলবির
যুজ্দানে ইস্লাম কয়েদ,
আজও ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরি বরে, মোজাদ্দেদ্ !

বদ্-কিস্মত্ শুধু রীফের
নহে বীর, ইসলাম-জাহান
তোমারে স্মরিয়া কাঁদিছে আজ,
নিখিল গাহিছে তোমার গান।

হে শাহান্শাহ্ বন্দিদের !
লাঞ্ছিত যুগে যুগাবতার !
তোমার পুণ্যে তীর্থ আজ
হলো গো কারার অন্ধকার !

তোমার পুণ্যে ধন্য আজ
মরু-আফ্রিকা মূর-আরব,
ধন্য হইল মুসলমান,
অধীন বিশ্ব করে স্তব।

জানি না আজিকে কোথা তুমি,
নয়ি দুনিয়ার মুসা তারিক !
আছে 'দীন', নাই সিপা'-সালার,
আছে শাহি তখ্ত্, নাই মালিক।

মোরা যে ভুলেছি, ভুলিও বীর,
নাই স্মরণের সে অধিকার,
কাঁদিছে কাফেলা কারবালায়,
কে গাহিবে গান বন্দনার !

আজিকে জীবন-'ফোরাত'-তীর
এজিদের সেনা ঘিরিয়া ঐ,
শিরে দুর্দিন-রবি প্রখর,
পদতলে বালু ফোটায় খই।

জয়নাল সম মোরা সবাই
শুইয়া বিমারি খিমার মাঝ,
আফসোস্ করি কাঁদি শুধু,
দুশ্মন্ করে লুট্তরাজ !

আব্বাস সম তুমি হে বীর
গেণ্ডুয়া খেলি অরি-শিরে
পহুঁছিলে একা ফোরাত-তীর,
ভরিলে মশক্ প্রাণ-নীরে।

তুমি এলে, সাথে এল না দস্ত,
করিল শত্রু বাজু শহীদ,
তব হাত হতে আব-হায়াত
লুটে নিল ইউরোপ-এজিদ।

কাঁদিতেছি মোরা তাই শুধুই
দুর্ভাগ্যের তীরে বসি,
আকাশে মোদের ওঠে কেবল
মোহর্‌রমের লাল শশী!

এরি মাঝে কভু হেরি স্বপন—
ঐ বুঝি আসে খুশির ঈদ,
শহীদ হতে তো পারি না কেউ—
দেখি কে কোথায় হলো শহীদ!

ক্ষমিও বন্ধু, তব জাতের
অক্ষমতার এ অপরাধ,
তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত,
ওগো মগ্‌রেবি ঈদের চাঁদ!

এ গ্লানি লজ্জা পরাজয়ের
নহে বীর, নহে তব তরে!
তিলে তিলে মরে ভীরু য়ুরোপ
তব সাথে তব কারা-ঘরে।

বন্দী আজিকে নহ তুমি
বন্দী—দেশের অবিশ্বাস।
আসিছে ভাঙিয়া কারা-দুয়ার
সর্বগ্রাসীর সর্বনাশ!

বাংলার 'আজিজ'

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর-সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান।
ফজর বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার 'পর,
ঘুম-টুটানো আজান দিলে—'আল্লাহো আক্‌বর !'
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা,
লেখার যত ইসলামি জোশ্ তোমায় দিল দেখা।

খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠল নেচে দু'ধারী তল্‌য়ার !
চম্‌কে সবাই উঠল জেগে, ঝলসে গেল চোখ,
নৌজোয়ানির খুন-জোশিতে মস্‌ত হলো সব লোক !
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ-শাবক দল,
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাংলা টলমল !
এলে নিশান্-বরদার্ বীর, দুশমন পর্দার,
লায়লা চিরে আনলে নাহার, রাতের তারা-হার !

সাম্যবাদী ! নর-নারীরে করতে অভেদ জ্ঞান,
বন্দিনীদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান !
শীতের জরা দূর হয়েছে, ফুটছে বাহার-গুল,
গুলশনে গুল ফুটল যখন—নাই তুমি বুলবুল !
মশাল-বাহী বিশাল পুরুষ ! কোথায় তুমি আজ ?
অন্ধকারে হাতড়ে মরে অন্ধ এ-সমাজ।
নাইকো সতুন, পড়ছে খসে ইসলামের আজ ছাদ,
অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর ঘোষ্‌বে কে জেহাদ ?

যেম্‌নি তুমি হালকা হলে আপ্‌না করি দান,
শুন্‌লে হঠাৎ—আলোর পাখি—কাজ-হারানো গান !

ফুরিয়েছে কাজ, ডাকছে তবু হিন্দু-মুসলমান,
সবার 'আজিজ', সবার প্রিয়, আবার গাহ গান!
আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু-সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর!

সুরের দুলাল

পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন-শেষে,
সুরের দুলাল, আসলে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বর-বেশে!
আজো মালা হয়নি গাঁথা হয়নি আজো গান রচন,
কুহেলিকা পর্দা-ঢাকা আজো ফুলের সিংহাসন।
অলস বেলায় হেলাফেলায় ঝিমায় রূপের রঙমহল,
হয়নিকো সাজ রূপ-কুমারীর, নিদ টুটেছে এই কেবল।
আয়োজনের অনেক বাকি—শুননু হঠাৎ খোশ্‌খবর,
ওরে অলস, রাখ্‌ আয়োজন, সুর-শা'জাদা আসল ঘর।
ওঠ্‌ রে সাকি, থাক্‌ না বাকি ভরতে রে তোর লাল গেলাস,
শূন্য গেলাস ভরব—দিয়ে চোখের পানি মুখের হাস।
দম্ভভরে আসল না যে ধ্বজায় বেঁধে ঝড়-তুফান
যাহার আসার খবর শুনে গর্জাল না তোপ-কামান,
কুসুম দলি উড়িয়ে ধূলি আসল না যে রাজপথে—
আয়োজনের আড়াল তারে করব গো আজ কোন্‌মতে।
সে এল গো যে-পথ দিয়ে স্বর্গে বহে সুরধুনী,
যে পথ দিয়ে ফেরে ধেনু মাঠের বেণুর রব শুনি।
যেমন সহজ পথ দিয়ে গো ফসল আসে আঙিনায়,
যেমন বিনা সমারোহে সাঁঝের পাখি যায় কুলায়।
সে এল যে আমন-ধানের নবান্ন উৎসব-দিনে,
হিমেল হাওয়ায় অঘ্রানের এই সুঘ্রাণেরি পথ চিনে।

আনেনি সে হরণ করে রত্ন-মানিক সাত-রাজার,
সে এনেছে রূপকুমারীর আঁখির প্রসাদ, কণ্ঠহার।

সুরের সেতু বাঁধল সে গো, ঊর্ধ্বে তাহার শুনি স্তব,
আসছে ভারত-তীর্থ লাগি শ্বেত-দ্বীপের ময়-দানব।

পশ্চিমে আজ ডঙ্কা বাজে পুবের দেশের বন্দীদের,
বীণার গানে আমরা জয়ী, লাজ মুছেছি অদৃষ্টের।

কণ্ঠ তোমার জাদু জানে, বন্ধু ওগো দোসর মোর !
আসলে ভেসে গানের ভেলায় বৃন্দাবনের বংশী-চোর।
তোমার গলার বিজয়-মালা বন্ধু একা নয় তোমার,
ঐ মালাতে রইল গাঁথা মোদের সবার পুরস্কার।
কখন আঁখির অগোচরে বসলে জুড়ে হৃদয়-মন,
সেই হৃদয়ের লহ প্রীতি, সজল আঁকির জল-লিখন।

নিশীথ-অন্ধকারে

গান

একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে
নিশীথ-অন্ধকারে।
পুরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রু-ধারে
নিশীথ-অন্ধকারে॥

ঘিরিয়াছে দিক ঘন ঘোর মেঘে,
পুবালি বাতাস বহিতেছে বেগে,
বন্দিনী মাতা একাকিনী জেগে কাঁদিতেছে কারাগারে,
শিয়রের দীপ যত সে জ্বালায় নিভে যায় বারেবারে।
নিশীথ-অন্ধকারে॥

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার-চূড়ে,
বহে না শিরাজ-বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে।
ছিল শুধু চাঁদ, গেছে তরবার,
সে চাঁদও আঁধারে ডুবিল এবার,
শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে।
উঠিতেছে সুর বিদায়-বিধুর পারাবার-পরপারে।
নিশীথ-অন্ধকারে॥

ছিল না সে রাজা—কেঁপেছে বিশ্ব তবু গো প্রতাপে তার,
শত্রু-দুর্গে বন্দী থাকিয়া খোলেনি সে তরবার।
ছিল এ ভারত তারি পথ চাহি,
বুকে বুকে ছিল তারি বাদশাহি,
ছিল তার তরে ধূলার তখ্‌ত্ মানুষের দরবারে।
আজি বরষায় তারি তরবার ঝলসিছে বারে বারে।
নিশীথ-অন্ধকারে॥

শরৎচন্দ্র

চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত ছন্দ

নব ঋত্বিক নবযুগের!
নমস্কার! নমস্কার!
আলোকে তোমার পেনু আভাস
নওরোজের নব ঊষার!
তুমি গো বেদনা-সুন্দরের
দরদ্-ই-দিল্, নীল মানিক,
তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো
ধ্বনিল সাম বেদনা-ঋক্।
হে উদীচী ঊষা চির-রাতের,
নরলোকের হে নারায়ণ!
মানুষ পারায়ে দেখিলে দিল্—
মন্দিরের দেব-আসন।
শিল্পী ও কবি আজ দেদার
ফুলবনের গাইছে গান,
আসমানি-মৌ স্বপনে গো
সাথে তাদের করোনি পান।
নিঙাড়িয়া ধূলা মাটির রস
পিইলে শিব নীল আসব,
দুঃখ কাঁটায় ক্ষত হিয়ার
তুমি তাপস শোনাও স্তব।

স্বর্গভ্রষ্ট প্রাণধারায়
তব জটায় দিলে গো ঠাঁই,
মৃত সগরের এই সে দেশ
পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই।
পায়ে দলি পাপ সংস্কার
খুলিলে বীর স্বর্গদ্বার,
শুনাইলে বাণী, 'নহে মানব—
গাহি গো গান মানবতার।
মনুষ্যত্ব পাপী তাপীর
হয় না লয়, রয় গোপন,
প্রেমের জাদু-স্পর্শে সে
লভে অমর নব জীবন !'

নির্মমতায় নর-পশুর
হায় গো যার চোখের জল
বুকে জমে হলো হিম-পাষাণ,
হলো হৃদয় নীল গরল ;
প্রখর তোমার তপ-প্রভায়
বুকের হিম গিরি-তুষার—
গলিয়া নামিল প্রাণের ঢল,
হলো নিখিল মুক্ত-দ্বার।
শুভ্র হলো গো পাপ-মলিন
শুচি তোমার সমব্যথায়,
পাঁকের ঊর্ধ্বে ফুটিল ফুল
শঙ্কাহীন নগ্নতায়।
শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার
রুচি-শিবার হট্টরোল
ভাগাড়ে শ্মশানে উঠিল ঘোর,
কাঁদে সমাজ চর্মলোল
ঊর্ধ্বে যতই কাদা ছিটায়
হিংসুকের নোংরা কর,
সে কাদা আসিয়া পড়ে সদাই
তাদেরি হীন মুখের 'পর !

চাঁদে কলঙ্ক দেখে যারা
জ্যোৎস্না তার দেখেনি, হায় !
ক্ষমা করিয়াছ তুমি, তাদের
লজ্জাহীন বিজ্ঞতায় !
আজ যবে সেই পেচক-দল
শুনি তোমার করে স্তব,
সেই তো তোমার শ্রেষ্ঠ জয়,
নিন্দুকের শঙ্খ-রব !

ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির
'ইতি গজের' করুক ভান !
সব্যসাচী গো, ধরো ধনুক—
হানো প্রখর অগ্নিবাণ !
'পথের দাবী'র অসম্মান
হে দুর্জয়, করো গো ক্ষয় !
দেখাও স্বর্গ তব বিভায়
এই ধূলার ঊর্ধ্বে নয় !

দেখিছ কঠোর বর্তমান,
নয় তোমার ভাব-বিলাস,
তুমি মানুষের বেদনা-ঘায়
পাওনি গো ফুল-সুবাস।
তোমার সৃষ্টি মৃত্যুহীন
নব ধরার জীবন-বেদ,
করোনি মানুষে অবিশ্বাস
দেখিয়া পাপ পঙ্ক ক্লেদ।
পুষ্পবিলাস নয় তোমার
পাওনি তাই পুষ্প-হার,
বেদনা-আসনে বসায়ে আজ
করে নিখিল পূজা তোমার।

অসীম আকাশে বাঁধোনি ঘর
হে ধরণীর নীল দুলাল !
তব সাম-গান ধুলামাটির
রবে অমর নিত্যকাল !

হয়তো আসিবে মহাপ্রলয়
এ দুনিয়ার দুঃখ-দিন
সব যাবে শুধু রবে তোমার
অশ্রুজল অন্তহীন।
অথবা যেদিন পূর্ণতায়
সুন্দরের হবে বিকাশ,
সেদিনো কাঁদিয়া ফিরিবে এই
তব দুখের দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের কবি ! যদি মাটির
এই মানুষ বাঁচিয়া রয়—
রবে প্রিয় হয়ে হৃদি-ব্যথায়,
সর্বলোক গাহিবে জয় !

অন্ধ স্বদেশ-দেবতা

ফাঁসির রশ্মি ধরি
আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পলে পলে অনুসরি
মৃত্যু-গহন-যাত্রীদলের লাল পদাঙ্ক-রেখা।
যুগযুগান্ত-নির্জিত-ভালে নীল কলঙ্ক-লেখা !

নিরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি,
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,—
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,
সেই পথে ফেলে চরণ—যে পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে !
নির্যাতনের যে যষ্টি দিয়া শত্রু আঘাত হানে
সেই যষ্টিরে দোসর করিয়া অলক্ষ্য পথ-পানে
চলেছে দেবতা—অন্ধ দেবতা—পায়ে পায়ে পলে পলে,
যত ঘিরে আসে পথ-সঙ্কট চলে তত নববলে।
ঢলে পড়ে পথ 'পরে,
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া তুলে ধরে বুকে করে !

অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ারে যথায় বন্দী জাগে,
যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,
যথায় পিষ্ট হতেছে আত্মা নিষ্ঠুর মুঠি-তলে,
যথায় অন্ধ গুহায় ফণীর মাথায় মানিক জ্বলে,
যথায় বন্য শ্বাপদের সাথে নখর দন্ত লয়ে
জাগে বিনিদ্র-বন্য-তরুণ ক্ষুধার তাড়না সয়ে,
যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁদে,—
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে,—
'ওরে ওঠ্ ত্বরা করি,
তোদের রক্তে রাঙা ঊষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী !'

তিমির রাত্রি, ছুটেছে যাত্রী নিরুদ্দেশের ডাকে,
জানে না কোথায় কোন্ পথে কোন্ ঊর্ধ্বে দেবতা হাঁকে।
শুনিয়াছে ডাক এই শুধু জানে ! আপনার অনুরাগে
মাতিয়া উঠেছে অলস চরণ, সম্মুখে পথ জাগে !
জাগে পথ, জাগে ঊর্ধ্বে দেবতা, এই দেখিয়াছে শুধু,
কে দেখে সে পথে চোরা বালুচর, পর্বত, মরু ধূ ধূ !
ছুটেছে পথিক, সাথে চলে পথ অমানিশি চলে সাথে,
পথে পড়ে ঢলে, মৃত্যুর ছলে ধরে দেবতার হাতে।
চলিতেছে পাশাপাশি—
মৃত্যু, তরুণ, অন্ধ দেবতা, নবীন ঊষার হাসি !

পাথেয়

দরদ দিয়ে দেখল না কেউ যাদের জীবন যাদের হিয়া,
তাদের তরে ঝড়ের রথে আয় রে পাগল দরদিয়া।
শূন্য তোদের ঝোলা-ঝুলি, তারি তোরা দর্প নিয়ে
দর্পীদের ঐ প্রাসাদ-চূড়ে রক্ত-নিশান যা টাঙিয়ে।
মৃত্যু তোদের হাতের মুঠায়, সেই তো তোদের পরশ-মণি,
রবির আলোক ঢের সয়েছি, এবার তোরা আয় রে শনি !

দাড়ি-বিলাপ*

হে আমার দাড়ি !
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি
আমারে কাঙাল করি, শূন্য করি বুক !
শূন্য এ চোয়াল আজি শূন্য এ চিবুক !

তোমার বিরহে বন্ধু, তোমার প্রেয়সী
ঝুরিছে শ্যামলী গুম্ফ ওষ্ঠকূলে বসি।
কপোল কপোল ঠুকি করে হাহাকার—
'রে কপটি, রে সেফ্‌টি (Safety) জিলেট রেজার !' ...

একে একে মনে পড়ে অতীতের কথা—
তখনো ফোটেনি মুখে দাড়ির মমতা !
তখনো এ গাল ছিল সাহারার মরু,
বে-পাল মাস্তুল কিংবা বি-পল্লব তরু !
স্বজাতির ভীরুতার ইতিহাস স্মরি
বাহিয়া বি-শ্মশ্রু গণ্ড অশ্রু যেত ঝরি।
নারীসম কেশ বেশ, নারীকেলী মুখ,
নারীকেলী হুঁকা খায় ! —পুরুষ উৎসুক
নারীর 'নেচার' নিতে, হা ভারত মাতা !
নারী-মুণ্ড হলো আজি নর বিশ্বত্রাতা !

চলিত কাবুলিওয়ালা গুঁতো-হস্তে পথে
উড়ায়ে দাড়ির ধ্বজা, আফ্‌গানিয়া রথে
সুকৃষ্ণ নিশান যেন ! অবাক বিস্ময়ে
মহিলা-মহলে নিজ নারী-মুখ লয়ে
রহিতাম চাহি আমি ঘুলঘুলি-ফাঁকে,
বেচারি বাঙালি দাড়ি, কে শুধায় তাকে ?
চলিত মটরু মিঞা চামারুর নানা,
মনে হতো, এ দাড়িও ধার করে আনা
কাবুলির দেনা-সাথে ! বাঙালির দাড়ি
বাঙালির শৌর্য-সাথে গিয়াছে গো ছাড়ি !

---

* কোনো প্রফেসার বন্ধুর দাড়ি-কর্তন উপলক্ষে রচিত।

দাড়ির দাড়িম্ব-বনে ফেরে নাকো আর
নির্মুক্ত হিড়িম্বা সতী, সে যুগ ফেরার !
জামাতারে হেরি শ্বশ্রূ লুকালো যেমনি ! ...
'রেজারে' হেরিয়া শ্মশ্রু লুকালো তেমনি !
ভোজপুরি দারোয়ান তারও দাড়ি আছে,
চলিতে সে দাড়ি যেন শিখী-পুচ্ছ নাচে !
পাঞ্জাবি, বেলুচি, শিখ, বীর রাজপুত,
দরবেশ, মুনি, ঋষি, বাবাজি অদ্ভুত,
বোকেন্দ্র-গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে,
শিম্পাঞ্জি, গরিলা—হায়, বাদ দিই কাকে !
এমন যে বটবৃক্ষ তারও নামে ঝুরি,
ঝুরি নয়, ও যে দাড়ি, করিয়াছে চুরি
বনের মানুষ হতে ! তাই সে বনস্পতি আজ !
দাড়ি রাখে গুল্মলতা রসুন পেঁয়াজ !
হাটে দাড়ি, মাঠে দাড়ি, দাড়ি চারিধার,
লক্ষধারে ঝরে যেন দাড়ি-বারিধার !
ঝরে যবে বৃষ্টিধারা নীল নভ বেয়ে
মনে হয় গাড়ি গাড়ি দাড়ি গেছে ছেয়ে
ধরণীর চোখে-মুখে ; সে সুখ-আবেশে
নব নব পুষ্পে তৃণে ধরা ওঠে হেসে !

মুকুরে হেরিয়া নিজ বি-শ্মশ্রু বদন
লজ্জায় মুদিয়া যেত আপনি নয়ন।
হায় রে কাঙালি,
রহিলি তুই-ই রে হয়ে মাকুন্দা বাঙালি !
এতেক চিন্তিয়া এক ক্ষুর করি ক্রয়
চাঁছিতে লাগিনু গাল সকল সময়।
বহু সাধ্য সাধনায় বহু বর্ষ পরে
উদিল নবীন দাড়ি ! যেন দিগন্তরে
কৃষ্ণ মেঘ দিল দেখা অজন্মার দেশে,
লালিম্‌লি-পার্শ্বেল যেন অঘ্রানের শেষে !

সে দাড়ি-গৌরব বহি সুউচ্চ মিনারে
দাঁড়াইয়া ঘোষিতাম, 'এই দাড়িকারে
নিন্দে যারা, তারা ভীরু তারা কাপুরুষ !

হায় রে বেহুঁশ,
নারী তো নরের রূপ পেতে নাহি চায়,
তাদের হয় না দাড়ি, গুম্ফ না গজায় !
দাড়ি রাখি হইয়াছি শ্রীহীন মিয়া !
কিন্তু বন্ধু, তোমরা যে শ্রীমতী অমিয়া
হইতেছ দিনে দিনে !
কেবা নর কেবা নারী কেহ নাহি চিনে।'
কে কাহার কথা শোনে, ওরা করে 'শেভ্',
আমারে দেখিলে বলে—'ঐ অজদেব !'
হই অজ-মুণ্ড আমি তবু দক্ষ-রাজা,
দক্ষেরই জামাতা শিব—(খায় খাক গাঁজা !)
দিনে দিনে বাড়ে দাড়ি রেজার-কর্ষণে,
শস্য-শ্যামা ধরা যেন মলের ঘর্ষণে !

* * *

একাদশ বর্ষ পরে—হায় রে নিয়তি
কে জানে আমার ভাগ্যে ছিল এ দুর্গতি !
সেদিন কার্জন-হলে দিলীপকুমার
আসিল গাহিতে গান, কে কবে শুমার
কত যে আসিল নর কত সে যে নারী !
ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি, কত ধুতি শাড়ি
ছিঁড়িল পশিতে সেথা ! চেনা নাহি যায়
কেবা নর কেবা নারী—এক কেশ এক বেশ, হায় !
সে নিখিল নারী-সভা-মাঝে
হেরিলাম, আমারি সে জয়ডঙ্কা বাজে
মুখে মুখে দিকে দিকে ! আমি কৃষ্ণ-সম
একাকী পুরুষ বিরাজিনু অনুপম।
সম্মুখে বালিকা এক গাহিতে বসিয়া
ভুলি গেল সুর-লয় মোরে নিরখিয়া।
বলে, 'মাগো, ও কি দাড়ি, দেখে ভয় লাগে !
সুর মম ভয়ে সারদার কোল মাগে,
বাহিরিতে চাহে নাকো।
উহারে সম্মুখ হতে সরাইয়া রাখো ! !'

গর্বে নাড়ি দাড়ি
কহিলাম—'গান ! তব সাথে মম আড়ি !'
সরোষে যেমনি যাব বাহিরিতে আমি,
বিস্ময়ে হেরিনু মম দাড়ি গেছে থামি
বাঁধিয়া সুন্দরী এক মহিলার ব্রোচে !
হায় রে নিলাজী নারী ! দাড়ি ধরে নাচে,
এমনি করিয়া কি গো ? যদি দৈবক্রমে
বাঁধিয়া যায় গো দাড়ি নিমিষের ভ্রমে ?

চিৎকারিল নারীদল নব নব সুরে,
বানর নরের দল হাসিল অদূরে
ঝিঁঝিট-খাম্বাজে কেহ, কেহ মালকোষে,
হিন্দোলে হুঙ্কারে কেহ ওস্তাদি আক্রোশে !
আসিল নারীর স্বামী, স্বামীর শ্যালক,
পলাইতে যত চাহি পিছে লাগে শক্ !
দেখেছি অনেক ব্রোচ, বহু সেফ্টিপিন,
হেরিনি নাছোড়বান্দা হেন কোনোদিন।
আমারও স্ত্রীর ব্রোচ কাঁটা বহুবার
বাঁধিয়াই ছাড়িয়াছে তখনি আবার !
যত পালাইতে চাই তত বাঁধে দাড়ি,
দাড়ি লয়ে পড়ে গেল শেষে কাড়াকাড়ি
পুরুষ নারীর মাঝে ! ক্ষুরে ও কাঁচিতে
হাসিতে হল্লাতে গোলে কাশিতে হাঁচিতে
লাগিল ভীষণ দ্বন্দ্ব ! ... যখন চেতনা
ফিরিয়া পাইনু গৃহে, হেরি আন্‌মনা
হাসিছে গৃহিণী মম বাতায়নে বসি।
জাগিতে দেখিয়া কহে, 'এতদিনে শশী
হলো মেঘ-মুক্ত প্রিয় !' মুকুরে হেরিয়া মুখ কহিলাম আমি,
'আমি কই ?' সে কহিল, 'মুকুরেতে স্বামী !'

তর্পণ

স্বর্গীয় দেশবন্ধুর চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে

—আজিও তেমনি করি
আষাঢ়ের মেঘ ঘনায়ে এসেছে
ভারত-ভাগ্য ভরি।
আকাশ ভাঙিয়া তেমনি বাদল
ঝরে সারা দিনমান,
দিন না ফুরাতে দিনের সূর্য
মেঘে হলো অবসান!
আকাশে খুঁজিছে বিজলি-প্রদীপ,
খোঁজে চিতা নদী-কূলে,
কার নয়নের মণি হারায়েছে
হেথা অঞ্চল খুলে।
বজ্রে বজ্রে হাহাকার ওঠে,
খেয়ে বিদ্যুৎ-কশা
স্বর্গে ছুটেছে সিন্ধু—
ঐরাবত দীর্ঘশ্বসা।
ধরায় যে ছিল দেবতা, তাহারে
স্বর্গ করেছে চুরি,
অভিযানে চলে ধরণীর সেনা,
অশনিতে বাজে তূরী।
ধরণীর শ্বাস ধূমায়িত হলো
পুঞ্জিত কালো মেঘে,
চিতা-চুল্লিতে শোকের পাবক
নিভে না বাতাস লেগে।
শ্মশানের চিতা যদি নেভে, তবু
জ্বলে স্মরণের চিতা,
এ-পারের প্রাণ-স্নেহরসে হলো
ও-পার দীপান্বিতা।

—হতভাগ্যের জাতি,
উৎসব নাই, শ্রাদ্ধ করিয়া
কাটাই দিবস রাতি!

কেবলি বাদল, চোখের বরষা,
যদি বা বাদল থামে—
ওঠে না সূর্য আকাশে ভুলিয়া
রামধনুও না নামে !
ত্রিশ জনে করে প্রায়শ্চিত্ত
ত্রিশ কোটির সে পাপ,
স্বর্গ হইতে বর আনি, আসে
রসাতল হতে শাপ !
হে দেশবন্ধু, হয়তো স্বর্গে
দেবেন্দ্র হয়ে তুমি
জানি না কি চোখে দেখিছ পাপের
ভীরুর ভারতভূমি !
মোদের ভাগ্যে ভাস্করসম
উঠেছিলে তুমি তবু,
বাহির আঁধার ঘুচালে, ঘুচিল
মনের তম কি কভু ?
সূর্য-আলোক মনের আঁধার
ঘোচে না, অশনি-ঘাতে
ঘুচাও ঘুচাও জাতের লজ্জা
মরণ-চরণ-পাতে !
অমৃতে বাঁচাতে পারোনি এ দেশ,
ওগো মৃত্যুঞ্জয়,
স্বর্গ হইতে পাঠাও এবার
মৃত্যুর বরাভয় !
ক্ষীণ শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ-বাসরে
কি মন্ত্র উচ্চারি
তোমারে তুষিব, আমরা তো নহি
শ্রাদ্ধের অধিকারী !
শ্রদ্ধা দানিবে শ্রাদ্ধ করিবে
বীর অনাগত তারা—
স্বাধীন দেশের প্রভাত-সূর্যে
বন্দিবে তোমা যারা !

না-আসা-দিনের কবির প্রতি

জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রাঙা অরুণ রবি
তোমরা উঠিছ ; না-আসা দিনের তোমরা কবি।
যে-রাঙা প্রভাত দেখিবার আশে আমরা জাগি
তোমরা জাগিছ দলে দলে পাখি তারির লাগি।
স্তব-গান গাই আমি তোমাদেরি আসার আশে,
তোমরা উদিবে আমার রচিত নীল আকাশে।
আমি রেখে যাই আমার নমস্কারের স্মৃতি—
আমার বীণায় গাহিও নতুন দিনের গীতি !

প্রলয়-শিখা

প্রলয়-শিখা

বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরবী তাথৈ থৈ।
সে নৃত্যবেগে ললাট-অগ্নি প্রলয়-শিখ্
ছড়ায়ে পড়িল হের রে আজিকে দিগ্বিদিক।
সহস্র-ফণা বাসুকির সম বহ্নি সে
শ্বসিয়া ফিরিছে, জ্বরজ্বর ধরা সেই বিষে।
নবীন রুদ্র আমাদের তনু-মনে জাগে
সে প্রলয়-শিখা রক্ত উদয়ারুণ-রাগে।
ভরার মেয়ের সম ধরা হয়ে অপহৃতা
দৈত্য-আগারে চলিতে কাঁদিয়া মরে বৃথা ;
আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতের সে পথ-বিলাপ,
সজল আকাশে উঠিয়াছি তাই বজ্র-শায়ক ইন্দ্রচাপ।
মুক্ত ধরণী হইয়াছে আজি বন্দীবাস,
নহে ক তাহার অধীন তাহার থল জল বায়ু নীল আকাশ।
মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেব-অভিশাপ দৈত্যত্রাস,
দশদিক জুড়ি' জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়-বহ্নি সর্ব-নাশ !
ঊর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা অনির্বাণ,
জতুগৃহদাহ-অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ।

নমস্কার

তোমারে নমস্কার—
যাহার উদয়-আশায় জাগিছে রাতের অন্ধকার।
বিহগ-কণ্ঠে জাগে অকারণ পুলক আশায় যার,
স্তব্ধ পাখায় লাগে গতি-বেগ চপল দুর্নিবার,

ঘুম ভেঙে যায় নয়ন-সীমায় লাগিয়া যার আভাস,
কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস,
জাগে সহস্র শিশির-মুকুরে সহস্র মুখ যার
না-আসা দিনের সূর্য সে তুমি, তোমারে নমস্কার।

নমো দেবী নমো নম,
ছুটিয়া চলেছ স্রোত-তরঙ্গ পাহাড়ি হরিণী সম।
অটল পাষাণ অচপল গিরি-রাজের চপল মেয়ে
চলেছ তটিনী তটে তটে নট-মল্লারে গান গেয়ে।
কূলে কূলে হাস পল্লবে ফুলে ফল-ফসলের রাণী,
বধির ধরারে শোনাও নিত্য কল-কল-কল বাণী।
তব কলভাষে খল খল হাসে বোবা ধরণীর শিশু,
ওগো পবিত্রা, কূলে কূলে তব কোলে দোলে নব যিশু।
তব স্রোত-বেগে জাগে আনন্দ জাগিছে জীবন নিতি,
চির-পুরাতন পাষাণে বহাও চির-নূতনের গীতি।
জড়েরে জড়ায়ে নাচিছ প্রাণদা, দাও নবপ্রাণ তার,
শ্মশানের পাশে ভাগীরথী তুমি, তোমারে নমস্কার।

'হবে জয়'

আবার কি আঁধি এসেছে, হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা?
দু'হাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে
মলিন আবর্জনা?
করিয়ো না ভয়, হবে হবে লয়
আপনি এ উৎপাত,
আগুনের দুটো খড়কুটো লয়ে
লুকাবে অকস্মাৎ।
উৎপাতে তার যদি সখা তব
ফুলবনে ফুল ঝরে,
নব-বসন্তে নব ফুলদল
আসিবে কানন ভ'রে।

অসুন্দরের প্রতীক উহারা,
ফুল ছেঁড়া শুধু জানে,
আগে যে চলিবে উহারা টানিবে
কেবলি পিছন পানে।
বন্ধু, ওদের উহাই ধর্ম,
তাই ব'লে তুমি আগে
চলিবে না ভয়ে? ফুটাবে না ফুল
তোমার কুসুম-বাগে?
অভিশাপ-শ্বাস দম্‌কা বাতাস
প্রদীপ নিবায় ব'লে
আলো না জ্বালায়ে রহিবে বসিয়া
আঁধারে আঙিনা-তলে?
সূর্যে ঢাকিতে ছুটে যায় নভে
পায়ের তলার ধূলি,
সূর্য কি তাই লুকাবে আকাশে
আপনার পথ ভুলি'?
তড়িত-প্রদীপ জ্বালাইয়া আস
তোমরা বরষা-ধারা,
তোমাদের জলে সব ধুলো মাটি
নিমেষে হইবে হারা।
যে অন্তরের দীপ্তিতে তব
হাতের মশাল জ্বলে,
ফুৎকারে তাহা নিভিবে না,
চল আগে চল নব বলে।
পথ ভুলাইতে আসিয়াছে যারা
চাহিবে ভুলাতে পথ,
লঙ্ঘিতে হবে উহাদের রচা
মরু, নদী, পর্বত।
পিছনের যারা রহিবে পিছনে,
উহাদের চিৎকারে
তুমি কি বন্দী হইয়া রহিবে
আঁধারের কারাগারে?
মাথার উপরে শত বাজ-পাখি,
তবু পারাবত দল
আলোক-পিয়াসী চঞ্চল-পাখা
লুণ্ঠিছে নভতল।

বন্ধু গো, তোল শির !
তোমারে দিয়াছি বৈজয়ন্তী
বিংশ শতাব্দীর।
মোরা যুবাদল, সকল আগল
ভাঙিতে চলেছি ছুটি,
তোমারে দিয়াছি মোদের পতাকা,
তুমি পড়িও না লুটি'।
চাহি না জানিতে—বাঁচিবে অথবা
মরিবে তুমি এ পথে,
এ পতাকা বয়ে চলিতে হইবে
বিপুল ভবিষ্যতে।
তাজা জীবন্ত যৌবন-অভিযান-
সেনা মোরা আছি,
ভূমিকম্পের সাগরের মত
সুখে প্রাণ ওঠে নাচি ;
চাহ বা না চাহ, মোরা যুবাদল
তোমারে চালাব আগে,
ব্যগ্র-চরণ চলিবে অগ্রে
আমাদের অনুরাগে !
মৃত্যুর হাতে মরে ত সবাই,
সেই শুধু বেঁচে থাকে—
মানুষের লাগি যে চির-বিরাগী,
মানুষ মেরেছে যাকে।

বিধাতার পরিহাস—
রচেছে মানুষ যুগে যুগে তার
অমানুষী ইতিহাস !
সব চেয়ে বড় কল্যাণ তার
করিয়াছে যে মানুষ !
তারেই পাথরে পিষিয়া মেরেছে,
মেরেছে বিঁধিয়া ক্রুশ !
যে-হাতে করিয়া এনেছে মানুষ
স্বর্গ-অমৃত-বারি,
সে হাত কাটিয়া ধরার মানুষ
প্রতিদিন দিল তারি !

দেয় ফুল ফল ছায়া সুশীতল—
তরুরে আমরা তাই,
ঢিল ছুঁড়ে মারি, ফুল ছিঁড়ি তার
শেষে শাখা ভেঙে যাই।
সেই অভিমানে ফুটিবে না ফুল?
ফলিবে না তরু-শাখে
সু-রসাল ফল? দিবে না সে ছায়া
যে আঘাত করে তাকে?
চন্দ্রে যাহারা বলে কলঙ্কী
চন্দ্রালোকেই বসি,
করুণার হাসি দেখে তাহাদেরে
দিই না গলায় রশি!
অসমসাহসে আমরা অসীম
সম্ভাবনার পথে
ছুটিয়া চলেছি, সময় কোথায়
পিছে চা'ব কোন মতে!
নিচের যাহারা—রহিবে নিচেই,
ঊর্ধ্বে ছিটাবে কালি,
আপনার অনুরাগে চলে যাব
আমরা মশাল জ্বালি'।
যৌবন-সেনাদল তব সখা,
বন্ধু গো নাহি ভয়,
পোহাবে রাত্রি, গাহিবে যাত্রী
নব আলোকের জয়!

পূজা-অভিনয়

মানুষের পদ-পূত মাটি দিয়া
দেবতা রচিছে পূজারী-দল;
সে দেবতা গেল স্বর্গে, মানুষ
রহিল আঁকড়ি মর্ত্যতল।

দেবতারে যারা করিছে সৃজন,
সৃজিতে পারে না আপনারে,
আসে না শক্তি, পায় না আশিস,
ব্যর্থ সে পূজা বারে বারে।
মাটির প্রতিমা মাটিই রহিল, হায়,
কারে দিবে শক্তি বর,
দেবতার বর নিতে পারে হাতে,
হেথা কোথা সেই শক্তিধর।
বিগ্রহ-চালে হাসে বুড়ো-শিব,
বলে, 'দেখ দেখ দশভুজা,
নেংটি পরিয়া নেংটে ইঁদুর-
ভক্তরা এল দিতে পূজা ;
গণেশ-ভক্ত ইঁদুরে-বুদ্ধি
হস্তী-কর্ণ লম্বোদর,
কার্তিকে মোর সাজায়েছে দেখ,
যেন উহাদের মেয়ের বর।
উহাদের দেব-সেনাপতি পরে
ছেঁড়া কটি-বাস আধ-হাতি,
সেনাদল হল চরকা-বুড়ি গো,
তরুণেরা হল জোলা তাঁতি !
মাথা কেটে আর অস্ত্র হেনেও
হয় না স্বাধীন আর সকল,
সূতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া
কেল্লা করিবে ওরা দখল !
বলি দেয় ওরা কুমড়ো ছাগল
বড় জোর দুটো পোষা মহিষ,
মহিষাসুরেরে বলি দিতে নারে,
বলে, 'মাগো ওটা তুই বধিস্ !'
লক্ষ্মীর হাতে অমৃত-ভাণ্ড,
লক্ষ্মী ছেলেরা তাহাই চায়,
তাই পূজা করে ওরা ধনিকেরে—
লক্ষ্মীবাহন কাল্-প্যাঁচায় !
অমৃত চাহিছে, ওরা ত চাহে না
মোর কণ্ঠের বিষের ভাগ,
ওদেরি মরুতে জঙ্গলে চরে
তোমার বাহন সিংহ-বাঘ !

দেখিয়া তরাসে পলায় উহারা
বাহন দেখিয়া যাদের ভয়,
সিংহবাহিনী ! পূজিয়া তোমায়
তারাই করিবে অসুর জয় ?
সেথা তব হাতে টিনের খড়গ,
সারা গায়ে মোড়া ঝালতা রাং,
দেখে হাসি আর ঘুমাই শ্মশানে,
ভক্তের দল যোগায় ভাং।
কোন্ রূপ তব ধ্যান করে ওরা,
শুনিবে ? শুনিয়া যাও ঘুমোও,
শ্বশুর-বাড়ির ফেরৎ যেন গো,
অসুর-বাড়ির ফেরৎ নও !
বাণী-মেয়ে মোর বোবা হয়ে বসে,
ভাঙা বীণা কোলে বসিয়া রয়,
কথায় কথায় সেথা সিডিসন,
কি জানি কখন জেলের ভয়।
নিজেরা বন্দী, তাই দেখ, ওরা
ধরিয়া ও কোন্ কন্যারে
কলা-বউ করে রেখেছে তাদের
হীন কামনার কারাগারে !
ভূতো ছেলেগুলো কলেজেতে পড়ে,
কে জানে ক' ল্যাজ পায় হোথায়,
কেহ শাখা-মৃগ হইয়াছে উঠি
আধ্যাত্মিক উঁচু শাখায় !'

এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে
অকাল-বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল বধিতে রাবণে
ত্রেতায় স্বয়ং রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবী-পূজার
অভিনয় করে চলিয়াছি !
লঙ্কা-সায়রী রাবণ ধরিয়া
টুঁটিতে ফাঁসায়ে দেয় কাছি।
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া
হয়ত কাছিতে পড়ে ঝুলে,

দেবীর আসন তেমনি অটল
হয়ত ঈষৎ ওঠে দুলে।
কে ঘুচাবে এই পূজা-অভিনয়,
কোথায় দুর্বাদল-শ্যাম
ধরনী-কন্যা শস্য-সীতারে
উদ্ধারিবে যে নবীন রাম !
দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ,
দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ,
বিশ হাতে করে লুন্ঠন, তবু
ভরে না ক' ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়ত গোকুলে বাড়িছে সে আজ,
উহারে কল্য বধিবে যে,
গোয়ালার ঘরে খেঁটে-লাঠি-করে
হলধর-রূপী রাম সেজে !

যৌবন

ওরে ও শীর্ণা নদী,
দু'তীরে নিরাশা বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি?
নবযৌবন-জল-তরঙ্গ-জোয়ারে কি দুলিবি না?
নাচিবে জোয়ারে পদ্মা, গঙ্গা, তুই রবি চির ক্ষীণা?
ভরা-বাদরের বরিষণ এসে বারে বারে তোর কূলে
জানাবেরে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবি না ভুলে?
দুই কূলে বাঁধি প্রস্তর-বাঁধ কূল ভাঙিবার ভয়ে
আকাশের পানে চেয়ে রবি তুই শুধু আপনারে লয়ে?
ভেঙে গেল বাঁধ, আশেপাশ তোর বহে যে জীবন-ঢল
তারে বুকে লয়ে দুলে ওঠ তুই যৌবন-টলমল।
প্রস্তর-ভরা দুইকূল তোর ভেসে যাক বন্যায়,
হোক উর্বর, হাসিয়া উঠুক ফুলে ফল সুষমায়।

একবার পথ ভোল্—
দূর সিন্ধুর লাগি তোর বুকের জাগুক মরণ দোল্।
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠ নব যৌবনে !
বাঁচিতে চাহিয়া মরুপথে তুই মরিলি হীন মরণে।
সকল দুয়ার খুলে দেরে তোর ভাসা এ মরু-সাহারা,
দুকূল প্লাবিয়া আয় আয় ছুটে
ভাঙ্ এ মৃত্যু-কারা।

ভারতী-আরতি

গান

[তিলক-কামোদ ও শুভাবতী—সাদ্রা ও গীতাঙ্গী]

জয় ভারতী শ্বেত শত-দলবাসিনী,
বিষ্ণু-শরণ-চরণ আদি বাণী !
কণ্ঠ-লীনা বাজিছে বীণা,
বিশ্ব ঘুরে গাহে সে সুরে
জয় জয় বীণাপাণি ॥

শুনি সে সুর অন্ধ নভে
উদিল গ্রহ তারকা সবে,
মাতিল আলো-মহোৎসবে মা
বিশ্বরানী ॥

আদি সৃজন-দিনে অন্ধ ভুবনে
তোমার জ্যোতি আলো দিল মা নয়নে
জ্ঞান-প্রদায়িনী হৃদয়ে আলো দিলে,
ধেয়ান-সুন্দর করিলে মা নিখিলে।
উর মা উর আঁধার-পুরে আলো দানি ॥

বহ্নি-শিখা

মেলি শত দিকে শত লেলিহান রসনা
জাগো বহ্নি-শিখা স্বাহা দিগ্-বসনা !
জাগো রুদ্রের ললাটের রক্ত-অনল,
জাগো বজ্র-জ্বালা বিদ্যুৎ ঝলমল !
জাগো মহেন্দ্র-তপোভঙ্গের অভিশাপ,
জাগো অনঙ্গ-দাহন নয়নের তাপ !
জাগো ভাগীরথী কূলে কূলে চুল্লি শ্মশান,
জাগো অস্ত-গোধূলি-বেলা দিবা-অবসান !

জাগো উদয়-প্রাতের ঊষা রক্ত-শিখা,
জাগো সূর্যের টিপ পরি' জয়ন্তিকা !
জাগো ক্রোধাগ্নি অবমানিতের বক্ষে
জাগো শোকাগ্নি নিরশ্রু রাঙা চক্ষে !
জাগো নিশ্চুপ সয়ে-থাকা ধূমায়িত রোষ,
জাগো বাণী মূক-কণ্ঠে অশনি-নির্ঘোষ !
জাগো খাণ্ডব-দাহন ভীমা দাহিকা,
মরু বিদ্রূপ-হাসি জাগো হে মরীচিকা !

জাগো বাড়ব-অনল, জ্বলে বনে দাবানল,
জাগো অগ্নি-সিন্ধু-মথন হলাহল !
জাগো বহ্নিরূপী তরু-শুষ্ক জ্বালা,
জাগো তরলিত অগ্নি গো সুরা-পেয়ালা।
জাগো প্রতিশোধ-রূপে উৎপীড়িত বুকে,
নাম স্বর্গে অভিশাপ উল্কা মুখে !

এস ধূমকেতু-ঝাঁটা হাতে ধূমাবতী,
এস ভস্মের টিপ পরি' অশ্রুমতী !
জাগো আলো হয়ে রবি শশী তারকা চাঁদে,
এস অনুরাগ-রাঙা হয়ে নয়ন-ফাঁদে।
জাগো কণ্টকে জ্বালা হয়ে, নাগ-মুখে বিষ,
এস আলেয়ার আলো হয়ে, নিশি-ডাক শিশ্।

এস ক্ষুধা হয়ে নিরন্ন রিক্ত ঘরে,
লুট লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হা হা স্বরে !

জাগো ভীমা-ভয়ঙ্করী উন্মাদিনী,
রাঙা দীপক-আগুন-সুরে বীণা-বাদিনী !

খেয়ালি

আয় রে পাগল আপন-বিভোল খুশির খেয়ালি,
হাতে নিয়ে রবাব-বেণু রঙিন পেয়ালি !
ভোজ-পুরীদের প্রমত্ততায়
মাতুক ওরা রাজার সভায়,
আঙিনাতে জ্বাল রে তোরা অরুণ দেয়ালি,
স্বপন-লোকের পথিক তোরা ধরার হেঁয়ালি।

রঙিন খাতা

রেঙে উঠুক রঙিন খাতা
নতুন হাতের নতুন লেখায়,
মুখর হউক নিথর কানন
নিত্য-নূতন কুহু-কেকায়।
নিটোল আকাশ টোল খেয়ে যাক
হাজার পাখির গানের দোলে,
লেখার কুসুম ফুটে উঠুক
খাতার পাতার কোলে কোলে।
হাজার দেশের গানের পাখির
হাজার রাঙা পালক ঝরে
রচে তুলুক অমর ঝাঁপি,
দুলুক বীণাপাণির করে।

বৈতালিক

অসুরের খল-কোলাহলে এসো সুরের বৈতালিক !
বেতালের যতি-ভঙ্গে তোমার নৃত্য ছন্দ দিক্॥

অকুণ্ঠিত ও-কণ্ঠে তোমার আনো উদাত্ত বাণী,
সুরের সভায় রাত্রি-পারের উষসীরে আনো টানি।
তোমার কণ্ঠ বিহগ-কণ্ঠে ছড়াক দিগ্বিদিক॥

তন্দ্রা-অলস নয়নে বুলাও জাগর-সুরের স্পর্শ,
গত নিশীথের মুকুলে ফোটাও বিকশিত-প্রাণ হর্ষ !
মৃতের নয়নে দাও দাও তব চপল আঁখি-নিমিখ॥

সমর-সঙ্গীত

টলমল টলমল পদভরে,
বীরদল চলে সমরে॥

খরধার তরবার কটিতে দোলে
রণন ঝণণ রণ-ডঙ্কা বোলে।
ঘন তূর্য-রোলে
শোক-মৃত্যু ভোলে
দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে॥

চলে শ্রান্ত দূর-পথে
মরু দুর্গম পর্বতে,
চলে বন্ধুবিহীন একা।
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা।
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী—এ কি বলিদান !
জাগে নিঃশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান !
দোলে ঈশান-মেঘে কাল প্রলয়-নিশান !
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে॥

চাষার গান

আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি,
সমান রে ভাই।
কে রাবণ করে হরণ
দেখব রে তাই॥

আমাদের ঘরের বেটির কেশের মুঠি
ধরে নে যায় সাগর-পারে,
দিয়ে হাত মাথায় শুধু
ঘরে বসে রইব না রে।
যে লাঙল-ফলা দিয়ে
শস্য ফলাই মরুর বুকে,
আছে সে লাঙল আজও
রুখবো তাতেই রাজার সেপাই॥
পাঁচনীর আশীর্বাদে
মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ
সে পাঁচন আছে আজও,
ভাঙব তাতেই ওদের গলদ।
যে জলে ভাস্‌ছি মোরা
চল্‌ সে জলে ওদের ভাসাই॥

পাথুরে পাহাড় কেটে
নিঙাড়ি নীরস ধরা,
আনি রে ঝর্ণা-ধারা
এ নিখিল শীতল-করা।
আজি সে গাঁইতি শাবল
কোথায় গেল, হাতে কি নাই॥

খেতেছে ফসল নিতুই
ডিঙিয়ে বেড়ার কাঁটা,
এবারের পুজোয় নতুন
বলি দে সে-সব পাঁটা।
দেখিবি আসবে ফিরে
শক্তিময়ী আবার হেথাই॥

গান

(যোগিয়া-টোড়ি—একতালা)

জাগো হে রুদ্র জাগো রুদ্রাণী,
কাঁদে ধরা দুখ-জরজর।
জাগো গৌরী জাগো হর॥

আজি শস্য-শ্যামা তোদের কন্যা
অন্ন-বস্ত্রহীনা অরণ্যা,
সপ্ত সাগর অশ্রু-বন্যা
কাঁপিছে বুকে থরথর॥

আর সহিতে পারি না অত্যাচার,
লহ এ অসহ ধরার ভার।
গ্রাসিল বিশ্ব লোভ-দানব,
হা হা স্বরে কাঁদিছে মানব,
জাগো ভৈরবী জাগো ভৈরব
ত্রিশূল খড়্গ ধর ধর॥

মণীন্দ্র-প্রয়াণ*

দান-বীর, এতদিনে নিঃশেষে
করিলে নিজেরে দান।
মৃত্যুরে দিলে অঞ্জলি ভরি
তোমার অমৃত প্রাণ।
অমৃত-লোকের যাত্রী তোমরা
পথ ভুলে আস, তাই
তোমাদের ছুঁয়ে অমর মৃত্যু
আজিও সে মরে নাই।

* কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে. সি. আই. ই. মহোদয়ের তিরোধান উপলক্ষে লিখিত।

স্বর্গ লোকের ইঙ্গিত—আসো
ছল করে ধরাতল
তোমাদের চাহি ফোটে ধরণীতে
ধেয়ানের শতদল।
রৌদ্র-মলিন নয়নে বুলাও
স্বপন-লোকের মায়া,
তৃষিত আর্ত ধরায় ঘনাও
সজল মেঘের ছায়া।

ইন্দ্রকান্তমণি ছিলে তুমি
শ্যাম ধরণীর বুকে,
সুন্দরতর লোকের আভাস
এনেছিলে চোখে-মুখে।
ঐশ্বর্যের বুকে বসে বলেছিলে,
শিব বৈরাগী,
বিভব রতন ইঙ্গিত শুধু
ত্যাগের মহিমা লাগি।
ইন্দ্র, কুবের, লক্ষ্মী আশিস
ঢেলেছিল যত শিরে,
দু হাত ভরিয়া ক্ষুধিত মানবে
দিলে তাহা ফিরে ফিরে।
যে ঐশ্বর্য লয়ে এসেছিলে,
তাহারি গর্ব লয়ে
করেছ প্রয়াণ, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ
উঁচু শিরে নির্ভয়ে!

তব দান-ভারে টলমল ধরা
চাহে বিহ্বল আঁখি,
অঞ্জলি পুরি দিয়া মহাদান,
চক্ষেরে দিলে ফাঁকি।

নব-ভারতের হল্‌দিঘাট

বালাশোর—বুড়ি বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট,
উদয়-গোধূলি-রঙে রাঙা হয়ে
উঠেছিল যথা অস্তপাট॥

আ-নীল গগন-গম্বুজ-ছোঁওয়া
কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল,
অস্ত-রবিরে ঝুঁটি ধরে আনে
মধ্য গগনে কোন পাগল !
আপন বুকের রক্ত-ঝলকে
পাংশু রবিরে করে লোহিত,
বিমানে বিমানে বাজে দুন্দুভি,
থর থর কাঁপে স্বর্গে-ভিত্।
দেবকী মাতার বুকের পাথর
নড়িল কারায় অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে হলো দৈত্যপুরীর
প্রসাদে সেদিন বজ্রপাত।
নাচে ভৈরব, শিবানী, প্রমথ
জুড়িয়া শ্মশান মৃত্যু-নাট,—
বালাশোর—বুড়ি বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট॥

অভিমন্যুর দেখেছিস রণ ?
যদি দেখিসনি, দেখিবি আয়,
আধা-পৃথিবীর রাজার হাজার
সৈনিকে চারি তরুণ হটায়।
ভাবী ভারতের না-চাহিতে-আসা
নবীন প্রতাপ, নেপোলিয়ন,
ঐ 'যতীন্দ্র' রণোন্মত্ত—
শনির সহিত অশনি-রণ।
দুই বাহু আর পশ্চাৎ তার
রুষিছে তিন বালক শের,

'চিত্তপ্রিয়', 'মনোরঞ্জন',
'নীরেন'—ত্রিশূল ভৈরবের !
বাঙালির রণ দেখে যা রে তোরা
রাজপুত শিখ, মারাঠা, জাঠ !
বালাশোর—বুড়ি বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট ॥

চার হাথিয়ারে—দেখে যা কেমনে
বধিতে হয় রে চার হাজার,
মহাকাল করে কেমনে নাকাল
নিতাই গোরার লালবাজার !
অস্ত্রের রণ দেখেছিস তোরা,
দেখ্ নিরস্ত্র প্রাণের রণ ;
প্রাণ যদি থাকে—কেমনে সাহসী
করে সহস্র প্রাণ হরণ !
হিংস-বুদ্ধ-মহিমা দেখিবি,
আয় অহিংস-বুদ্ধগণ—
হেসে যারা প্রাণ নিতে জানে, প্রাণ
দিতে পারে তারা হেসে কেমন !
অধীন ভারত করিল প্রথম
স্বাধীন-ভারত-মন্ত্র পাঠ,
বালাশোর—বুড়ি বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট ॥

সে মহিমা হেরি ঝুঁকিয়া পড়েছে
অসীম আকাশ, স্বর্গ-দ্বার,
ভারতের পূজা-অঞ্জলি যেন
দেয় শিবে খাড়া নীল পাহাড় !
গগন-চুম্বী গিরি-শির হতে
ইঙ্গিত দিল বীরের দল,
'মোরা স্বর্গের পাইয়াছি পথ—
তোরা যাবি যদি, এ পথে চল !
স্বর্গ-সোপানে রাখিনু চিহ্ন
মোদের বুকের রক্ত-ছাপ,

ঐ সে রক্ত-সোপানে আরোহি
মোছ্ রে পরাধীনতার পাপ !
তোরা ছুটে আয় অগণিত সেনা,
খুলে দিনু দুর্গের কবাট !'
বালাশোর—বুড়ি বালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট ॥

জাগরণ

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে
তাদের দ্বারে আসি'
ওরে পাগল, আর কতদিন
বাজাবি তোর বাঁশি।
ঘুমায় যারা মখমলের ঐ
কোমল শয়ন পাতি
অনেক আগেই ভোর হয়েছে
তাদের দুখের রাতি।
আরাম সুখের নিদ্রা তাদের,
তোর এ জাগার গান
ছোঁবে না ক প্রাণ রে তাদের,
যদিই বা ছোঁয় কান !
নির্ভয়ের ঐ সুখের কূলে
বাঁধল যারা বাড়ি
আবার তারা দেবে না রে
ভয়ের সাগর পাড়ি।
ভিতর হতে যাদের আগল
শক্ত করে আঁটা
'দ্বার খোল গো' বলে তাদের
দ্বারে মিথ্যা হাঁটা।

ভোল রে এ পথ ভোল,
শান্তিপুরে শুনবে কে তোর
জাগর-ডঙ্কা রোল !

ব্যথাতুরের কান্না পাছে
শান্তি ভাঙে এসে
তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের
আফিম সর্বনেশে
ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই,
সে ঘুমপুরে আসি
নতুন করে বাজা রে তোর
নতুন সুরের বাঁশি !
নেশার মাথায় জানে না হায় !
এরা কোথায় প'ড়ে
গলায় তাদের চালায় ছুরি
কেই বা বুকে চ'ড়ে,
এদের কানে মন্ত্র দে রে,
এদের তোরা বোঝা,
এরাই আবার করতে পারে
বাঁকা কপাল সোজা।
কর্ষণে যার পাতাল হতে
অনুর্বর এই ধরা,
ফুল-ফসলের অর্ঘ নিয়ে
আসে আঁচল-ভরা
কোন্ সে দানব হরণ করে
সে দেব-পূজার ফুল
জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি,
ভাঙরে তাদের ভুল।

ফল ফলাতে পারে এরাই
আবার ঘরে বসে।
বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে
নগর বসায় যারা
রসাতলে পশবে মানুষ—
পশুর ভয়ে তারা ?
তাদেরই ঐ বিতাড়িত
বন্য পশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে
সভ্য সাজে সাজি।

টান মেরে ফেল মুখোশ তাদের
নখর দণ্ড লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু
বনের পশু হয়ে !
তারাই দানব—অত্যাচারী—
যারা মানুষ মারে।
সভ্য–বেশী ভণ্ড পশু
মারতে ডরাস কারে?
এতদিন যে হাজার পাপের
বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এলো সময়,
এই সে বাণী শোনা।
নতুন–যুগের নতুন নকীব
বাজা নতুন বাঁশি,
স্বর্গ–রানী হবে এবার
মাটির মায়ের দাসী।

যতীন দাস

আসিল শরৎ সৌরাশ্বিন,
দেবদেবী যবে ঘুমায়ে রয়
পাষাণ–স্বর্গ হিমালয়–
চূড়ে শুভ্র মৌলি তুষারময়।
ধরার অশ্রু—সাত সাগরের
লোনা জল উঠি রাত্রিদিন
ধোঁয়াইয়া ওঠে স্বর্গের পানে,
অভিমানে জমে হয় তুহিন।
পাষাণ স্বর্গ, পাষাণ দেবতা,
কোথা দুর্গতি–নাশিনী মা,
বলির রক্তে রাঙিয়া উঠেছে
যুগে যুগে দশ দিক–সীমা।

খড়ের মাটির দুর্গা গড়িয়া
দুর্গে বন্দী পূজারী-দল
করে অভিনয় ! দেবী-বিগ্রহ
জড় গতিহীন চির-অচল।
দেবতা ঘুমায়, ঘুমায় মানুষ
এরি মাঝে নিজ তপোবলে
জোর করে নেয় দেবতার বর
দৈত্য-দানব দলে দলে।
মোরা পূজা করি, পূজা-শেষে চাই
পায়ের পদ্ম শুভ-আশিস,
ওরা চেয়ে নেয় কালীর খড়্গ,
বিষ্ণুর গদা, শিবের বিষ।
তপস্যা নাই, ঢাক ঢোল পিটে
দেবতা জাগাতে করি পূজা,
দশ-প্রহরণ-ধারিণী এলো না
দশ শ' বছরে দশ-ভুজা। ...

এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে
অকাল-বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল লঙ্কেশ্বরে
বধিতে ত্রেতায় রাম অবতার,
আজিও আমরা সে দেবীপূজার
অভিনয় করে চলিয়াছি,
লঙ্কা-সায়রী রাবণ মোদেরে
ধরিয়া গলায় দেয় কাছি !
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া
হয়ত কাছিতে পড়ে ঝুলে,
দেবীর আসন তেমনি অটল,
শুধু নিমেষের তরে দুলে।
বলি দিয়া মোরা পূজেছি দেবীরে
নব-ভারতের পূজারী-দল
গিয়াছিনু ভুলি—দেবীরে জাগাতে
দিতে হয় আঁখি-নীলোৎপল।
মহিষ-অসুর-মর্দিনী মা গো,
জাগ এইবার খড়্গ ধর।

দিয়াছি 'যতীনে' অঞ্জলি—
নব-ভারতের আঁখি-ইন্দীবর।

টুটে তপস্যা, ওঠে জাগি ঐ
পূজা-রত অভিনব ভারত,
ভারত-সিন্ধু গর্জি উঠিল
নিযুত শঙ্খ-মন্ত্রবৎ।
'উলু উলু' বোলে পুরনারী, দোলে
হিম-কৈলাশ টালমাটাল,
কারাগারে টুটে অর্গল, ওঠে
রাঙিয়া আশার পূর্ব-ভাল।
ছুটে বিমুক্ত-পিঞ্জর, পায়ে
লুটে শৃঙ্খল ছিন্ন ঐ,
নাচে ভৈরব, ভৈরবী নাচে
ছিন্নমস্তা তাথৈ থৈ।
আকাশে আকাশে বৃংহতি-নাদ
করে কোটি মেঘ ঐরাবত,
সাগর শুষিয়া ছিটাইছে বারি,
ও কি ফুল হানে পুষ্পরথ !
এ কি এ শ্মশান-উল্লাস, নাচে
ধূর্জটি-শিরে ভাগীরথী,
অকূল তিমিরে সহসা ভাতিল
নব-উদীচির নব-জ্যোতি।
বিস্ময়ে আঁখি মেলিয়া চাহিনু !
দেখা যায় শুধু দেবী-চরণ,
মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিব
যে চরণ-তলে মাগে মরণ !
ভৈরব নাচে উর্ধ্বে, নিম্নে
খণ্ডিত শির মহিষাসুর,
দুলিছে রক্ত-সিক্ত খড়গ,
কাঁপিছে তরাসে অসুর-পুর।
চিৎকারি ওঠে উল্লাসে নব-
ভারতের নব-পূজারীদল,
'চাই না মা তোর শুভদ আশিস,
চাই শুধু ঐ চরণ-তল—

যে চরণে তোর বাহন সিংহ,
মহিষ-অসুর মথিয়া যাস।
যদি বর দিস, দিয়ে যা বরদা,
দিয়ে যা শক্তি দৈত্য-ত্রাস !'

শুধু দেখা যায় দেবীর রক্ত-
চরণ, খড়গ, মহিষাসুর,—
ওকে ও চরণ-নিম্নে ঘুমায়
সমর-শয়নে বিজয়ী শূর ?
কে যতী-ইন্দ্র তরুণ তাপস
দিয়া গেলে তুমি একি এ দান ?
শবে শবে গেলে প্রাণ সঞ্চারি
কেশব, বিলায়ে তোমার প্রাণ !
তিলে তিলে ক্ষয় করি আপনারে
তিলোত্তমারে সৃজিলে, হায় !
সুন্দ ও উপসুন্দ অসুর
বিনাশিতে তব তপ-প্রভায় !

হাতে ছিল তব চক্র ও গদা,
গ্রহণ করনি হেলায়, বীর !
বুকে ছিল প্রাণ, তাই দিয়ে রণ
জিনে গেলে প্রাণহীন জাতির।
তোমার হাতের শ্বেত-শতদল,
শুভ্র মহাপ্রাণ তোমার,
দিয়া গেলে তব জাতিরে আশিস,
তোমার হাতের নমস্কার !
লইবে কে বীর উন্নত-শির
দেবতার দান সে শতদল,
টলিয়া উঠেছে বিস্ময়ে ত্রাসে
বিন্ধ্য হইতে হিম-অচল।
নামিয়া আসিল এতদিনে বুঝি
হিম-গিরি হতে পাষাণী মা,
কে জানে কাহার রক্তে রাঙিয়া
উঠিতেছে দশ-দিক-সীমা !

দেখালে মায়ের রক্ত-চরণ,
কে দেখাবে দেবী-মূর্তি মা'র,
ভারত চাহিয়া আছে তার পানে,
কে করিবে প্রতি-নমস্কার !

বিংশ শতাব্দী

হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব-চেতনায় জাগো জাগো, ওঠো বীর !
নব ধ্যান নব ধারণায় জাগো,
নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো,
সকল কালের উচ্চে তোলো গো শির,
সর্ব-বন্ধ-মুক্ত জাগো হে বীর !

নূতন কণ্ঠে গাহ নূতনের জয়,
আমরা ছাড়ায়ে উঠেছি সর্ব ভয় !
সর্বকালের সব মোহ টুটি
বালারুণ-সম উঠিয়াছি ফুটি,
আজিকে সর্ব-পরাধীনতার লয়।
নতুন জগতে আমরা সর্বময় !

আমরা ভেঙেছি রাজার সিংহাসন,
করিয়াছি নরে আমরা গো নারায়ণ।
পায়ের তলার মানুষে টানিয়া
বসায়েছি দেব-বেদীতে আনিয়া,
টুটায়েছি সব দেশের সব বাঁধন।
নিখিল মানব-জাতি এক-দেহ-মন।

পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে,
য়ুরোপ, রাশিয়া, আরব, মিসর, চীনে,
আমরা আজিকে এক প্রাণ এক দেহ,
এক বাণী—'কারো অধীন রবে না কেহ।'

চলি একে একে দৈত্য-প্রাসাদ জিনে।
পারি নাই যাহা, পারিব দু-এক দিনে।

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম-নেশা,
ধ্বংস করেছি ধর্ম-যাজকী পেশা।
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ,
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত—
এক মানবের একই রক্ত মেশা।
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা !

আদিম সৃষ্টি-দিবস হইতে ক্রমে
প্রাচীরের পর প্রাচীর উঠেছে জমে।
সে প্রাচীর মোরা ভাঙিয়া চলেছি,
যতই চলেছি ততই দলেছি,
জ্বালায়ে চলেছি পুঞ্জীভূত সে ভ্রমে।
শ্রমণের চেয়ে পূজ্য ভেবেছি শ্রমে।

সংস্কারের জগদ্দল পাষাণ
তুলিয়া বিশ্বে আমরা করেছি ত্রাণ।
সর্ব আচার-বিচার-পঙ্ক হতে
তুলিয়া জগতে এনেছি মুক্ত স্রোতে।
অচলায়তনে বাতায়ন খুলি—প্রাণ
এনেছি, গেয়েছি নব-আলোকের গান।

নচিকেতা-সম আমরা মৃত্যুপুরী
বারে বারে যাই বারে বারে আসি ঘুরি'।
মৃত্যুরে মোরা মুখোমুখি দেখিয়াছি,
মোদের জীবনে মরণ আছে গো বাঁচি।
স্বর্গ এনেছি মর্ত্যে করিয়া চুরি ;
চাহিছে মর্ত্য দেবতা বাদলে ঝুরি'।

সার্থক হলো আজিকে ভৃগু-সাধন,
আমরা করেছি সৃজন নব-ভুবন।
এক আদমের মোরা সন্তান,
নাহি দেশ কাল ধর্মাভিমান,

নাহি ব্যবধান, উচ্চ, নীচ, সুজন ;
নিখিলের মাঝে আমরা এক জীবন !

আমরা সহিয়া সকল অত্যাচার
অত্যাচারের করিতেছি সংহার।
ধ্বংসের আগে এই পৃথিবীরে
হাসাইতে মোরা আসিয়াছি ফিরে,
শেষের আশিস আমরা নিয়ন্তার ;
খুলিতে এসেছি সকল বন্ধ দ্বার।

আমরা বাহিনী বিংশ শতাব্দীর
মন্থন-শেষ অমৃত জলধির।
কল্কি-দেবের আগে-চলা দূত,
কভু ঝড়, কভু মলয়-মারুত,
কভু ভয়, কভু ভরসা লক্ষ্মী-শ্রীর।
জীবন-মরণ পায়ে বাজে মঞ্জীর !
আমরা বাহিনী বিংশ শতাব্দীর।

শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র

শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র,
ব্যথা-অনিদ্র দেবতা,
শুনি নির্জিত কোটি দীন-মুখে
বজ্র-ঘোষ বারতা।
একি মহা দীন রূপ ধরি ফের
পথে পথে ভাঙা কুটিরে,
সবারে অন্ন বিলায়ে আপনি
মাগিছ ভিক্ষা-মুঠিরে।
কৃষক হইয়া কর্ষিছ ভূমি
জলে ভিজে রোদে পুড়িয়া,
পরবাসে তুলি ঘরের লক্ষ্মী
আঁধারে মরিছ ঝুরিয়া।

শ্রমিক হইয়া খুঁড়িতেছ মাটি,
হীরক মানিক আহরি
রাজার ভাঁড়ার করিছ পূর্ণ
নিজে নিরন্ন বিহরি।
আপনার গায়ে লাগাইয়া ধূলি
নির্মল রাখ ধরণী,
সকলের বোঝা বহিবার লাগি
মুটে কুলি হলে আপনি।
সকলের তরে রচিয়া প্রাসাদ,
নগর বসায়ে কাননে,
রাজমিস্ত্রির রূপে ফের সাঁঝে
চুন-বালি-মাখা আননে।
কুটিরে তোমার জ্বলে না প্রদীপ,
কাঁদে নিরন্ন পরিজন,
সকলের তরে রচি শুচি-বাস
নিজে হলে তাঁতি বিবসন।
আপনি হইয়া অশুচি মেথর
রাখিতেছ শুচি ভুবনে,
না হতে প্রভাত রাজপথ-ধূলি
মার্জনা কর গোপনে।
সকল রুচি ও শুচিতা তেয়াগি
আবিলতা কাঁধে বহিয়া,
ফিরিছ দেবতা হাড়ি ডোম হয়ে
সকলের ঘৃণা সহিয়া।
দ্বারবান হয়ে রক্ষিছ দ্বার
সেব পদ হয়ে সেবাদাস,
দেবতা হইয়া মানুষের সেবা
করিতেছ তুমি বারো মাস।

ভেবেছিলে বুঝি, ছলের ঠাকুর,
মর্ত্যের অধিবাসী সব
তোমারে চিনিয়া এই রূপে রূপে
পূজিয়া করিবে পরাভব।

যত সেবা দাও, তত করে ঘৃণা,
দেখিতে দেখিতে চারি কাল
হইল অন্ত, ধূর্জটি তাই
ক্ষেপিয়ে উঠেছে জটাজাল ?

ছিলে শুদ্রের শ্মশানে-মশানে
রুদ্ররূপী হে মহাকাল,
খুলিয়া পড়েছে রাজার পুরীতে
নাগ-বন্ধন বাঘছাল !
যমের বাহন মহিষ, তোমার
বাহন বৃষভ লইয়া
প্রমথের দল ছিল এতদিন
শান্ত কৃষক হইয়া ;
তব ইঙ্গিতে ক্ষেপিয়া উঠেছে
আজি কি সকলে নিখিলে ?
তোমার ললাট-অগ্নি দিয়া কি
রাজার শান্তি লিখিলে ?

নমো নমো নমঃ শুদ্ররূপী হে
রুদ্র ভীষণ ভৈরব !
পূর্ণ কর গো পাপ ধরণীর,
মহা-প্রলয়ের উৎসব।
সৃষ্টির কথা তুমি জান, দেব !
এ ভীষণ পাপ-ধরাতে
পারি না বাঁচিতে ; এর চেয়ে ঢের
ভালো তব হাতে মরাতে॥

রক্ত-তিলক

শত্রু-রক্তে রক্ত-তিলক পরিবে কারা ?
ভিড় লাগিয়াছে—ছুটে দিকে দিকে সর্বহারা।

বিহগী মাতার পক্ষপুটের আড়াল ছিঁড়ে
শূন্যে উড়েছে আলোক-পিয়াসী শাবক কি রে !
নীড়ের বাঁধন বাঁধিয়া রাখিতে পারে না আর,
গগনে গগনে শুনেছে কাহার হুহুঙ্কার !
কাঁদিতেছে বসি জনক জননী শূন্য নীড়ে,
চঞ্চল-পাখা চলেছে শাবক অজানা তীরে।

সপ্ত-সারথি-রবির অশ্ব বল্গা-হারা
পশ্চিমে ঢলি পড়িছে, যথায় সন্ধ্যাতারা
ম্লান মুখে কাঁদে হৃত-গৌরব ভারত-সম,
ফিরাবে রবিরে—আজি প্রতিজ্ঞা দারুণতম।

দেখাইছে পথ বজ্র জ্বালিয়া অনল-শিখা,
বিজয়-শঙ্খ বাজায় স্বর্গে জয়ন্তিকা।
পশ্চিম হতে আনিবে পূর্বে রবির চাকা,
বিধূনিত করে বিপুল শূন্য চপল পাখা।

কণ্ঠে ধ্বনিছে মারণ-মন্ত্র শত্রুজয়ী,
পার্শ্বে নাচিছে দানব-দলনী শক্তিময়ী।
রিক্ত-ললাট চলেছে মৃত্যু-তোরণ-দ্বারে,
রাঙাবে ললাট শত্রু-রক্তে মরণ-পারে।

শত্রু-রক্ত-চর্চিত ভালে তিলক-রেখা,
পরাধীনতার অমা-যামিনীতে চন্দ্র-লেখা।
সাত্ত্বিক ঋষি বৃথা হোমানলে আহুতি ঢালে,
যত মরে তত বাঁচে গো দৈত্য সর্বকালে।

দধীচির হাড়ে লাগিয়াছে ঘুণ অনেক আগে,
বজ্রে কেবলি সৃষ্টি-কাঁদন-শব্দ জাগে !
ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেব বীর্যহারা,
তেমনি কাঁদিছে দৈত্য-প্রহরী বিশ্ব-কারা।

শ্মশান আগুলি জাগে একা শিব নির্ণিমিখ,
আঁধার শ্মশান, শবে শবে ছেয়ে দিগ্বিদিক।
কোথা কাপালিক, ভীমা ভৈরবী-চক্র কই,
নাচাও শ্মশানে পাগলা মহেশে তাথৈ থৈ !

মহাতান্ত্রিক ! রক্ততিলক পরাও ভালে,
কি হবে লইয়া জ্ঞান-যোগী ঋষি ফেরুর পালে !
শবে ছেয়ে দেশ, শব-সাধনার মন্ত্র দাও,
তামসী নিশায়, তামসিক বীর, পথ দেখাও !
কাটুক রাত্রি, আসুক আলোক, হবে তখন
নতুন করিয়া নতুন স্বর্গ-সৃষ্টি-পণ।

তামসী নিশার ওরে শ্মশানের শিবার দল !
শব লয়ে তোর কাটিল জনম, বল কি ফল—
ঝিমায়ে ঝিমায়ে ভবিষ্যতের হেরি স্বপন ?
আজ যদি নাহি বাঁচিলি, বাঁচিবি বল কখন ?
আজ যদি বাঁচি, কি ফল আমার স্বর্গে কাল ?
আজের মর্ত্য সেই সে স্বর্গ সর্বকাল !

আহত মায়ের রক্ত মাখিয়া লভি জনম
পুণ্যের লোভে হবি বক-ধার্মিক পরম ?
রক্তের ঋণ শুধিব রক্তে, মন্ত্র হোক !
হস্ যদি জয়ী, পূজিবে রে তোরে সর্বলোক।

না দেয় দেবতা আশীষ না দিক, ভয় কি তোর ?
কি হবে পূজিয়া পাষাণ-দেবতা পুণ্য-চোর ?
জন্মেছি মোরা পাপ-যুগে এই পাপ-দেশে,
করিবি ক্ষালন এ মহাপাপেরে ভালোবেসে ?

আঁধার-কৃষ্ণ-মহিষ-অসুর বধিতে কৃষ্ণ খরগ ধর,
শবের শ্মশানে হয়ত উদিবে সেদিন শুভ্র গৌরী-হর !

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

বাবা বুলবুল !

তোমার মৃত্যু-শিয়রে ব'সে 'বুলবুল-ই-শিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠলাম, সেদিন তুমি—আমার কাননের বুলবুলি—উড়ে গেছ ! যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর ?

জানি না তুমি কোথায় ! যে লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ ক'রো।

তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুলবুলিকেও বিস্ময়ান্বিত ক'রে তুলবে।

শিরাজের-বুলবুল্-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি,—

'সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার।'

মুখবন্ধ

আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়।

আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই, যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি।

তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই প'ড়ে ফেলি।

তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়—গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলোল না, এবং ঐখানেই ওর ইতি হ'য়ে গেল।

তারপর এস.সি. চক্রবর্তী এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি।

যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চ'লে গেছে!

আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুল্‌বুল্ কবিকে বাংলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম।

বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের "জানাজা" (শবযান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হ'ল ... ।

অন্যত্র হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলাম। যদি সময় পাই, এবং পরিপূর্ণ "দীওয়ান-ই-হাফিজ" অনুবাদ করতে পারি, তখন হাফিজের এবং তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা করব!

সত্যকার হাফিজকে চিনতে হলে তাঁর গজল-গান—প্রায় পঞ্চশতাধিক—পড়তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি প'ড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে!

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হ'লেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনুর কণার মতো রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত ছোট বলেই এ এত সুন্দর।

আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সি হ'তেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফার্সি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' আছে, তার প্রায় সব কয়টাতেই পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ দেখতে পাই। অথচ ফার্সি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর History of Persian Literature-এ এবং মৌলানা শিব্‌লী নোমানী তাঁর "শেয়রুল-আজম"-এ মাত্র উনসত্তরটি রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন ; এবং এই দুইজনই ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে authority—বিশেষজ্ঞ।

আমার নিজেরও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক। আমি হাফিজের মাত্র দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি—যদিও আরো তিন চারটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে দু'টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল। সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সঙ্গে অন্তত এই দু'টি রুবাইয়াতের সুরের কোনো মিল নেই। বেসুরো ঠেকবে বলে আমি এ দুটির অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম।

১. জমায় না ভিড় অসৎ এসে
যেন গো সৎলোকের দলে।
পশু এবং দানব যত
যায় যেন গো বনে চ'লে।
আপন উপার্জনের ঘটায়
হয় না উপার্জনের মুগ্ধ কেহ,
আপন জ্ঞানের গর্ব যেন
করে না কেউ কোনো ছলে।

২ কালের মাতা দুনিয়া হ'তে,
পুত্র, হৃদয় ফিরিয়ে নে তোর !
যুক্ত ক'রে দে রে উহার
স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ওর।
হৃদয় রে, তুই হাফিজ সম
হ'স যদি ওর গন্ধ-লোভী,
তুইও হবি কথায় কথায়
দোষগ্রাহী, অমনি কঠোর !

রুবাইয়াতের আগাগোড়া শারাব, সাকি, হাসি, আনন্দ, বিরহ ও অশ্রুর মধ্যে এই উপদেশের বদ-সুর কানে রীতিমত বেখাপ্পা ঠেকে।

তাছাড়া কালের বা সময়ের মাতাই বা কে, পিতাই বা কে, কিছু বুঝতে পারা যায় না।

আমার অনুবাদের আটত্রিশ নম্বর রুবাই-ও প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। কেননা প্রথম দুই লাইনের সাথে শেষের দুই লাইনের কোনো মিল নেই, এবং ওর কোনো মানেও হয় না। দিনের ঔরসে রাত্রি গর্ভবতী হবেন, এ আর যিনি লিখুন—হাফিজ লিখতে পারেন না।

এজন্যই ব্রাউন সাহেব বলেছেন, ফার্সি কবিতার সবচেয়ে শুদ্ধ সংস্করণ হচ্ছে—তুরস্কে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি। তাঁর মতে—তুর্কি নাকি হিন্দুস্থানী বা ইরানীর মত ভাবপ্রবণ নয়। কাজেই তা'রা নিজেদের দু'দশ লাইন রচনা অন্য বড় কবিদের রচনার সাথে জুড়ে দিতে সাহস করেনি বা পারেনি। অথচ ভারতের ও ইরানের সংগ্রাহকেরা নাকি ঐরূপ দুঃসাহসের কাজ করতে পশ্চাৎপদ নন এবং কাজেও তা করেছেন।

এ অনুযোগ হয়ত সত্যই। কেননা আমি দেখেছি, ফার্সি কাব্যের (ভারতবর্ষে প্রকাশিত) বিভিন্ন সংস্করণের কবিতার বিভিন্ন রূপ। লাইন, কবিতা উল্টোপাল্টা তো আছেই, তার ওপর কোনটাতে সংখ্যায় বেশি কোনটায় কম কবিতা। অথচ তুরস্ক-সংস্করণ বই সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে একরূপ অসাধ্য। ...

হাফিজকে আমরা—কাব্য-রস-পিপাসুর দল—কবি ব'লেই সম্মান করি, কবি-রূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুফি-দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা-মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খাইয়ামের দর্শন প্রায় এক।

এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনের চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শারাব-সাকি নিয়ে দিন কাটাতেন, এও মিথ্যা নয়।

তবে, এও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক কাব্যে প্রেমের আনন্দের প্রতীকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

শারাব বলতে এঁরা বোঝেন—ঈশ্বরের, ভূমার প্রেম, যা মদিরার মতোই মানুষকে উন্মত্ত করে তোলে। 'সাকি' অর্থাৎ যিনি সেই শারাব পান করান। যিনি সেই ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারী, দেয়াসিনী। পানশালা—সেই ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা-নিকেতন।

ইরানী কবিদের অধিকাংশই তথাকথিত নাস্তিকরূপে আখ্যাত হলেও এঁরা ঠিক নাস্তিক ছিলেন না। এঁরা খোদাকে বিশ্বাস করতেন। শুধু স্বর্গ, নরক, রোজকিয়ামত (শেষ বিচারের দিন) প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন না। কাজেই শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাপ্পা ছিলেন। এঁরা সর্বদা নিজেদের "রিন্দান্" বা স্বাধীনচিন্তাকারী, ব্যভিচারী ব'লে সম্বোধন করতেন। এর জন্য এঁদের প্রত্যেককেই জীবনে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল।

হাফিজের সমস্ত কাব্যের একটি সুর—

"কায় বেখবর, আজ ফসলে গুল্‌ ও তরকে শারাব।"

"ওরে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন—আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ করে বসে আছিস!"

***

আমাকে যাঁরা এই রুবাইয়াৎ অনুবাদে নানারূপে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার শ্রেয়তম আত্মীয়াধিক বন্ধু গীত-রসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার অন্যতম। তাঁরই অনুরোধে ও উপদেশে এর বহু অসুন্দর লাইন সুন্দরতর হ'য়ে উঠেছে। যদি এ অনুবাদে কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে তার সকল প্রশংসা তাঁরই।

কলিকাতা
১লা আষাঢ়
১৩৩৭

বিনয়াবনত
নজরুল ইসলাম

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

১

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলে না সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হ'ল নয়ন-তারা॥

২

আমার সুখের শত্রু হ'তে
লুকিয়ে চ'লে আয় লো ত্বরা।
আয়েশ্-সুখের আমন্ত্রণ আজ,
শারাব দিয়ে পাত্র ভরা।
ঈর্ষাতুরের কুমন্ত্রণায়
কোথায় যাবে, হে মোর ভীরু?
আমার প্রিয়া! শোনো শুধু
আমার কথা দুখ-পাসরা॥

৩

করল আড়াল তোমার থেকে
যেদিন আমার ভাগ্য-লেখা,
সেদিন হ'তে ফোটেনি আর
আমার ঠোঁটে হাসির রেখা।
কী নিদারুণ সেই বিরহের
বাজল ব্যথা আমার হিয়ায়;—
আমি জানি, আর সে জানে
অন্তর-বিহারী একা॥

৪

আমার সকল ধ্যানে জ্ঞানে
বিচিত্র সে সুরে সুরে
গাহি তোমার বন্দনা-গান,
রাজাধিরাজ, নিখিল জুড়ে' !
কী বলেছে তোমার কাছে
মিথ্যা করে আমার নামে
হিংসুকেরা,—ডাকলে না আজ
তাইতে আমায় তোমার পুরে॥

৫

আনতে বল পেয়ালা শারাব
পার্শ্বে ব'সে পরান-বঁধুর।
নিঙাড়ি লও পুষ্প-তনু
তন্বঙ্গীর অধর-আঙুর।
আহত যে—ক্ষত-ব্যথায়
সোয়াস্তি চায়, চায় সে আরাম ;
বিষম তোমার হৃদয়-ক্ষত,
ডাকো হাকিম কপট চতুর॥

৬

ভাবনু, যখন করছে মানা
বন্ধুরা সব আগলে ভাঁটি—
দিলাম ছেড়ে এবার ফুলের
মরশুমে ভাই শারাব খাঁটি।
ফুল-বাগিচায় বুলবুলিরা
উঠল গেয়ে,—হায় রে বেকুব,
এমন ফাগুন, ফুলের ফসল,
নাই কো শারাব ?—সকল মাটি॥

৭

বিশ্বে সবাই তীর্থ-পথিক
তোমার পথের কুঞ্জ-গলির।
ছুটছে নিখিল মক্ষি হ'য়ে
তোমার আনন-আনার-কলির।

আজকে যদি তোমার থেকে
মুখ ফিরিয়ে রয় গো কেহ,
কোন চোখে কা'ল দেখবে তোমায়
হায় রে বে-দিল্ সেই মুসাফির।

৮

তোমার আকুল অলক—হানে
গভীর ছায়া রবির করে।
শুক্লা চতুর্দশীর শশী
তোমার মুকুট, আঁধার হরে।
ও-কস্তুরী-কালো কেশের
নিশান ওড়ায় সন্ধ্যারানী,
হেরে ও-মুখ, —উদয়-ঊষা—
পাণ্ডুর চাঁদ ডুবে মরে।।

৯

ভিন্ন থাকার দিন গো আমার
আজকে পরান-প্রিয়ার সাথে।
বন্ধু নিয়ে খুশির মউজ—
নেই গো সময় আজকে রাতে।
কি ফল র'য়ে সাবধানে আজ,
কাছে যখন নেইকো শারাব?
না, না,—কাছে শারাব আছে,
নেইকো প্রিয়াই মন ভোলাতে।।

১০

আমার পরান নিতে যে চায়
ঐ নিঠুরা রূপের পরী,
পরীর মতই রূপেরে সে
রাখে আঁখির আড়াল করি'।
কইনু তা'রে, "তুমি যে কও,
এই ত এ-মুখ, কী আর এমন?"
জবাব দিল, "তাই ত বলি
লোভ করো না এ মুখ স্মরি।"

১১

রক্ত-রাঙা হ'ল হৃদয়
তোমার প্রেমের পাষাণ-ব্যথায়।
তোমার ও-রূপ জ্ঞান-অগোচর,
পৌঁছে না কো দৃষ্টি সেথায়।
জড়িয়ে গেল ভীরু হৃদয়
তোমার আকুল অলক-দামে,
সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধা
দেখছি ওরে ছাড়ানো দায়॥

১২

রবি, শশী, জ্যোতিষ্ক সব
বান্দা তোমার, জ্যোতির্মতি !
যেদিন হ'তে বান্দা হ'ল—
পেল আঁধার-হরা জ্যোতি।
রাগে-অনুরাগে মেশা
তোমার রূপের রৌশনীতে
চন্দ্র হলে স্নিগ্ধ-কিরণ
সূর্য হ'ল দীপ্ত অতি॥

১৩

যেদিন হ'তে হৃদয়-বিহগ
ব্যথার জালে পড়ল ধরা,
সেই হ'তে তার মাথার 'পরে
ঝুলছে ছুরি রক্ত-ঝরা।
ত্যক্ত আমি হাতের কাছের
পেয়ালা-ভরা শরবতে, তাই
ক'রতেছি পান-পাত্রে ব্যথার
রক্ত আমার হৃদয়-ক্ষরা॥

১৪

আমার করে তোমার অলক
জড়িয়ে বীণার তারের মত।

এ হৃদি-ভার আমার—শুধু
তোমার ঠোঁটে হয় আনত।
চিকন তোমার ও-মুখখানি
ভুখা হিয়ার সান্ত্বনা মোর
সর্ব-গ্রাসী মোর ক্ষুধার খোরাক
ঐ দেহটুক ? হায় বিধাতঃ ! !

১৫

তোমার পথে মোর চেয়ে কেউ
সর্বহারা নাইকো, প্রিয় !
আমার চেয়ে তোমার কাছে
নাই সখি, কেউ অনাত্মীয়।
তোমার বেণীর শৃঙখলে গো
নিত্য আমি বন্দী কেন ?—
মোর চেয়ে কেউ হয়নি পাগল
পিয়ে তোমার প্রেম-অমিয়॥

১৬

দলতে হৃদয় ছলতে পরান
দক্ষ সদা আমার প্রিয়া।
তারি মিলন মাগি ঝুরে
ভাগ্য-হত আমার হিয়া।
গোলাব-ফুলী গাল গো তাহার,
রূপালি মুখ, চিকন অধর ;
ফুলকে ভোলায় ফুল্লমুখী
মিঠে হাসির ছিটেন দিয়া॥

১৭

পরান ভরে পিয়ো শারাব,
জীবন যাহা চিরকালের।
মৃত্যু-জরা-ভরা জগৎ,
ফিরে কেহ আসবে না ফের।
ফুলের বাহার, গোলাব-কপোল,

গেলাস-সাথী মস্ত ইয়ার,
এক লহমার খুশির তুফান,
এই ত জীবন !—ভাবনা কিসের ॥

১৮

আয়না তোমার আত্মার গো—
তরল তোমার ঐ লাবণী।
সাধ জাগে ঐ ধ্যানের চরণ
করি আমার নয়ন-মণি।
না, না, আমার ভয় করে গো,
নয়ন-পাতার কাঁটায় পাছে
কমল-পায়ে বাজে ব্যথা !
খেয়ানে থাক সারাক্ষণই ॥

১৯

রঙিন মিলন-পাত্র প্রথম
পান করালে ইমানদারী।
নেশায় যখন বুঁদ হয়েছি—
জাল বিছালে অত্যাচারী।
আঁখির সলিল-ধারা গো, আর
বুকের আগুন-জ্বালা নিয়ে
ভেজাই পোড়াই আপনারে
পথের ধূলি হ'য়ে তারি ॥

২০

তোমার মুখের মিল আছে, ফুল,
সাথে সে এক কমল-মুখীর।
যে-ফুল হে'রে দিল্ দেওয়ানা,
গন্ধ যথা সদাই খুশির।
সাধ জাগে-এক ফুলদানীতে
রাখি তোরে আর তাহারে,
ফুলেল ঠোঁটে চুম্ব নিতে
লাগবে সুবাস পুষ্প-মদির ॥

২১

আপন করে বাঁধতে বুকে
পারেনি কেউ তবু প্রিয়ার—
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিত্ত মাঝে
বদ্ধ থাকে চিত্ত যাহার।
আমার কথা ঠাঁই পেল না
চপল-আঁখি প্রিয়ার কানে—
রত্ন-দুল্ সে রইল প'ড়ে,
কর্ণে কভু উঠল না আর !

২২

সোরাই-ভরা রঙিন শারাব
নিয়ে চলো নদীর তটে।
নিরভিমান প্রাণে ব'সো—
অনুরাগের ছায়া-বটে।
সবারই এই জীবন যখন
সেরেফ্ দুটো দিনের রে ভাই,
লুট ক'রে নাও হাসির মধু,
খুশির শারাব ভরো ঘটে॥

২৩

তোমার হাতের সকল কাজে
হবে শুভ নিরবধি—
প্রিয়, তোমার ভাগ্যবেশে
নিয়তির এই নিদেশ যদি ;
দাও তাহ'লে পান করে নিই
তোমার-দেওয়া শিরীন শারাব,
হলেও হব চির-অমর,
হয়ত ও-মদ সুধা-নদী॥

২৪

কুঁড়িরা আজ কার্বা-বাহী
বসন্তের এই ফুল-জলসায়।
নার্গিসেরা দল নিয়ে তার
পাত্র রচে সুরার আশায়।

ধন্য গো সে-হৃদয়, যে আজ
বিম্ব হ'য়ে মদের ফেনায়
উপচে পড়ে শারাব-খানার
তোরণ-দ্বারের পথের ধুলায়॥

২৫

কুন্তলেরি পাকে প্রিয়ার—
আশয় খোঁজে আমার পরান।
অভিশপ্ত এই জীবনের
কারার থেকে চায় যেন ত্রাণ।
"কী দেবে দাম" শুধায় তাহার
দেহের গেহের রূপ-দুয়ারী
প্রিয়ার ভুরুর তোরণ-তলে
পরান দিলাম নজরানা দান॥

২৬

চাঁদের মত রূপ গো তোমার
ভরছে কলঙ্কেরি দাগে।
অহঙ্কারের সোনার বাজার
ডুবছে ক্রমে ক্লান্তি-কাগে।
লজ্জা অনেক দেছ আমায়,
প্রেম নাকি মোর মিথ্যা-ভাষণ !
আজ ত এখন পড়ল ধরা
কলঙ্ক কোন্ মুখে জাগে॥

২৭

রূপসীরা শিকার করে
হৃদয়-বনের শিকারীকে
দেহে তাহার রূপের অধিক
অলঙ্কারের চমক লিখে
নার্গিস—যার শিরে হের
ফুলের রানীর মুকুট-পরা
নিরাভরণ—তবু তারই
রটে খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে॥

২৮

তোমার ডাকার ও-পথ আছে
ব্যথার কাঁটায় ভ'রে খালি।
এমন কোনো নেই মুসাফির
ও-পথ বেয়ে চলবে, আলি!
জ্ঞানের রবি ভাস্বর যার,
তুমি জান কে সে সুজন—
প্রাণের রূপের পিল্‌সুজে যে
দেয় গো ব্যথার প্রদীপ জ্বালি'॥

২৯

যেদিন আমায় করবে সুদূর
তোমার থেকে কাল-বিরহ,
পড়বে যতই মনে, ততই
দিন হবে মোর দুর্বিষহ।
ভুলেই যদি এ চোখ পড়ে
আর-কোনো রূপসীর রূপে,
অন্ধ আমি বইব তোমার
রূপের দাবি অহরহ॥

৩০

দাও মোরে ঐ গেঁয়ো মেয়ের
তৈরি খাঁটি মদ পুরানা।
তাই পিয়ে আজ গুটিয়ে ফেলি
জীবনের এই গালচে'খানা।
যদি ধরার মন্দ ভালো
দাও ভুলিয়ে মস্ত ক'রে,
জানিয়ে দেবো এই সৃষ্টির
রহস্যময় সব অজানা॥

৩১

পূর্ণ কভু করে নাকো
সুন্দর-মুখ দিয়ে আশা।
প্রেমের লাগি যে বিবাগী—
ভাগ্য তাহার সর্বনাশা।

প্রিয়া তব লক্ষ্মী সতী
তোমার মনের মূর্তিমতী ?
প্রেমিক-দলের নও তুমি কেউ,
পাওনি প্রিয়া-ভালোবাসা ॥

৩২

মদ-লোভিরে মৌলোভী কন,—
পান করে এই শারাব যারা,
যেমন মরে তেমনি করে
গোরের পারে উঠবে তারা।
তাই ত আমি সর্বদা রই
শারাব এবং প্রিয়ার সাথে,
কবর থেকে উঠব—নিয়ে
এই শারাব, এই দিলপিয়ারা ॥

৩৩

তারি আমি বান্দা গোলাম,
সৌখিন যে রস-পিয়াসী।
গলায় যাহার দোলায় বিধি
পাগল প্রেমের শিকলি ফাঁসি।
প্রেমের এবং প্রেম জানানোর
স্বাদ অ-রসিক বুঝবে কিসে ?
পান করে এ সুরার ধারা
সুর-লোকের রূপ-বিলাসী ॥

৩৪

হয় না ধরার বিভবরাশি
জোর জুলুমে হস্তগত,
আনন্দের এই জীবন-সুধার
পায় নাকো স্বাদ বিষাদ-হত।
খুঁজছ তুমি পাঁচটা দিনের
দুঃখ ভোগের পরিশ্রমে,
সাত শ' হাজার বছর ধরে
জম্‌ল ধরায় খুশি যত ! !

৩৫

আনন্দ আর হাসি-গানের
প্রমত্ততার সময় হলো,
পেয়ালা, শারাব, দিল-দরদী,
দিলরুবা নাও, বেরিয়ে চলো !
একটি ফুঁয়ের এই ত জীবন !
তাই ত বলি, ক্ষণেক তরে
কুঁজোর আঙুর-রক্ত ঢেলে
গেলাস বাটি রঙিয়ে তোলো !

৩৬

দরবেশ—আমার সামনে এল
ফিরে তোমার সেই বিরহ,
বুকের কাটা ঘায়ে যেন
নূনের ছিটে দুর্বিষহ।
ভয় ছিল যে, তোমার থেকে
আর কিছুদিন রইব দূরে,
দেখছি শেষে আস্ল আবার
সেই অশুভ দিন অ-বহ॥

৩৭

বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর
থাকে যেন তোমার নজর,
তৃণ কুটোর পরেও ত গো
পড়ে রবির প্রভাতী কর !
যদি তোমার পথের ধুল
হই গো প্রিয়,—নারাজ হয়ে
গাল দিও না ! পাছে শোনে
পথের ধুলি তোমার সে স্বর॥

৩৮

বিশ্বাসেরে মেরে—হল
প্রাণের বন্ধু শত্রু শেষে,
কত পথিক পথ হারাল
অবিশ্বাসের গহন দেশে।

পুরুষ-'দিবা'র ঔরসে গো
'রাত্রি' নাকি গর্ভযুতা,
দেখল না যে পুরুষ—হল
ধৃতগর্ভা কেমনে সে॥

৩৯

ক্ষত হৃদয় যেমন চাহে,
হয় যদি গো, তেমনিটি হোক।
নয় উড়ে যাক হৃদয়-বিহগ
অলখ-বিহার আত্মার লোক।
আজও খোদার দরগাতে গো
এতটুকু ভরসা রাখি,
সকল দুয়ার খুলবে গো তার
ভাগ্যদেবীর স্বর্গ অ-শোক॥

৪০

কি লাভ, যখন দুষ্ট ভাগ্য
হাসল নাকো মুখ ফিরিয়ে,
পেল না দিল সুখের সোয়াদ,
দিন কাটাল ব্যথাই নিয়ে!
যে ছিল মোর চোখের জ্যোতি,
পুতলা আঁখির, গেছে চলে!
নয়ন-মণিই গেল যদি,
কি হবে এ নয়ন দিয়ে॥

৪১

সকল-কিছুর চেয়ে ভাল
সুরাই-যখন কাঁচা বয়েস,
প্রণয়-বেদন, মত্ততা, পাপ—
যৌবনেরি একার আয়েশ।
এই যে তামাম দুনিয়াটা-ই
বরবাদ আর খারাব রে ভাই,
মন্দ ধরায় মন্দ যা—তার
প্রমত্ততাই মানায় যে বেশ॥

৪২

আয়ুর মরু বেয়ে এলো
ক্ষ্যাপা প্লাবন আকুল ধারায়,
এই ত জীবন–পান–পিয়ালা
ভরার সময় কানায় কানায়।
হুঁশিয়ার হও সাহেব ! যেন
খুশি হয়ে কালের কুলি
তোমার জীবন–গেহ থেকে
আসবাব সব উঠিয়ে নে' যায়॥

৪৩

আলতো করে আঙুল রেখে
প্রিয়ার কালো পশমী কেশে,
কইনু তারে, 'দাও গো জীবন,
এসেছি অমৃতের দেশে।'
কইল প্রিয়া, 'অলক ছাড়,
তার চেয়ে এই অধর ধর !
খুঁজো নাকো দীর্ঘজীবন—
ফূর্তি মউজ ওড়াও হেসে'॥

৪৪

বিনিদ্র কাল কাটল নিশি
একলা জেগে তোমার ব্যথায়,
অশ্রু–মণির হার গেঁথেছি
নয়ন–পাতার ঝালর–সূতায়।
তোমার তরে প্রাণ পোড়ানি
কইতে নারি কারুর কাছে,
আপন মনে তাই সারাদিন
আপন ব্যথা কই আপনায়॥

৪৫

বীরত্ব শেখ 'খয়বরী'–দ্বার
ভগ্ন–কারী 'আলি'র কাছে,
দান কারে কয় শিখতে হলে
'কুন্‌বরের' ঐ বাদশা আছে।

ওরে হাফিজ, পিয়াসী কি
তুই করুণা-বারির তরে?
শারাব-সুধার সাকি জানে
উৎস তাহার কোন কানাচে॥

৪৬

প্রিয়া তোমায় দেছে দাগা?
বন্ধু, পীড়ন সহ্য কর!
আমার পরামর্শ শোন,
সকল ভুলে শারাব ধর।
মতলব হাসিল কর তোমার
খুবসুরতী রতির সাথে,
অন্তর দিও না তারে
যে তব অযোগ্যতর॥

৪৭

'বাবিলনের' যাদু বুঝি
গুরু তব চটুল চোখের,
হার মানে ও চোখের কাছে,
যাদুকরী সকল লোকের!
দুলছে যে ঐ অলক-গুছি
রূপকুমারীর কর্ণমূলে
দুলে যেন হাফিজের এই
কাব্য-মোতির চারপাশে ফের॥

৪৮

দেখ রে বিকচ ফুলকুমারীর
রূপ-সুষমার আনন-শোভা,
দেখ বাদলের কাঁদন সাথে
ফুলের হাসি মনোলোভা!
কিসের এত ঠমক দেখায়
দেবদারু আজ দখনে হাওয়ায়,
ফুলরাণীরে করবে বীজন
দোল দিল এই আনন্দ বা!

৪৯

বুক হতে তার পিরান খোলে
শ্যামাঙ্গী ঐ তন্বী যখন,
ঠিক উপমা পাইনে খুঁজে
সে মাধুরী দেখায় কেমন !
এমনি তরল রূপ গো তাহার—
বুকের তলে হৃদয় দেখায়,
স্বচ্ছ দীঘির কালো জলে
সুডোল পাষাণ-নুড়ি যেমন ॥

৫০

মোমের বাতি ! পতঙ্গে এ
ভুলেও কি গো স্মরণ কর ?
আমার কাছে—ভালোবাসে
ভুলে যাওয়া কেমনতর !
তোমার তরে যে বেদনার
ফল্গুধারা বয় এ হৃদে,
জানে শুধু জীবন-মরুর
বালুর চর এ রৌদ্র-খর ॥

৫১

কে দেখেছে সরল মনের
প্রিয়া গো—যে দেখব আমি !
আমার মত অনেকে ঐ
প্রাণ পীড়নের মুক্তিকামী।
করব কী আর—পরান-প্রিয়,
তুমিই যদি কপট এত !
আমার মত ভাগ্য সবার
দেখনু সমান বিপথ-গামী ॥

৫২

সেই ভালো মোর—এই শারাবের
পিয়ালা দিয়ে তর্ করি দিল,
যে সাধ আমার পুরল না তা
ভুলব গো আজ করব বাতিল।

ধার-করা এ জীবন আমার
বন্দী নিতি বুদ্ধি-কারায়,
আজ নিমিষের মুক্তি দেবো
তারে ভেঙে কারার পাঁচিল॥

৫৩

আনন্দের ঐ বিহগ-পাখার
শব্দ শুনি অদূর নভে,
কিংবা গো ও নম্র-চিতের
ফুলবাগানের খোশবু হবে।
অথবা ওই মৃদুল হাওয়া
তোমার শিরীন ঠোঁটের ভাষা,
কি এ যেন, এক অপরূপ
রূপকথা কি শুনছি তবে?

৫৪

কাঁদি তোমার বিরহে গো
বেশি মোমের বাতির চেয়ে,
আরক্ত-ধার অশ্রু ঝরে
মদের সোরাই সম বেয়ে।
আমি গো পান-পেয়ালা যেন,
হৃদয় যখন কৃপণ হেরি—
দূর বাঁশরি-বিলাপ শুনি
রক্ত-ধারায় উঠি ছেয়ে॥

৫৫

পরান-পিয়া! কাটাই যদি
তোমার সাথে একটি সে রাত,
বসন সম জড়িয়ে রব
নিমেষ পলক করব না পাত।
ভয় কি আমার, যদিই সখি
তার পরদিন মৃত্যু আসে,
পান করেছি অমর-করা
তোমার ঠোঁটের 'আব-ই-হায়াত'॥

৫৬

আলিঙ্গন ও চুম্বন হায়
মরল তোমার ধেয়ান করে
তোমার ঠোঁটের চুম না পেয়ে
পান্না-চুনি গেল মরে।
কাহিনী আর বাড়াব না
অল্পে সারি কল্পকথা,—
মরল কেহ ফিরে এসে
প্রতীক্ষাতে জীবন ধরে।।

৫৭

দয়িত মোর। অল্পে এত
ছাড়ব তোমায় কেমন করি
মরকত-নীল ও-কেশ-ফাঁসে
যতক্ষণ না প্রাণ বিসরি।
লোহিত চুনির ঠোঁট গো তোমার
মোর জীবনী-শক্তি সে যে,
লক্ষ প্রবাল বিনিময়েও
পারব না তা দিতে, গোরি !

৫৮

দুঃখ ছাড়া এ-জীবনে
হল না আর কিছুই হাসিল্,
বিষাদ হল সাথের সাথী
তোমায় দিয়ে আমার এ দিল্।
গোপন মনের স্বপন-সাথী
পেলাম না গো বন্ধু কোনো,
ব্যথাই আমার ব্যথার ব্যথী,
তোমার মতই নিঠুর নিখিল।।

৫৯

আমায় প্রবোধ দেওয়ার তরে,
ভোরের হাওয়া, বলো তারে—
যে পাষাণীর মন গলে না
আমার শত অশ্রু-ধারে,—

'সুখে তুমি ঘুমাও নিতি
দুলে দুলে আরাম-দোলায়,
কার নয়নে ঘুম নাহি আর—
উদয় কি হয় স্মরণ-পারে?'

৬০

আর কতদিন করবে, প্রিয়,
এ উৎপীড়ন আমায় নিয়ে,
বিনা কারণ বিশ্ব-নিখিল
জ্বালাবে ও-হৃদয় দিয়ে?
আশীর্বাদের সম অসি
দুঃসাহসীর কঠোর হাতে,
তোমার হাতে পড়লে তাহা
করবে তা খুন তোমায় প্রিয়ে॥

৬১

কোরান হাদিস সবাই বলে—
পবিত্র সে বেহেশ্‌ত নাকি,
মিলবে সেথাই আসল শারাব
তন্বী হুরী ডাগর-আঁখি!
শারাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে
দিন কাটে মোর, দোষ কি তাতে?
বেহেশ্‌তে যা হারাম নহে—
মর্ত্যে হবে হারাম তা কি?

৬২

চন্দ্র সূর্য রাত্রি দিবা
বিচিত্র সে আবেগ ভরে,
ওগো প্রিয়, দেখি—তোমার
ধূলির পরে প্রণাম করে!
হৃদয় আঁখির সাধ হতে মোর
করো না গো নিরাশ মোরে,
রইবে দূরে—বসিয়ে আমায়
প্রতীক্ষার ঐ অগ্নি পরে?

৬৩

মদের মত কি আর আছে
ভুলতে ব্যথা, তাতিয়ে তোলার?
যুদ্ধ করার সাধ জাগে কি
সেনার সাথে এই বেদনার?
এই ত তোমার কাঁচা মাথা,
এরির মাঝে বাতিল শারাব?
কাঁচা সবুজ বয়েসই ত
খুশির, গানের, পান-পিয়ালার॥

৬৪

পাতার পর্দানশীন মুকুল,
ফুটেই হেরে তোমায় পাছে!
মাতোয়ালা 'নার্গিস' শরমে
তোমায় হেরি মরণ যাচে।
তোমার কাছে রূপের বড়াই
কেমন করে করবে গো ফুল?
ফুল পেল রূপ চাঁদ চোঁয়ায়ে,
চাঁদ পেল রূপ তোমার কাছে॥

৬৫

আশ্বাসেরই বাণী তোমার
প্রতীক্ষার ঐ দূর সাহারায়
ফিরছে আজো, আর কতদিন
ঢাকবে রবি মরুর ধুলায়?
বাঘের মুখে যাও গো যদি
লালসা আর লোভের বশে,
আখেরে যে শিকার হবে
গোরের হাতে মাটির তলায়!

৬৬

তোমার আঁখি—জানে যাহা
বঞ্চনা আর ছল-চাতুরী,
চমকে বেড়ায় অসি যেন
রণাঙ্গণে ঘুরি ঘুরি।

তড়িৎ-জ্বালার ও-চোখ ত্বরিত
গোল বাধাবে বঁধুর সাথে,
যে হিয়াতে শিলা ঝরে,
হায় গো তারি তরে ঝুরি॥

৬৭

দাও এ হাতে, ফূর্তি শিকার
করে সদা যে বাজপাখি,
প্রিয়ার মত প্রিয়ম্বদা
মদ-পিয়ালা দাও গো সাকি!
কুঞ্চিত ঐ কুন্তল—যা
পাক খেয়েছে শিকলি সম—
আন গো তায় দোস্ত, কর
এই দিওয়ানার হস্ত-রাখি!

৬৮

হায় রে, আমার এ বদনসিব
হত যদি মনের মত!
কিংবা গ্রহের চক্র ঘুরে
আবার আমার বন্ধু হত!
পালিয়ে যেত যৌবন মোর
যখন হাতের মুঠি হতে,
রেকাব সম রাখত ধরে
এই জরারে সমুন্নত॥

৬৯

ফুল্লমুখী দিল্-পিয়ারী,
বীণা, রেণু, একটু আড়াল,
এক রেকাবী কাবাব, সাথে
এক পেয়ালি শিরাজী লাল—
ধমনীতে উঠবে জ্বলে
লকলকিয়ে অগ্নিশিখা,—
'হাতেম-তাই'-এর অনুগ্রহও
চাই না তখন মুহূর্ত কাল!

৭০

শাহী তখতে বসেছে ফুল—
দেখনু সেদিন গুল-বাগিচায়,
কইনু—শোনো, সত্য যদি
দীপ্ত তুমি রাজ-মহিমায়,
নিষ্পাপ এক কিশোর আমি
জ্বালাও তারেই রাত্রি দিবা
তবু তোমার স্পর্শে না পাপ,
চিরন্তনী, আফসোস, হায় !

৭১

বন্দী বোঁটায় কইল কুসুম,
থাকত যদি শক্তি আমার
পালিয়ে যাবার রাস্তা পেলে
পালিয়ে যেতাম দূর-বন পার।
বিনা অপরাধেই মোরে
এমন করে জ্বালায় যদি,
সত্যিকারের দোষী হলে
না জানি সে করত কি আর॥

৭২

সেও এ মন্দ-ভাগ্য সম
এমনি জালে ফাঁসত যদি,
হত লাখো খারাবী তার
শারাব নিয়ে নিরবধি।
আমি মাতাল, প্রেম-বিলাসী,
পাগল, ভুবন-দাহন-কারী,—
বসলে কাছে রটবে কুযশ
তাই ত থাকি দুয়ার রোধি॥

৭৩

ওরে হাফিজ, শেষ কর তোর
কৃত্রিম এই কলমবাজি !

হল সময়—খোলা পাতা
ঝোলায় তুলে রাখার আজি।
নীরব হয়ে বসার পালা
এবার রে তোর, আজকে শুধু
শূন্য গেলাস টইটুম্বুর,
কর রে ঢেলে শেষ শিরাজী॥

—তামাম শোদ্—

বুলবুল-ই-শিরাজ

মরামী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শিরাজ ইরানের মদিনা, পারস্যের তীর্থভূমি। শিরাজেরই মোসল্লা নামক স্থানে বিশ্ববিশ্রুত কবি হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইরানের এক নীশাপুর (ওমর খাইয়াম-এর জন্মভূমি) ছাড়া আর কোনো নগরই শিরাজের মতো বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করে নাই। ইরানের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিরই লীলানিকেতন এই শিরাজ।

ইরানীরা হাফিজকে আদর করিয়া 'বুলবুল-ই-শিরাজ' বা শিরাজের বুলবুলি বলিয়া সম্ভাষণ করে।

হাফিজকে তাহার শুধু কবি বলিয়াই ভালোবাসে না। তাহারা হাফিজকে 'লিসান-উল-গায়েব' (অজ্ঞাতের বাণী), 'তর্জমান-উল-আসরার' (রহস্যের মর্মসন্ধানী) বলিয়াই অধিকতর শ্রদ্ধা করে। হাফিজের কবর আজ ইরানের শুধু জ্ঞানী-গুণীজনের শ্রদ্ধার স্থান নয়, সর্বসাধারণের কাছে 'দর্গা', পীরের আস্তানা।

হাফিজের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোনো জীবনী রচিত হয় নাই। কাজেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই অন্ধকারের নীল মঞ্জুষায় চির-আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর দিন লইয়া ইরানেও তাই নানা মুনির নানা মত। হাফিজের বন্ধু ও তাঁহার কবিতাসমূহের (দীওয়ানের) মালাকর গুল-আন্দামের মতে হাফিজের মৃত্যু-সাল ৭৯১ হিজরি বা ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু তিনিও কবির সঠিক জন্ম-সাল দিতে পারেন নাই।

হাফিজের পিতা বাহাউদ্দীন ইস্পাহান নগরী হইতে ব্যবসা উপলক্ষে শিরাজে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধিও লাভ করেন, কিন্তু মৃত্যুসময়ে সমস্ত ব্যবসা এমন গোলমালে জড়িত করিয়া রাখিয়া যান যে, শিশু হাফিজ ও তাঁহার মাতা ঐশ্বর্যের কোল হইতে একেবারে দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে আসিয়া পতিত হন। বাধ্য হইয়া তখন হাফিজকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জন করিতে হয়। কোনো কোনো জীবনী লেখক বলেন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হাফিজকে তাঁহার মাতা অন্য একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের হাতে সমর্পণ করেন। সেখানে থাকিয়াই হাফিজ পড়াশুনা করিবার অবকাশ পান।

যে প্রকারেই হউক, হাফিজ যে কবি-খ্যাতি লাভ করিবার পূর্বে বিশেষরূপে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়াই বুঝা যায়।

হাফিজের আসল নাম শামসুদ্দিন মোহাম্মদ। 'হাফিজ' তাঁহার 'তখল্লুস', অর্থাৎ কবিতার ভণিতায় ব্যবহৃত উপ-নাম। যাঁহারা সম্পূর্ণ কোরান কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মুসলমানেরা 'হাফিজ' বলেন। তাঁহার জীবনী-লেখকগণও বলেন, হাফিজ তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় কোরান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি স্বভাবদত্ত শক্তিবলে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা তেমন আদর লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে 'বাবা-কূহী' নামক শিরাজের উত্তরে পর্বতোপরিস্থ এক দর্গায় (মন্দিরে) ইমাম আলি নামক এক দরবেশের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন 'বাবা-কূহী'তে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ধর্মোৎসব চলিতেছিল। হাফিজও ঐ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ইমাম আলি হাফিজকে রহস্যময় কোনো স্বর্গীয় খাদ্য খাইতে দেন এবং বলেন, ইহার পরেই হাফিজ কাব্যলক্ষ্মীর রহস্যপুরীর সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে। ইহা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু হাফিজের সমস্ত জীবনী-লেখকই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু উল্লেখ নয়, বিশ্বাসও করিয়াছেন।

হাফিজ তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার কবিতাসমূহ (দীওয়ান) সংগ্রহ করিয়া যান নাই। তাঁহার বন্ধু গুল্-আন্দামই সর্বপ্রথম তাঁহার মৃত্যুর পর 'দীওয়ান' আকারে হাফিজের সমস্ত কবিতা সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করেন। কাজেই—মনে হয়, হাফিজের পঞ্চশতাধিক যে কবিতা আমরা এখন পাইয়াছি, তাহা ছাড়াও অনেক কবিতা হারাইয়া গিয়াছে, বা তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

হাফিজ ছিলেন উদাসীন সুফী। তাঁহার নিজের কবিতার প্রতি তাঁহার মমতাও তেমন ছিল না। তাই কবিতা লিখিবার পরই তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ সংগ্রহ না করিয়া রাখিলে তাহা হারাইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার কবিতার অধিকাংশই গজল-গান বলিয়া, লেখা হইবামাত্র মুখে মুখে গীত হইত। ধর্মমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পানশালা পর্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার গান আদরের সহিত গীত হইত।

হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মতো। কূলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গলীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্তন, বিপুল বিশালতা ; নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রশান্তি, মহিমা। ...

আকাশের নীল পেয়ালা উপচিয়া আলোর শিরাজী ধরণীতে গড়াইয়া পড়ে, উন্মত্ত ধরণী নাচিয়া নাচিয়া শূন্যে ঘুরিয়া ফেরে। তারকার মণি-মাণিক্য-খচিত আকাশ কি পেয়ালার সাকিকে কবি ডাকে, শারাব ভিক্ষা করে আর গান গায়—'বদেহ্ সাকি ময়ে বাকি !' ওগো সাকি, আরো আরো শারাব ঢাল ! কিছুই বাকি রাখিও না ! পাত্র উজাড় করিয়া শারাব ঢাল ! ...

কেহ কেহ বলেন, হাফিজ অভিমান করিয়াই তাঁহার জীবিতকালে বহু বন্ধু-বান্ধবের শত সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার কবিতাসমূহ সংগ্রহ করিয়া যান নাই। হাফিজের সময়ে শিরাজের শাসনকর্তা ছিলেন শাহ্ আবু ইস্হাক ইঞ্জু। তিনি নিজেও একজন

কবি ও সমঝদার ছিলেন। তিনি হাফিজের অন্যতম ভক্ত এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শাহসুজা শিরাজের শাসনকর্তা হন। সুজা ইমাদ কিরমানী নামক একজন কবির অতিশয় ভক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি হাফিজকে বড় কবি বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। শাহ্ সুজাও নিজে কবি ছিলেন এবং তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হাফিজের সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়াই ইমাদকে বড় কবি বলিয়া হাফিজকে হেয় করিবার প্রয়াস পাইতেন। একবার শাহ্ সুজা হাফিজের কবিতার নিন্দাবাদ করায়, হাফিজ উত্তর দেন, 'তবুও আমার এই কবিতা সারা দেশের লোকে কণ্ঠস্থ, প্রশংসা এবং আবৃত্তি করে, কিন্তু এই নগরে এমন অনেক কবি আছে, যাহাদের কবিতা এই শহরের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।'

এই উত্তর শুনিয়া শাহ্ সুজার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহা তাঁহাকেই উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যতই ক্রোধান্বিত হন, কিছু করিতেও পারিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই হাফিজের দুই লাইন কবিতা তাঁহার হস্তগত হয়।—

'গর্ মুসলমানী আজ্ আনস্ত্ কে হাফিজ দারদ্
ওয়ায়্ আগর আজ্ পেয়্ ইমরোজ বুয়দ্ ফরদায়ে।'

'হাফিজের যে ধর্ম, ইহাই যদি মুসলমান ধর্ম হয়, হায়, তাহা হইলে কবে আজকার দিন শেষ হইয়া কল্য আসিবে !'

এই কবিতার সুবিধা লইয়া শাহ্ সুজা মনস্থ করেন, হাফিজের বিধর্মী বলিয়া বিচার হইবে। এই সংবাদ পাইয়া হাফিজ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে শিরাজে মৌলানা জায়নুদ্দিন আবু বকর তায়াবাদি উপস্থিত ছিলেন। হাফিজ গিয়া তাঁহার পরামর্শ ভিক্ষা করেন। তিনি হাফিজকে উহার সহিত আরও এমন দুই লাইন কবিতা জুড়িয়া দিতে বলেন, যাহার দ্বারা পূর্বের দুই লাইন কবিতার অর্থ একেবারে উল্টা হইয়া যায়।

তদনুযায়ী হাফিজ উক্ত কবিতার সঙ্গে নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা জুড়িয়া দেন।—

'ই হদিসম চে খোশ্ আমদ্ কে সহরগাহ্মি গোফ্ত্
বর্ দরে ময়কদয়ে বা দফ ও নেয়্ তর্সায়ে।'

'একজন খ্রিস্টধর্মী যখন এক সরাই-এর দ্বারে বসিয়া তাম্বুরা এবং বাঁশি লইয়া এই গান গাহিতেছিল, তখন সেই প্রাতঃকালে আমার কাছে সে গান কেমন মজার শুনাইতেছিল !'

ইহার পরে নাস্তিক বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া তিনি শেষের দুই লাইন কবিতা দেখাইয়া বলেন যে, পরিপূর্ণ কবিতাটি এই। সুতরাং বিচারে তিনি মুক্তি পান। ...

হাফিজ সম্বন্ধে বিশ্ববিজয়ী বীর তৈমুরকে লইয়া একটি গল্প প্রচলিত আছে। হাফিজের নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে : —

'আগর্ আঁ তুর্কে শিরাজী বেদস্ত আরদ দিলে মারা,
বখালে হিন্দুয়শ্ বখ্শম্ সমরকন্দ ও বোখারা রা ! !'

'যদিই কান্তা শিরাজ-সজনী ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের,
সমরকন্দ ও বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিলটের!'

সেই সময় তৈমুরের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সমরকন্দ। হাফিজ তাঁহার প্রিয়ার গালের তিলের জন্য তৈমুরের সাম্রাজ্য ও রাজধানী বিলাইয়া দিতে চাহেন শুনিয়া তৈমুর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া পারস্য জয়ের সময় হাফিজকে ডাকিয়া পাঠান। উপায়ান্তর না দেখিয়া হাফিজ তৈমুরকে বলেন যে, তিনি ভুল শুনিয়াছেন, শেষের লাইনের 'সমরকন্দ ও বোখারা'র পরিবর্তে 'দো মন কন্দ ও সি খোর্মারা' হইবে।

'আমি তাহার গালের তিলের বদলে দু'মন চিনি ও তিন মণ খর্জুর দান করিব!'

কেহ কেহ বলেন, হাফিজ এ উত্তর দেন নাই। তিনি নাকি দীর্ঘ কুর্নিশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সম্রাট! আমি আজকাল এই রকমই অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছি!' এই উত্তর শুনিয়া তৈমুর এত আনন্দ লাভ করেন যে, হাফিজকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে বহুমূল্য পারিতোষিক প্রদান করেন।

হাফিজের নামে এইরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

হাফিজের কবিতা পড়িয়া একবার মনে হয়, তিনি উদাসীন সুফী ছিলেন। আবার দুই একটি কবিতা পড়িয়া মনে হয়, তিনি বুঝি সংসারীও ছিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতা পড়িয়া মনে হয়, ইহা তাঁহার কোনো প্রিয় পুত্রের অকালমৃত্যুকে উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছিল।—

'দিলা দীদী কে আঁ ফরজানা ফরজন্দ্
চে দিদ্ আন্দর খমে ই তাকে রঙ্গিন্
বজায়ে লওহে সিমিন দর্ কিনারশ্
ফলকে বর শের নেহাদশ্ লওহে সঙ্গীন্।'

'ওরে হৃদয়! তুই দেখেছিস—
পুত্র আমার আমার কোলে,
কি পেয়েছে এই সে রঙিন
গগন-চন্দ্রাতপের তলে।
সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রৈ যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায় কবরের সিথানে তার!'

১৩৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার আর একটি পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। ইহাও তাঁহার অন্য এক কবিতা পড়িয়া জানা যায়।

হাফিজের সমস্ত কাব্য 'শাখ্-ই-নবাত্' নামক কোনো ইরানী সুন্দরীর স্তবগানে মুখরিত। অনেকে বলেন, 'শাখ্-ই-নবাত্' হাফিজের দেওয়া আদরের নাম। উহার

আসল নাম হাফিজ গোপন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ ভাগ্যবতী এই কবির প্রিয়া ছিলেন, কোথায় ছিল তাঁর কুটির, ইহা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। রহস্য-সন্ধানীদের কাছে এই হরিণ-আঁখি সুন্দরী আজো রহস্যের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, এই শাখ-ই-নবাতের সহিতই হাফিজের বিবাহ হয় এবং হাফিজের জীবিতকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কোনো জীবনী-লেখকই একথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন নাই।

হাফিজ যৌবনে হয়ত শারাব-সাকির উপাসক ছিলেন, পরে যে সুফী সাধকরূপে দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক ইরানীই বিশ্বাস করে।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর গল্প শুনা যায়। শিবলি নোমানী, ব্রাউন সাহেব প্রভৃতি পারস্য-সাহিত্যের সকল অভিজ্ঞ সমালোচকই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

হাফিজের মৃত্যুর পর একদল লোক তাঁহার 'জানাজা' পড়িতে (মুসলমানী মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে) ও কবর দিতে অসম্মত হয়। হাফিজের ভক্তদলের সহিত ইহা লইয়া বিসম্বাদের সৃষ্টি হইলে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় উভয় দলের মধ্যে এই শর্তে রফা হয় যে, হাফিজের সমস্ত কবিতা একত্র করিয়া একজন লোক তাঁহার যে কোনো স্থানে খুলিয়া দিবে ; সেই পৃষ্ঠার প্রথম দুই লাইন কবিতা পড়িয়া হাফিজের কি ধর্ম ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া হইবে।

আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপে নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা পাওয়া গিয়াছিল।—

'কদমে দরিগ মদার আজ জানাজায়ে হাফিজ,
কে গর্‌চে গর্ কে গোনাহস্‌ত্ মি রওদ্ বেহেশ্‌ত্।'

'হাফিজের এই শব হতে গো তুলো না কো চরণ প্রভু
যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশ্‌ত্ সে যাবে তবু।'

ইহার পরে উভয় দল মিলিয়া মহাসমারোহে হাফিজকে এক আঙুর-বাগানে সমাহিত করেন। সে স্থান আজিও 'হাফিজিয়া' নামে প্রসিদ্ধ।

দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিয়া আজও কবির কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

কথিত আছে, বাংলার কোনো শাসনকর্তা হাফিজকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। হাফিজ আসিতে সম্মতও হইয়াছিলেন। পারস্য উপসাগরের কূলে আসিয়া যখন তিনি জাহাজে উঠিতে যাইবেন, সেই সময় ভীষণ ঝড় ওঠে। ইহাতে হাফিজ দৈব প্রতিকূল ভাবিয়া আবার শিরাজে ফিরিয়া আসেন এবং বাংলার শাসনকর্তার কাছে যে কবিতাটি পাঠাইয়া দেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ :

'আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা,
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টিমাখা।
দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,

এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।'

'হাফিজ পারস্য ছাড়িয়া আর কখনো কোথাও যান নাই। স্বদেশ এবং স্বপল্লীর প্রতি তাঁহার অণু-পরমাণুতে অপূর্ব মমতা সঞ্চিত ছিল। বহু কবিতায় তাঁহার বাস-পল্লী 'মোসল্লা' এবং 'রোক্‌নাবাদে'র খালের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

হাফিজ নিজের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

'বর্ সরে তর্‌বতে মা চুঁ গুজরি হিম্মত্ খাহ্,
কে জিয়ারত্‌গহে রিন্দা জাহাঁ খাহেদ শোদ্!'

'আমার গোরের পার্শ্ব দিয়া যেতে চেয়ো আশিস্ তুমি,
এ গোর হবে ধর্ম-স্বাধীন নিখিল-প্রেমিক-তীর্থভূমি!'

আজ সত্য সত্যই হাফিজের কবর নিখিলের প্রেমিকের তীর্থভূমি হইয়া উঠিয়াছে!

চন্দ্রবিন্দু

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীমদ্দাঠাকুর

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে—

হে হাসির অবতার !
লহ গো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।

—**নজরুল**

১

রাগমালা—তেওড়া

আদি পরম বাণী, উর বীণাপাণি।
আরতি করে তব কোটি কোবিদ জ্ঞানী॥

হিমেল শীত গত, ফাগুন মুঞ্জরে,
কানন-বীণা বাজে সমীর-মরমরে।
গাহিছে মুহু মুহু আগমনী কুহু,
প্রকৃতি বন্দিছে নব কুসুম আনি॥

মূক ধরণী করে বেদনা-আরতি,
বাণী-মুখর তারে করো মা ভারতী!
বক্ষে নব আশা, কণ্ঠে নব ভাষা
দাও মা, আশিস্ যাচে নিখিল প্রাণী॥

শুচি রুচির আলো-মরাল-বাহিনী
আনিলে আদি জ্যোতি, সৃজিলে কাহিনী।
কণ্ঠে নাহি গীতি, বক্ষে ত্রাস-ভীতি,
করো প্রবুদ্ধ মা, বর অভয় দানি॥

ব্রহ্মবাদিনী আদিম বেদ-মাতা!
এসো মা, কোটি-দল হৃদি-আসন পাতা।
অশ্রুমতী মা গো, নব-বাণীতে জাগো,
রুদ্ধ দ্বার খোলো সাজিয়া রুদ্রাণী॥

২

খাম্বাজ—একতালা

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী।
জয় বিশ্বলোক-বিহারিণী॥

সৃজন-আদিম-তমো অপসারি
সহস্রদল কিরণ বিথারি
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি
আলোক-মরাল-বাহিনী॥

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি,
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি,
ছিন্ন চরণ-শতদলরাজি
কহিছে পীড়ন-কাহিনী॥

উর মা আবার কমলাসীনা,
করে ধরো পুন সে রুদ্র বীণা,
নব সুর তানে বাণী পরাধীনা
জাগাও অমৃত-ভাষিণী॥

৩

বাউল

তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি, হরি!
দাও ব্যথা যতই তোমায় ততই নিবিড় করে ধরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

আমি শূন্য করে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেব বক্ষে তুলি
আমার ব্যথা-শোকের শতদলে তোমায় নেব বরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর সকল শূন্য ভরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

৪

বাউল

আমি ভাই খ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ॥

সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রণাম করি, বক্ষে ধরি,
কভু তারে বিলাই স্নেহ॥

ভুলায়নি আমারি কুল,
ভুলেছে নিজেও সে কূল,
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল
তারা মোর সাথে মিলন বিরহ॥

সে আমার ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে তুলি
চলে ধূলি-মলিন পথে,
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে,
কেউ বোঝে, বোঝে না কেহ॥

৫

বাউল

ওহে রাখাল-রাজ !
কি সাজে সাজালে আমায় আজ !
আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে
দিলে চির-পথিক সাজ॥

তোমার পায়ের নূপুর আমায় দিয়ে
ঘুরাও পথে-ঘাটে নিয়ে,
বেড়াই বাউল একতারা বাজিয়ে হে,
তোমার ভুবন-নাটে নেচে বেড়াই
ভুলে শরম-ভরম-লাজ॥

তোমার নিত্য-খেলার নৃত্য-সাথী
আনন্দেরি গোঠে হে,
জীবন-মরণ আমার সহজ
চরণতলে লোটে হে।

আমার হাতে দিলে সর্বনাশী-
ঘর-ভুলানো তোমার বাঁশি,—
কাজ ভুলাতে যখন-তখন আসি হে,
আমার আপন ভবন কেড়ে—দিলে
ছেড়ে বিশ্বভুবন-মাঝ॥

৬

রামপ্রসাদী

তুই লুকাবি কোথায় মা কালি!
আমার বিশ্বভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি॥

আমার সুখের গৃহ শ্মশান করে
বেড়াস্ মা তায় আগুন জ্বালি,
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি॥

আমি পূজা করে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
বস মা সেথা দুখ্-দুলালী॥

৭

আশাবরী-কাওয়ালি

আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হরে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
এবার ঐ চরণে শরণ দিও॥

আমায়　ছিল যারা আড়াল করে,
হরি　তুমি নিলে তাদের হরে,
ছিল　প্রিয় যারা গেল তারা,
　　　হরি　এবার তুমিই হও হে প্রিয়॥

৮

ভৈরবী ভজন—দাদ্‌রা

চলো　মন আনন্দ-ধাম !
চলো　মন আনন্দ-ধাম রে
　　　চলো আনন্দ-ধাম॥

লীলা-বিহার প্রেম-লোক
নাই রে সেথা দুঃখ-শোক,
সেথা　বিহরে চির-ব্রজবালক
　　　বন্‌শিওয়ালা শ্যাম রে
　　　চলো আনন্দ-ধাম॥

অবাঙ্‌মানস-গোচরম্‌—
নাহি চরাচর নাহি রে ব্যোম,
লীলা-সাথী গ্রহ রবি ও সোম
　　　সংগীত—ওম্‌ নাম রে
　　　চলো আনন্দ-ধাম॥

৯

দুর্গা-গীতাঙ্গী

নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ !
নব ভবনে করো শুভ চরণ-পাত।
নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন-সংগীতে
　　　বিশ্বজন-চিতে আনো নব-প্রভাত॥

তোমার জটাজুটে বহে যে জাহ্নবী
তাহারি সুরে প্রাণ জাগাও, আদি কবি !

শুচি ললাট-তলে
যে শিশু-শশী ঝলে,
তারি আলোকে হরো দুখ-তিমির-রাত॥

হে চির-সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ—
হউক দূর সব অতীত অবসাদ।
লঙ্ঘি সব বাধা
তব পতাকা বহি,
ফুল্লমুখে সহি সকল সংঘাত॥

নব জীবনে লয়ে আশা অভিনব
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব,
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, করো নব-জীবন সঞ্জাত॥

১০

বাগেশ্রী—চৌতাল

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী!
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী॥

আনো আরবার ন্যায়ের দণ্ড
দৈত্য-ত্রাসন ভীম প্রচণ্ড,
অসুর-বিনাশী উদ্যত অসি, ধরো ধরো দানবারি॥

ঐ বাজে তব আরতি বোধন
কোটি অসহায় কণ্ঠে রোদন!

ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ
বেদনা-বিহারী এসো নারায়ণ!
রুদ্ধ কারার অন্ধ প্রাকার-বন্ধন অপসারি॥

১১

হাম্বীর—কাওয়ালি

বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা !
আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥

শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহ গো কথা !
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী
অশ্রুতে অ-শ্রুত শঙ্খধ্বনি !

পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী কাঁদে দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥

১২

ভজন—একতালা

জবা-কুসুম-সঙ্কাশ ঐ
উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয়।
জয় হে জ্যোতির্ময়॥

জননীর সম স্নেহ-সজল
নীল গাঢ় গগন-তল,
সুপেয় বারি প্রসূন-ফল
তব দান অক্ষয়।
অপহৃত সংশয়।
জয় হে জ্যোতির্ময়॥

১৩

তিলং-সাদ্রা

পূজা-দেউলে মুরারি,
শঙ্খ নাহি বাজে,
বন্ধ দ্বার, নির্বাপিত দীপ লাজে॥

ভগ্ন ঘট, শূন্য থালা,
পুণ্য-লোক রক্তে-ঢালা
দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যু-সাজে,
দাও শরণ তব চরণ মরণ-মাঝে॥

১৪

ভৈরবী—আদ্ধা কাওয়ালি

তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী॥

বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়,
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়,
কাল-রাখাল নাচে থৈ তাথৈ॥

বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব নমো নমঃ,
অরির পুরী-মাঝে এল অরিন্দম !

ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
কারার মাঝে এল বন্ধ-বিমোচন,
ধরি অজানা পথ আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে, মাভৈ॥

১৫

টোড়ি—একতালা

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষ,
আসে মৃত্যুঞ্জয়॥

হত্যায় আসে হত্যা-নাশন,
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ,
অন্ধ কারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ময়॥

ব্যথিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়,
ধ্বংসের বুকে শঙ্খ বাজায়!
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়।
নবীন অভ্যুদয়॥

১৬

দরবারি কানাড়া—গীতাঙ্গী

কারা-পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ!
কাঁদিছে বেদি-তলে আর্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ॥

হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান,
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মাণ!
শোণিত-লেখা জাগে—নাহি কি ভগবান?
মৃত্যু-ক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান!
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ॥

১৭

ইমন—কাওয়ালি

আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ—বরাভয়।
এ যে আনন্দ-বন্ধন, ক্রন্দন নয়॥

ওরে নাশিতে সবার এই বন্ধন-ত্রাস,
মোরা শৃঙ্খল ধরি তারে করি উপহাস,
সহি নিপীড়ন—পীড়নের আয়ু করি হ্রাস,
এ যে রুদ্র-আশীর্বাদ—লৌহ-বলয়॥

মোরা অগ্র-পথিক অনাগত দেবতার,
এই শৃঙ্খল বন্দিছে চরণ তাঁহার,
শোন্ শৃঙ্খলে তাঁর আগমনী-ঝঙ্কার !
হবে দৈত্য-কারায় নব অরুণ উদয়॥

১৮

মল্লার—কাওয়ালি

নীরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
অশান্ত-ধারে জল ঝরে অবিরল,
ধরণী ভীতি-মগন॥

ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝনননন,
দীর্ঘশ্বসি কাঁদে অরণ্য শনশন,
প্রলয়-বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন,
মূর্ছিত মহাকাল-চরণে মরণ॥

শুধিবে না কেহ কি গো এই পীড়নের ঋণ,
দুঃখ-নিশি-শেষে আসিবে না শুভ দিন ?

দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব,
অধর্ম নিধনে এসো অবতার নব !
'আবিরাবির্ম এধি' ঐ ওঠে রব,
জাগৃহি ভগবন্, জাগৃহি ভগবন্॥

১৯

যোগিয়া—একতালা

জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী,
কাঁদে ধরা দুখ-জরজর !
জাগো গৌরী, জাগো হর ॥

আজি শস্য-শ্যামা তোদের কন্যা
অন্নবস্ত্রহীনা অরণ্যা,
সপ্ত সাগর-অশ্রু-বন্যা,
কাঁপিছে বুকে থরথর ॥

আর সহিতে পারি না অত্যাচার,
লহ এ অসহ ধরার ভার।

গ্রাসিল বিশ্ব লোভ-দানব,
হা হা স্বরে কাঁদিছে মানব,
জাগো ভৈরবী জাগো ভৈরব
ত্রিশূল খড়্গ ধরো ধরো ॥

২০

সিন্ধু-কাফি—ঠুংরি

কেঁদে যায় দখিন-হাওয়া ফিরে ফুল-বনের গলি,
'ফিরে যাও চপল পথিক', দুলে কয় কুসুম-কলি !
দুলে দুলে কয় কুসুম-কলি ॥

ফেলিছে সমীর দীরঘশ্বাস—আসিবে না আর এ মধুমাস,
কহে ফুল, জনম জনম এমনি গিয়াছ ছলি।
জনম জনম গিয়াছ ছলি ॥

কহে বায়, 'রজনী-ভোরে বাসি ফুল পড়িবে ঝরে' ;
কহে ফুল, 'এমনি করে আমি ফুল-চোরেরে দলি,
এমনি কুসুম-চোরেরে দলি ॥

কাঁদে বায়, ‘নিদাঘ আসে আমি যাই সুদূর বাসে,’
ফোটে ফুল হাসিয়া ভাষে, ‘প্রিয়তম, যেয়ো না চলি’॥

২১

খাম্বাজ–পিলু—কার্ফা

ঐ পথ চেয়ে থাকি
আর কত বনমালি !
করে কানাকানি লোকে,
দেয় ঘরে পরে গালি॥

মোর কূলের বাঁধন খুলে
হায় ভাসালে অকূলে
শেষে লুকালে গোকুলে
এ কি রীতি চতুরালি॥

২২

পিলু বারোয়াঁ—ঠুংরি

আজি পূর্ণশশী কেন মেঘে ঢাকা।
মোরে স্মরিয়া রাধিকাও হলো কি বাঁকা॥
কেন অভিমান–শিশিরে মাখা কমল,
কাজল–উজল–চোখে কেন এত জল,
লহ মুরলি হরি লহ শিখী–পাখা॥

২৩

পিলু খাম্বাজ—ঠুংরি

মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে
মরাল মদালস নাচে আনন্দে॥

তরঙ্গ–হিল্লোলে শত[illegible]স দোলে,
শিশু অরুণে জাগায় অমা–যামিনীর কোলে,
শুষ্ক কানন ভরে ব[illegible]ল–[illegible]॥

নন্দন-উপহার ধরণীর করে,
শুভ্র পাখায় শুভ আশিস্ ঝরে।

মিলন-বসন্তের দূত আগমনী,
কণ্ঠে সুমঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি,
কুহু কেকা গাহে মধুর দ্বন্দ্বে॥

২৪

টোড়ি—কাওয়ালি

এসো এসো তব যাত্রা-পথে
শুভ বিজয়-রথে
ডাকে দূর সাথী।
মোরা তোমার লাগি হেথা রহিব জাগি
তব সাজায়ে বাসর জ্বালি আশার বাতি॥

হেরো গো বিকীর্ণ শত শুভ চিহ্ন
পথ-পাশে নগর-বাটে,
স-বৎসা ধেনু গো-খুর-রেণু
উড়ায়ে চলে দূর মাঠে।

দক্ষিণ-আবর্তবহ্নি,
পূর্ণ-ঘট-কাঁখে তন্বী।
দোলে পুষ্প-মালা, ঝলে শুক্লা রাতি॥

হেরো পতাকা দোলে দূর তোরণ-তলে,
গজ তুরগ চলে।
শুক্লা ধানের হেরো মঞ্জরী ঐ,
এসো কল্যাণী গো
আনো নব-প্রভাতী॥

২৫

দুর্গা—দাদ্‌রা

প্রণমি তোমায় বন-দেবতা।
শাখে শাখে শুনি তব ফুল-বারতা—
দেবতা॥

তোমার ময়ূর তোমার হরিণ
লীলা-সাথী রয় নিশিদিন,
বিলায় ছায়া বাণী-বিহীন
তরু ও লতা—
দেবতা॥

২৬

কামোদ—একতালা

ফুলে ফুলে বন ফুলেলা।
ফুলের দোলা, ফুলের মেলা,
ফুল-তরঙ্গে ফুলের ভেলা॥

ফুলের ভাষা ভ্রমর গুঞ্জে
দোলন-চাঁপার ঝুলন-কুঞ্জে,
মুহু মুহু কুহরে কুহু
সহিতে না পারি ফুল-ঝামেলা॥

২৭

গৌড়-সারং—কাওয়ালি

শুক্লা জ্যোৎস্না-তিথি, ফুল্ল পুষ্প-বীথি,
গন্ধ-বর্ণ-গীতি-আকুল উপবন।
চিত্ত স্বপ্নাতুর, অঙ্গ চুরচুর,
মাগে হৃদি-পুর সুন্দর-পরশন॥

চন্দন-গন্ধিত মন্দ দখিনা-বায়
নন্দন-বাণী ফুলে ফুলে কয়ে যায়,
তনু-মন জাগে রাঙা অনুরাগে,
মনে লাগে আজ বাসর-জাগরণ।
আজি মাধবী-বাসর জাগরণ॥

২৮

সিন্ধু-কাফি—কার্ফা

কুসুম-সুকুমার শ্যামল-তনু
হে বন-দেবতা, লহ প্রণাম।
বিটপী লতায় চিকন পাতায়
ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম॥

ঘনায় মায়া তোমার কায়া
কাজল-কালো ছায়া-শীতল,
পরিমল-সুরভিত কুন্তল—
ময়ূর কুরঙ্গে লয়ে খেলো সঙ্গে,
চরণ-ভঙ্গে ফোটে শাখে ফুলদল।
কুহরে কোকিল পাগল (গো)
নয়নাভিরাম হে চির-সুন্দর,
রচিলে ধরায় অমর ধাম॥

২৯

সিন্ধু—কাওয়ালি

বন-বিহারিণী চপল হরিণী
চিনি আঁখিতে চিনি কানন-নটিনীরে।
ছুটে চলে যেন বাঁধ-ভাঙা তটিনী রে॥

নেচে নেচে চলে ঝর্নার তীরে তীরে।
ছায়া-বীথি-তলে কভু ধীরে চলে,
চকিতে পলায় নিজ ছায়া হেরি
গিরি-শিরে॥

৩০

খাম্বাজ-পিলু-ঠুংরি

নিশুতি রাতের শশী (গো)॥

ঘুমায়ে সকলে নিশীথ নিঝুম,
হরিল কে তব নয়নের ঘুম,
কার অভিসারে জাগো গগন-পারে,
চাঁদ-ভোলানো সে কোন্ রূপসী॥

লুকায়ে হেরি আমি অভিসার তব,
তারকারা হেরে লুকায়ে নীরব,
কপট ঘুম ভাঙি হেরো হাসিছে সব
দূর অলকার বাতায়নে বসি॥

৩১

জয়জয়ন্তী—একতালা

তোর বিদায়-বেলার বন্ধুরে
দেখে নে নয়ন পুরে।
সে যায় মিশে ঐ কোন্ দূরে
বেলা-শেষের শেষ সুরে॥

ঘুমের মাঝে বন্ধু তোর,
ছিড়বে বাহুর বাঁধন-ডোর!
যাবে নয়ন, রবে নয়ন-লোর,
যায় রে বিহগ যায় উড়ে॥

তুই বহাবি নদী কেঁদে,—
পাষাণে হৃদয় বেঁধে
তবু যেতে হবে তায়
অসহায়—অচিন পুরে॥

৩২

কাজরী—হোরী-ঠেকা

ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগন।
ভুবন গভীর বিষাদ-মগন॥
বারিধারে কাঁদে চারিধার আজি,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ঝুরিছে পবন॥
নাহি রবি শশী নাহি গ্রহ তারা,
নিখিল নয়নে শ্রাবণের ধারা,
বিশ্ব ডুবাল গো শোকের প্লাবন॥

৩৩

দেশ-সুরট—একতালা

কেন করুণ সুরে হৃদয়-পুরে
বাজিছে বাঁশরি।
ঘনায় গহন নীরদ সঘন
নয়ন মন ভরি॥

বিজলি চমকে পবন দমকে
পরান কাঁপে রে,
বুকের বঁধুরে বুকে বেঁধে ঝুরে
বিধুরা কিশোরী॥

৩৪

খাম্বাজ—মধ্যমান

কেন আসে কেন তারা চলে যায়—
ক্ষণেক তরে॥

কুসুম না ফুটিতে কেন ফুল-মালি
ছিঁড়িয়া সাজি ভরে কানন করে খালি,
কাঁটার স্মৃতি বেঁধে লতার বুকে হায়,
ব্যথা-ভরে॥

ছাড়িয়া স্নেহ-নীড় সুদূর বন-ছায়
বিহগ-শিশু কেন সহসা উড়ে যায়,
কাঁদে জননী তার ঝরা পালকখানি
বুকে ধরে॥

৩৫

ইমন—কাওয়ালি

জয় মর্তের অমৃতবাদিনী চির-আয়ুষ্মতী !
জয় নারী-রূপা দেবী পুণ্যশ্লোকা সতী॥

জয় অগ্নিহোত্রী অয়ি দীপ্তা উগ্র-তপা জ্যোতির্ময়ী।
জয় সুর-লোক-বাঞ্ছিতা, সতী মহিমার গীতা, মৃত্যু-জয়ী।
জয় সীমন্তে নবারুণ, ধরণীর অরুন্ধতী॥

চির- শুদ্ধাচারিণী চির-পবিত্রা সুমঙ্গলা !
চির- অবৈধব্য-যুতা তুমি চিরপূজ্যা মা, নহ অবলা।
মা গো যুগে যুগে চির-ভাস্বর তুমি উদীচী জ্যোতি॥

তব সীমন্ত-সিন্দূর মাগে, মা গো, বিশ্ব-বধূ ;
মা গো মৃত্যুঞ্জয়ী তব তপস্যা দাও, দাও আশিস্-মধু !
সব কন্যা জায়া যাচে তব বর, করে প্রণতি॥

৩৬

ভৈরবী—আদ্ধা-কাওয়ালি

জাগো—
জাগো বধূ জাগো নব বাসরে।
গৃহ-দীপ জ্বালো কল্যাণ-করে॥

ভুবনের ছিলে, এলে ভবনে,
স্বপন হতে এলে জাগরণে,
শ্রী-মতী আসিলে শ্রী-হীন ঘরে॥

স্বপন-বিহারিণী অকুণ্ঠিতা,
পরিলে গুণ্ঠন সলাজ ভীতা,
কমলা আসিলে কাঁকন পরে॥

৩৭

ভৈরবী—সেতারখানি

বনে বনে জাগে কি আকুল হরষণ।
ফুল-দেবতা এল দিতে ফুল-পরশন॥

হরিৎতর আজি পল্লব বন-বাস,
মুকুল-জাগানিয়া সমীরণ ফেলে শ্বাস,
বেপথু লতা যাচে মধুপের দরশন॥

কিশোর-হিয়া-মাঝে যৌবন-দেবতা
গোপনে আনে নব জাগরণ-বারতা,
বধূর সাথে খোঁজে বঁধু বন নিরজন॥

৩৮

মালবশ্রী—কাওয়ালি

নয়নে ঘনাও মেঘ, মালবিকা !
গগনে জাগাও তব নীরদ-লিখা॥

বিদ্যুৎ হানে যদি গরজায় বাজ,
সুন্দর মৃত্যুরে নাহি ভয় আজ,
আমার এ বনে এসো মনোবালিকা॥

ঝরুক এ শিরে মোর ঘন বরষা,
ফুটিবে কাননে ফুল, আছে ভরসা।
এসো জল-ছলছল পথে অভিসারিকা॥

৩৯

সরফর্দা—একতালা

সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন।
হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন॥

এ প্রাণ প্রভাতী-তারার প্রায়
ফুটুক উদয়-গগন-গায়,
দুঃখ-নিশায় আনো পূর্ণ চাঁদের স্বপন॥

সকল বিরস হৃদয় মন সরস করো হে,
আশার সূর্যে মৃত্যু-গহন বিষাদ হরো হে!

কাঁটার ঊর্ধ্বে ফোটাও ফুল,
ভোলাও পথের দুঃখ ভুল,
এ বিশ্ব হোক পূজা-দেউল
পবিত্র-মোহন॥

৪০

সাজগিরি—ত্রিতালী

তুষার-মৌলি জাগো জাগো গিরি-রাজ!
পঙ্গু তোমারে আজি হানিতেছে লাজ॥

রুদ্র ও রুদ্রাণী অঙ্কে যাহার,
দৈত্য হরিছে আজ সম্মান তার।
হে মহা-মৌনী জাগো, পরো নব সাজ॥

স্বর্গ তোমার শিরে, পদতলে হায়,
আর্যাবর্ত কাঁদে চির-অসহায়!
মেঘ-লোক হতে হানো দৈত্যারি বাজ॥

৪১

বেলাওল—একতালা

সন্ধ্যা-আঁধারে ফোটাও, দেবতা,
শুভ্র রজনী-গন্ধা !
নিরাশা-শুষ্ক পরানে বহাও
প্রেমের অলকানন্দা ॥

অশ্রুজলের অকূল সায়রে
ফুটুক কমল তব শুভ বরে,
বেদনা-আহত কবির চিত্তে
বাণী দাও মধু-ছন্দা ॥

দুঃখ আসিলে সে দুখ ভুলিতে
দাও আনন্দ দুঃখীর চিতে,
আঁধার-গহন নিবিড় নিশীথে
ভাঙিয়ো না সুখ-তন্দ্রা ॥

৪২

পিলু—কাহারবা

কে যাবি পারে আয় ত্বরা করি,
তোর খেয়া-ঘাটে এল পুণ্য-তরী ॥

আবু-বকর, উমর, উস্‌মান, আলি হাইদর,
দাঁড়ি এ সোনার তরণীর, পাপী সব নাই নাই আর ডর,
এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ, পাকা সব মাঝি ও মাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারী-গান শোন্ ঐ—লা-শরিক্ আল্লাহ্ !
মোরা নরক-আগুনে আর নাহি ডরি ॥

শাফায়ত্-পাল ওড়ে তরীর অনুকূল হাওয়ার ভরে,
ফেরেশ্‌তা টানিছে তার গুণ, ভিড়িবে বেহেশ্‌তি-চরে।

ইমানের পারানি কড়ি আছে যার আয় এ সোনার নায়,
যাবি চল্ পারের পথিক কলেমার জাহাজ-ঘাটায়।
ফির-দৌস্ হতে ডাকে হুরি-পরি॥

৪৩

বাগেশ্রী-সিন্ধু—কাহারবা

বক্ষে আমার কা'বার ছবি,
চক্ষে মোহাম্মদ রসূল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ,
গাই তারি গান পথ-বেভুল॥

লায়লির প্রেমে মজনুঁ পাগল,
আমি পাগল 'লা-ইলা'র,
বোঝে আমায় প্রেমিক দর্‌বেশ,
অ-রসিকে কয় বাতুল॥

হৃদয়ে মোর খুশির বাগান,
বুলবুলি তায় গায় সদাই—
ওরা খোদার দয়া যাচে,
আমি খোদার 'ইশ্‌ক্' চাই॥

আমার মনের মস্‌জিদে দেয়
আজান প্রেমের 'মুয়াজ্জিন্',
প্রাণের 'পরে কোরান লেখা
'রুহ্' পড়ে তা রাত্রিদিন।

খাতুনে-জিন্নাত্ আমার মা,
হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না 'রোজ-কিয়ামত্'
পুল্‌সিরাতের কঠিন পুল॥

ক মি ক গা ন

শ্রীচরণ ভরসা

সোহিনী—একতালা

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা।।

গর্বের শির খর্ব মোদের ?
চরণ তেমনি লম্বা !
শৈশব হতে আ-মরণ চলি
সবারে দেখায়ে রম্ভা।
সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট-মা'র
হাতে করে আসে তাড়ায়ে,
না হয়ে ক্রুদ্ধ পদ প্রবুদ্ধ
সম্মুখে দিই বাড়ায়ে।।

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা।।

বপু কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং,
প্রয়োজন-মতো বাড়ে গো,
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে
পগারে পুকুর-পাড়ে গো !
লখিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায়
গিরি দরী বন সিন্ধু,
এই এক পথে মিলিয়াছি মোরা,
সম মুসলিম হিন্দু।।

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা !
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

কহিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা
রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই ?
পশ্চাৎ দিয়ে ছোটে কেউ ? হেসে
মরিব কি দম ফেটে, ছাই !
ছুটি যবে মোরা—সুমুখেই ছুটি,
পশ্চাতে পাশে হেরি না !
সামনে ছোটারে পিছু হাঁটা বলো ?
বাঁচি যাও, আর দেরি না ॥

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

আমাদের পিছে ছুটিতে ছুটিতে
মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
জিভ বার হয়ে পড়িবে যমের,
জীবন তখন বাঁ পায়ে !
মোরা দেব-জাতি ছিনু যে একদা,
আজ তার স্মৃতি চরণে,
ছুটি না তো, যেন উড়ে চলি নভে,
থাকে নাকো ধুতি পরনে ॥

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

বাপ-পিতামোর প্রদর্শিত এ
পথ মহাজন-পিষ্ট,
গোস্বামী মতে পরাহেও বাবা
এ পথে মিলিবে ইষ্ট !
মরে যদি যাও, তাহলে তো তুমি
একদম গেলে মরিয়াই !
চরণের জোরে মরণ এড়াও,
বাঁচিবে চরণ ধরিয়াই॥

কোরাস্ :
থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

তৌবা

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের,
রাজা আংরেজ হারাম-খোর।
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশি,
হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর !
আর মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে
রাজপথে করে গলাগলি,
আরে শুধু তাই নয়, নাচে গলা ধরে
ব্যাণ্ড বাজায়ে ধলা-ধলী॥

কোরাস্ :— আরে তৌবা ! আরে তৌবা ! !

আরে যাবে কোথা মিঞা ? চৌদিকে ঘিরে
টিকি বেঁধে শিরে কাফের হায়,
খাই আমরা হারাম সুদ ? আরে যাও,
ওরা যে তেমনি ক্যাঁকড়া খায় !

দ্যাখো ষাঁড়–পোড়া খেলে হাড় মোটা হয়,
সোজা কথাটা কি বুঝিলে ছাই !
আর খাসি নাহি করে বোদা পাঁঠা ধরে
কেটে খায়, করে নাকো জবাই॥

কোরাস্ :— আরে তৌবা ! আরে তৌবা ! !

দ্যাখো মেয়েরা ওদের বোর্‌কা না দিয়ে
রেল ও জাহাজে চড়িয়া যায়,
মোদের বোর্‌কা দেখিলে ছেলেরা ওদের
জুজুবুড়ি বলে ভির্মি খায়।
আরে ইজ্জত তবু থাকে তো মোদের,
যক্ষ্মায় নয় মরে শতক,
ওরে উহাদের মতো বেরুলে বিবিরা
যদি কেউ দেখে হয় 'আশক'॥

কোরাস্ :— আরে তৌবা ! আরে তৌবা ! !

আরে আমাদের মতো দাড়ি কই ওদের ?
লাগিলে যুদ্ধ নাড়িবে কি ?
আর উহাদের মতো কাছা কোঁচা নাই,
ধরিলে মোদের ফাড়িবে কি ?
ছার অস্ত্র লইয়া কি হবে, আমরা
বস্ত্র যা পরি থান খানিক,
তাতে তৌবা তৌবা করি যদি, যাবে
কামানের গোলা আট্‌কে ঠিক॥

কোরাস্ :— সোব্‌হান আল্লা ! সোব্‌হান আল্লা ! !

দ্যাখো তুর্কিরা বটে ছাঁটিয়া ফেলেছে
তুর্কি নূর ও মাথার ফেজ্,
আর 'দীন–ই–ইস্‌লাম্' ছেড়ে দিয়ে শুধু
তলোয়ারে তারা দিতেছে তেজ !
আরে বাপ–দাদা করে গিয়েছে লড়াই,
আমরা খাম্‌কা কেন লড়ি !
দেহে ইসলামি জোশ আনাগোনা করে
'ছহি জঙ্‌নামা' যবে পড়ি॥

কোরাস্ :— সোব্‌হান আল্লা ! সোব্‌হান আল্লা ! !

মোরা মস্‌জিদে বসি নামাজ পড়ি যে,
রক্ষা কি আছে বিধর্মীর ?
ওরা 'কাফুরের মতো যাইবে ফুরায়ে'
অভিশাপ যদি হানেন পীর !
দ্যাখো পায়জামা চেপে রেখেছি আজিও
আমাদের এই পায়ের জোর,
আরে অক্কাই যদি পেতে হয়—দিব
মক্কার পানে সরল দৌড় ॥

কোরাস্ :— মাশাআল্লা ! ইনশাআল্লা ! !

জানো, দুনিয়ায় মোরা যত পাব দুখ,
বেহেশ্‌তে পাব ততই সুখ,
আর মেরে যদি হাত-চুলকুনি মেটে,
নে বাবা, তোদেরি আশ মিটুক !
সবে পশ্চাৎ দিয়ে করিব জবাই,
আসুন 'মেহেদি', থাম্ দু'দিন !
বাবা মুষল লইয়া কুশল পুছিতে
আসিছে কাবুলি মুস্‌লেমিন ॥

কোরাস্ :— আল্লাহু আকবর ! আল্লাহু আকবর ! !

তাকিয়া নৃত্য

হিন্দোল—কাওয়ালি

নাচে মাড়োওয়ার লালা
নাচে তাকিয়া।
(নাচে) ভোঁদড় হিন্দোলে
ঝোপে থাকিয়া ॥

পায়জামা পরে যেন
নাচে গাণ্ডার,
নাচে সাড়ে পাঁচ মণী
ভুঁড়ি পাণ্ডার !
গঙ্গার ঢেউ নাচে
বয়া ঝাঁকিয়া ॥

গামা নাচে, ধামা নাচে,
মুট্‌কি নাচে,
জামা পরে ভল্লুক
নাচিছে গাছে !
ঝগ্‌ড়েটে বামা নাচে
থিয়া তাথিয়া ॥

'ছোট মিঞা' 'বড় মিঞা'
বলি কোলা ব্যাং
বৃষ্টিতে নাচে, নাড়ি
নড়বড় ঠ্যাং।
(নাচে) গুজরাতি হাতি
কর্দম মাখিয়া ॥

হিতে বিপরীত

কীর্তন

আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু
(সে) লইল মিঞার ঘরে।
আমার কালি মা ছাড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে
বুঝি মুস্‌লিম করে !

আঁখর :— আমায় বুঝি মুস্‌লিম করে গো !

শেষে আস্ত ধরিয়া গোস্ত খাওয়ায়ে—
মাম্‌দো করিবে গোরে গো !

আমার টিকি করি দূর রেখে দেবে নূর
জবাই করিবে পরে গো॥

আমি বাসব ভাবিয়া রাসভে পূজিনু
স্বর্গে যাইতে সোজা,
সে যে লয়ে এঁদো ঘাটে, ফেলে দিল পাটে
ভাবিয়া ধোবির বোঝা!
আঁখর :— হলো হিতে বিপরীত সবি গো!

আমি ভবানী ভাবিয়া করিতে প্রণাম
হেরি বাগ্‌দিনী ভবি গো।
আমি শীতল হইতে চাহিনু, আনিল
শীতলা–বাহনে ধোবি গো॥

বাবা শিবের বাহন ভাবিয়া বৃষভ–
লাঙুল ঠেকানু ভালে,
হায় নিল না সে পূজা, শিং দিয়ে সোজা
গুঁতায়ে ফেলিল খালে!

আঁখর :— আমার কপাল বেজায় ফুটো গো!

আমি জগন্নাথ হেরিতে হেরিনু
ধবল–কুষ্ঠী ঠুঁটো গো!
বাঁকা অঙ্গ হেরিয়া জড়ায়ে ধরিতে
হেরি ত্রিভঙ্গ খুঁটো গো॥

মোর মহিষী গৃহিণী খুশি হবে ভেবে
মহিষ কিনিয়া আনি!
বাবা মরি এবে ত্রাসে, শিং নেড়ে আসে
মহিষ, মহিষী রানি!

আঁখর :— আমি কেমনে জীবন ধরি গো!

আমি 'হরি বোল' বলে ডাকিতে হরি–রে!
হয়ে যায় 'বল হরি' গো॥

খিচুড়ি জন্তু

মালবশ্রী—কাওয়ালি

জন্তুর মাঝে ভাই উট—খিচুড়ি !
মদ খেয়ে সৃজিয়াছে স্রষ্টা-শুঁড়ি ॥
দো-তালার উঁচু আর তে-তালার ফাঁক—
ঢিমে তে-তালার ফাঁক,
অষ্টাবক্রীয় দশটা বাঁক,
হামা দিয়ে চলে যেন তাড়কা খুড়ি ॥

জিরাফের গলা তার ঘোটকিনী মুখ,
আগাগোড়া গোঁজামিল বাঁদুরে ভালুক,
গাড়িকে এ গাড়ি বাবা জুড়িকে জুড়ি ॥

লাগিয়াছে দেহে গজ-কচ্ছপ রণ,
কচ্ছপী পিঠ আর গজ-নী চরণ,
আরবের হাজি মিঞা—বাপ্ রে, থুড়ি ॥

যদি

কীর্তন

যদি শালের বন হতো শালার বোন্
আর কনে বৌ হতো ঐ গৃহেরি কোণ।
ছেড়ে যেতাম না গো,
আমি থাকিতাম পড়ে শুধু, খেতাম না গো !
যদি শালের বন হতো শালার বোন্—
আমি ঐ বনে যে হারিয়ে যেতাম !
ঐ বৃন্দাবনে চারিয়ে যেতাম !

ঐ মাকুন্দ হতো যদি কুন্দ-বালা,
হতো দাড়িম্ব-সুন্দরী দাড়িওয়ালা !

আমি ঝুলে যে পড়িতাম
তার দাড়ি ধরে—
ওগো দুর্গা বলে—
আমি ঝুলে যে পড়িতাম !

হতো চিম্‌টি শালীর যদি বাব্‌লা-কাঁটা,
আর শর-বন হতো তার খ্যাংরা ঝাঁটা !

দোয়ার্কি :— বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর খ্যাংরা মেরে
বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর !

যদি একই শালী
দিলে গো মা কালি,
সে যে শালী নয়, বিশালী (মা গো)
মাগো বিশাল বপু তার,
বিশালী সে—শালী নয় শালী নয় !

প্যাক্ট

কোরাস :—

বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে,
নব-প্যাক্টের আশনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি,
হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ৷৷

আঁটসাঁট করে গাঁট-ছড়া বাঁধা
হলো টিকি আর দাড়িতে,
'বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো' ? তা
হয় হোক তাড়াতাড়িতে !
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে,
অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট
সেই টানাটানি ভীষণে !

বুকে বুকে মিল হলো নাকো, মিল
হলো পিঠে পিঠে? তাই সই।
মিঞা ক'ন, 'কোথা দাদা মোর?' আর
বাবু ক'ন, 'মিঞা ভাই কই?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে 'খেজাব',
মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়–চোখাচোখি,
কি মধু–মিলন হইল!
বাবু কন, 'খাই তোমারে তুষিতে
ঐ নিষিদ্ধ কুঁক্‌ড়ো!'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা,
যদি দাও দুটো টুক্‌রো!
মোদের মুরগি হলো রামপাখি, দাদা,
তাও হলো শুদ্ধি?
বাদশাহি গেছে, মুরগিও গেল,
আর কার লোভে যুদ্ধি॥'

বাবু কন, 'পরি লুঙি বি–কচ্ছ
তোমাদের দিল্ তুষিতে!'
মিঞা কন, 'রাখি ফেজে চৈতনি–
ঝাণ্ডা সেই সে খুশিতে!
আমাদের কত মিঞা ভাই করে
বাস তব বারানসীতে,
(আর) বাত হলে ভাই ভাত খাই নাকো
আজো তাই একাদশীতে!'
বাবু কন, 'দ্যাখো চটিকা ছাড়িয়া
সেলিমি নাগ্‌রা ধরেছি!'
মিঞা কন, 'গরু জবাইএর পাপ
হতে তাই দাদা তরেছি!'
বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি,
ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা!'
মিঞা কন, 'দাদা মুরগি তো নাই,
কি দিয়া খাইব পরটা!'

বাবু কন, 'গরু কোরবানি করা
ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
তোরে সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে
মা'র মন্দিরে নিয়া যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞার
ঘরে নাহি লও হরিনাম,
বলদের সাথে ছাড়িব তোমারে,
যা হয় হবে সে পরিণাম!'
'সারা-রারা-রারা' সহসা অদূরে
উঠিল হোরির হর্‌রা!
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া,
ছক্কু মিঞা নিল ছোর্‌রা!
লাগিল হেঁচ্‌কা হেঁইয়ো হাঁইয়ো,
টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে—
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি
নব-প্যাক্টেরি পুণ্যে।

বদনা-গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি,
রোল উঠিল 'হা হন্ত!'
ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গি-মাতুল
হাসে ছিরকুটি দন্ত!
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা,
মন্দির পানে হিন্দু;
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা,—
করুণ চন্দ্রবিন্দু!

সর্দা-বিল

ডুব্‌ল ফুটো ধর্ম-তরী,
ফাট্‌ল মাইন সর্দার।
উঠল মাতম 'সামাল সামাল'
ব-মাল মেয়ে-মর্দার॥

১

এ কোন্ এল বালাই, এবে
পালাই বলো কোন্ দেশ।
গাছের তলায় ঘোড়েল শেয়াল,
কাকের মুখে সন্দেশ!
কন্যা-ডোবা বন্যা এল,
ডুবল বুঝি ঘর-দ্বার॥

২

আয়েশ করে বিয়ের মেয়ের
বাড়্‌বে বয়েস চৌদ্দ,
বাপের বুকের তপ্ত খোলায়,
দিব্যি গেয়ান-বোধ তো!
হদ্দ হলেন বৌদি ভেবে,
ছাড়্‌ল নাড়ি বড়্‌দা'র॥

৩

শূন্য স্বর্গ-মার্গে যেত
গৌরীদানের মারফৎ
যমের যমজ জামাত্‌কে
লিখে দিয়ে ফারখত
নৈকস্য কস্য এখন,
জাত গেল 'মেল খড়্‌দা'র॥

৪

দেব্‌তা বুড়ো শিব যে মাগেন
আট-বছরী নাত্‌নি,
চতুর্দশী মুক্ত-কেশী—
কনে নয়, সে হাথ্‌নি!
পুঁটুলি নয়, এঁটুলি সে,
কিংবা পুলিশ-সর্দার॥

৫

সিঙ্গি চড়া ধিঙ্গি মেয়ে
বৌ হবে কি, বাপ্ রে!
প্রথম প্রণয়–সম্ভাষণেই
হয়তো দেবে থাপ্পড়ে!
লাফ দিয়ে সে বাইরে যাবে
ঝাঁপ খুলে ঐ পর্দার॥

৬

সম্বন্ধ ভুলে শেষে
যা তা বলে ডাকব?
বধূ তো নয়—যদুর পিসি!
কোথায় তারে রাখব!
ধর্মিনী নয়, জার্মানি–শেল!
গো–স্বামী! খবরদার!

৭

ঠাকুর ভাশুর মান্‌বে নাকো,
রাখবে না মান দুর্গার
হয়তো কবে বল্‌বে—'পিও,
ঝোল রেঁধেছি মুর্গার!'
আনবে কে বাপ গুর্খা–সিপাই
দন্ত–নখর–বর্দার॥

৮

টাকাতে নয়, ভাব্‌নাতে শেষ
মাথাতে টাক পড়বে!
যোদ্ধা বামা গুটিয়ে জামা
কথায় কথায় লড়বে!
যেই পাবে না শেমিজ বডিস্
কৌটো পানের জর্দার॥

৯

জাত মেরেছিস্, ভেবেছিনু,
জাতিটা নয় যাক্ গে,
গৃহিণী-রূপ গ্রহণীরোগ
তাও ছিল শেষ ভাগ্যে !
দোক্তা ফেলে গিন্নি কাঁদেন,
কর্তা চলেন হর্‌দ্বার ॥

লীগ-অব-নেশন্

[সিংহ—ইংরাজ ॥ হস্তী—ভারতবর্ষ ॥ বাঘ—ফ্রান্স ॥ ভল্লুক—রুশিয়া ॥ হাঙর—ইটালি ॥ নেকড়ে—অস্ট্রীয় ॥ শিবা—গ্রীস ॥ হায়েনা—আমেরিকা ॥ ঈগল—জার্মানি ॥]

কোরাস্ :—

বসেছে শান্তি-বৈঠকে বাঘ,
সিংহ, হাঙর, নেকড়ে !
বৈষ্ণব গরু, ছাগ, মেষ এসে
হরিবোল বলে দেখ্ রে ॥

শিবা, সারমেয়, খটাস, শকুনি—
দু'নয়ন লবণাক্ত
কেঁদে কয়, 'দাদা, নামাবলী নেবো
আর রবো নাকো শাক্ত !

কেন রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি বৃথা,
দিব ফেলে নখ দন্ত,
তপস্বী হয়ে বনে যাব সবে,
পশুর হউক অন্ত।

ছাগ মেষ সব কে কোথা আছিস্,
নিয়ে আয় সব ঢাক-ঢোল,
এসেছেন গোরা, প্রেম-আনন্দে
ন্যাজ তুলে সবে হরিবোল !

শিশু–হাসি হেসে নব যিশু–বেশে
এসেছেন আহা বনমাঝ,
অজিন–আসন এনে দে হরিণ,
বসিবেন গোরা, পশুরাজ॥'

পশুরাজ ক'ন, 'পশুদল, শোনো,
শোনো মোর বাণী স্বস্তির।'
বাঘা কয়, 'প্রভু! দন্ত বেজায়
বাড়িয়া উঠিছে হস্তীর।'

প্রভু কন, 'বাবা শান্তির এই
বৈঠক তারি জন্যে!'
নেক্‌ড়ে অমনি কহে, 'চুপ! চুপ!
শুনিয়া ফেলিবে অন্যে!'

হাবাতে হাঙর খেজুর–গুঁড়ির
লেজুড় করিয়া উচ্চ,
বলে, 'প্রভু তুমি ধূমকেতু–তারা,
এ ভক্ত তার পুচ্ছ!'

প্রভু কন, 'আহা, এতদিন পরে
মিলিল ভক্ত হনুমান!'
হাঙরের চোখে সাঁতার–সলিল,
বলে, 'প্রভুর কি অনুমান!'

খেঁকড়ে–কণ্ঠ নেকড়ে কহিল,
'হায়েনা তো প্রভু আয়েনা!
আমরা করিব হরিনাম, আর
সে নেবে আফ্রিকা চায়েনা!'

ব্যাঘ্র কহিল, 'সে স্যাঙাৎ যে রে
আছে রগ ঘেঁষে আমারই!'
প্রভু কন, 'ঐ নোড়া দিয়ে দাঁত
ভাঙিব ভালুক মামারই॥'

হাঙর কহিল 'ভালুক মামা যে
ক্রমেই আসিছে রুশিয়া !'
প্রভু কন, 'আর ক'টা দিন ব্যাটা
বাঁচিবে আমড়া চুষিয়া ?'

লড়ালড়ি করে হায়েনা ভালুক
দুটোরি ধরিবে হাঁপানি,
ছিনেজোঁক র'বে লাগিয়া পিছনে,
পাশে চিতে বাঘ জাপানি !

হাড়গোড়-ভাঙা ঈগল পক্ষী
কহিল পক্ষ ঝাপটি,
'প্রভু তব পিছে চাপকান-ঢাকা
আফগান মারে ঘাপ্‌টি !'

প্রভু কন, 'ওরি ভাব্‌নায় বাবা
ধরেছে রক্ত-আমেশা !
গোস্ত্‌ খাওয়ায়ে দোস্ত করিতে
তাই তো চেষ্টা হামেশা !'

শিবা কয়, 'প্রভু, সুর্কি-রাঙানো
টুপি ছাড়িয়াছে তুর্কি !'
প্রভু কন, 'মজি সংসার-মোহে
ছাড়িল খোদার নূর কি ?

কপাল মন্দ ! কি করিবে বল !
অদৃষ্টে নাই ভেস্ত !'
শিবা কয়, 'যাব আমিই ভেস্তে
তাহলে, বিচার বেশ তো !'

সাত হাত দাঁত বের করে এল
এমন সময় হস্তী,
শুণ্ড বুলায়ে মুণ্ডে কহিল,
'করো মোরও সাথে দোস্‌তি !'

'রে গজমূর্খ !' বলি প্রভুপাদ
পশুরাজ ওঠে গর্জি—
'কার মর্জিতে তুই এলি হেথা
চিড়িয়াখানারে বর্জি !'

'গজরাজ আমি, অজ নই কহে,
অঙ্গ দুলায়ে হস্তী,
'চিড়িয়াখানার পিঞ্জর ভেঙে
এসেছি বনের হস্তী !'

শকুনি, খটাস, শিবা, সারমেয়
তুলিল ভীষণ কলরোল ;
তক্ত প্রভুর তুলি পশুদল
বলে, 'বল হরি হরিবোল !'

ডোমিনিয়ন স্টেটাস্

কোরাস্ :

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা,
বসে কেন অম্‌নি রে !
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি,
মা হবেন আজ ডোম্‌নি রে॥

রাজা শুধু রাজাই রবেন
পগার-পারে নির্বাসন,
রাজ্য নেবে দু'ভাই মিলে
দুর্যোধন আর দুঃশাসন !

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রবে
সিংহাসনে মাত্র নাম !
কোঁৎকা যাবে, রইবে শুধু
বোঁটকা খানিক গাত্র-ঘাম॥

অনেক-কিছু সয়ে গেছে,
গন্ধটা আর সইবে না?
কি ক'স? গলা-বন্ধটা? এও
দু'দিন বাদে রইবে না!

কল্‌সি-কানার প্রহার খেয়েও
প্রভু কেয়্‌সা প্রেম বিলায়।
গউর বলে, 'প্রেম্‌সে নাচে
জগাই মাধাই—দেখ্‌বি আয়॥

রইত তো কেউ রাজা হেথাও,
না হয় সেথাই রইল কেউ!
আচ্ছা ফ্যাসাদ যা হোক! তবু
বাঘের পিছে লাগ্‌বি ফেউ?

ঠুঁটো হলেও হাত পেলি তো!
ছিলি যে একদম্ বে-হাত!
একেবারেই ঠ্যাং ছিল না,
পেলি তো এক ঠ্যাং নেহাৎ!

ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক—আর
আকাঁড়া—তাই ঝোলায় ভর্।
ওই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক্!
ফেনও পাবি অতঃপর॥

ধৈর্য ধরে থাকে বেড়াল
তাই তো শেষে পায় কাঁটা,
পাত হতে সে মাছ তুলে নেয়?
তেমনি সে যে খায় ঝাঁটা॥

ভারত একার নয় তো কারুর—
বিশ্ব-আড়ত, পীঠস্থান!
পারত্-পক্ষে মার্‌তে কসুর
করেনি কেউ হূন পাঠান!

চিরটাকাল বনের মোরা
লোমশ-মুনিই ছিলুম দেখ্ !
আহার ছিল শাক পাতা আর
ভাবের গাঁজা ছিলিম টেক ! !

আজ তবু কেক বিস্কুট খাস,
হয়েও গেলি প্রায় রাজাই !
গাল বাজাই আর কানাডা আর
অস্ট্রেলিয়ার ভায়রা-ভাই !

ধুচ্‌নি মাথায় হাতে ধামা
দেখে মোদের রসিক-রাজ—
ডোমের জাতি ভেবে—দিলেন
ডোম্‌নি করে মাতায় আজ ॥

বন্দিনী মা ছিলেন আহা,
আজ দিয়েছে মুক্তি রে !
বাজাও ধামা মামার নামে,
রক্ত ঢাল বুক চিরে ॥

এবার থেকে ধামাধারী
বলদ-দল, ভাবনা কি ?
দিব্যি খাবে ডুবিয়ে নুলো
পাৎনা নাদায় জাব মাখি ॥

হাতির পিছে নেংচে চলে
ব্যাংছা এবং খল্‌সে রে !
দোহাই দাদা, চলিস্‌নে আর,
চোখ যে গেল ঝল্‌সে রে !

'মাভৈ ! এবার স্বাধীন হনু !'
যাই বলেছি, পৃষ্ঠে ঠাস !
পড়্‌ল মনে, পীঠস্থান এ,
ডোমিনিয়ন্ স্টেটাস্ !

‘দে গরুর গা ধুইয়ে’

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে ॥
উল্টে গেল বিধির বিধি
আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে,
মদ্দ করেন চড়ই-ভাতি !

পলান পিতা টিকেট করে—
খুকি তাঁহার পিকেট করে !
গিন্নি কাটেন চরকা, —কাটান
কর্তা সময় গাই দুইয়ে !

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে ॥
চর্মকার আর মেথর চাঁড়াল
ধর্মঘটের কর্মগুরু !
পুলিশ শুধু কর্‌ছে পরখ্
কার কতটা চর্ম পুরু !

চাটুয্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত-বাড়ি !
বোঁটকা-গন্ধি ভোজপুরী কয়
বাঙালিকে—‘মৎ ছুঁইয়ে !’

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে ॥
মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন
রান্না করে কার না বাড়ি,
গা ছুঁলে তার লোম ফেলে না,
ঘর ছুঁলে তার ফেলে হাঁড়ি !

মেয়েরা যান মিটিং হেদোর,
পুরুষ বলে, ‘বাপ্ রে দে দোর !’
ছেলেরা খায় লাপ্‌সি হুড়ো,
বুড়োর পড়ে ঘাম চুঁইয়ে !

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
ভয়ে মিঞা ছাড়ল টুপি,
আঁটল কষে গোপাল-কাছা,
হিন্দু সাজে গান্ধি-ক্যাপে,
লুঙ্গি পরে ফুঙ্গি চাচা!

দেখ্‌লে পুলিশ গুঁতোয় ষাঁড়ে,
পুরুষ লুকায় বাঁশের ঝাড়ে!
খ্যাঁদা বাদুড় রায়-বাহাদুর,
খান্-বাহাদুর কান খুইয়ে॥

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
খঞ্জ নেতা গঞ্জনা দেয়,
চল্‌তে নারে দেশ যে সাথে!
টেকো বলে, 'টাক ভালো হয়
আমার তেলে, লাগাও মাথে!'

'কি গানই গায়'—বল্‌ছে কালা;
কানা কয়, 'কি নাচ্‌ছে বালা!'
কুঁজো বলে, 'সোজা হয়ে
শুতে যে সাধ, দে শুইয়ে!'

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
সস্তা দরে দস্তা-মোড়া
আস্‌ছে স্বরাজ বস্তা-পচা,
কেউ বলে না, 'এই যে লেহি'
আস্‌লে 'যুদ্ধ দেহি'র খোঁচা।

গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া,
বেগুন চড়ে গাড়ি-ঘোড়া!
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে
ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে!

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥

রাউন্ড-টেবিল-কন্‌ফারেন্স

কোরাস্ :

দড়াদড়ির লাগ্‌বে গিঁঠ
গোল-টেবিলের বৈঠকে !
ঠোকর মারে লোহায় ইঁট,
এ ঠকে কি ঐ ঠকে॥

ব্যাণ্ড্ বাজে, ইংল্যান্ডে ঐ
চল্‌ল লিডার্স এ্যান্ড কোং,
শকুন মাতুল কাল্‌নেমি,—
কণ্ঠে লাউড্-স্পিকার চোং !
তাদের ছাড়া কুম্ভীরে
মাছের দুঃখ কইত কে॥

চল্‌ছে নরম গরম চাঁই
হোম্‌রা চোম্‌রা ওমরা যায়,
ধুন্‌তে তুলো ধপড় ধাঁই
ডোমিনিয়ন-ডোমরা যায়।
বল্‌ছে ডেকে, 'দেখ্ রে দেখ
প্রতাপ চলে চৈতকে॥'

ডিম্-গোলাকার গোল-টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিবে তায় ধাড়ির দল,
তা নয় দিলে তত্তঃকিম্ ?
আনবে স্বরাজ ব্রিটিশ-বর্ন,
অস্ট্রেলিয়ার ভাইপোকে॥

স্বর্গ ভেবে ধাপার মাঠ
ধাপা-মেলের ময়লা যায়,
কুটুম ভেবে কেষ্টরে
বৈকুণ্ঠে গয়লা যায়
স্বরাজ-মাখম উঠ্‌বে যে—
নইলে এ ঘোল মইত কে॥

বেছে বেছে পিঁজরাপোল
নড়বড় বড়র দল
আন্‌ল বুড়ো হাবড়াদের,
যাত্রা–কমিক দেখ্‌বি চল্‌ !
ঘাঁটা–পড়া ঘাড় ওদের,
নয় এ বোঝা বইত কে ॥

বাঘ নেবে পাঠ বেদান্তের,
বি–দন্ত সব পুরুত্‌ যায়,
করবে শান্তি মন্ত্রপাঠ
ব্যাঘ্র ! ব্যাঘ্র বক্ষে আয় !
শিখাবে অদ্বৈতবাদ
দ্বিধা–ভক্ত দ্বৈতকে ॥

বাধাস্‌নে আর লট্‌ঘটি
দোহাই বাবা চ্যাংড়া থাম্‌ !
এমন ফলার কাঁচ্‌কলার,
তোরাও পাবি ল্যাংড়া আম !
সাগর মথি আন্‌বে সব
হয় সুধা নয় দই টকে ॥

সাহেব ও মোসাহেব

সাহেব কহেন, ‘চমৎকার ! সে চমৎকার !’
মোসাহেব বলে, ‘চমৎকার সে হতেই হবে যে !
হুজুরের মতে অমত কার ?’

সাহেব কহেন, ‘কী চমৎকার,
বলতেই দাও, আহা হা !’
মোসাহেব বলে, ‘হুজুরের কথা
শুনেই বুঝেছি, বাহাহা বাহাহা বাহাহা !’

সাহেব কহেন, 'কথাটা কি জানো? সেদিন—'
মোসাহেব বলে, 'জানি না আবার?
ঐ যে, কি বলে, যেদিন—'

সাহেব কহেন, 'সেদিন বিকেলে
বৃষ্টিটা ছিল স্বল্প।'
মোসাহেব বলে, 'আহা হা, শুনেছ?
কিবা অপরূপ গল্প!'

সাহেব কহেন, 'আরো ম'লো! আগে
বল্‌তেই দাও গোড়াটা!'
মোসাহেব বলে, 'আহা-হা গোড়াটা!
হুজুরের গোড়া! এই, চুপ, চুপ ছোঁড়াটা!'

সাহেব কহেন, 'কি বল্‌ছিলাম,
গোলমালে গেল গুলায়ে!'
মোসাহেব বলে, 'হুজুরের মাথা! গুলাতেই হবে।
দিব কি হস্ত বুলায়ে!'

সাহেব কহেন, 'শোনো না! সেদিন
সূর্য উঠেছে সকালে!'
মোসাহেব বলে, 'সকালে সূর্য?
আমরা কিন্তু দেখি না কাঁদিলে কোঁকালে!'

সাহেব কহেন, 'ভাবিলাম যাই,
আসি খানিকটা বেড়ায়ে।'
মোসাহেব বলে, 'অমন সকাল! যাবে কোথা বাবা,
হুজুরের চোখ এড়ায়ে!'

সাহেব কহেন, 'হলো না বেড়ানো,
ঘরেই রহিনু বসিয়া!'
মোসাহেব বলে, 'আগেই বলেছি! হুজুর কি চাষা,
বেড়াবেন হাল চষিয়া?'

সাহেব কহেন, 'বসিয়া বসিয়া
পড়েছি কখন ঝিমায়ে !'
মোসাহেব বলে, 'এই চুপ সব !
হুজুর ঝিমান্ ! পাখা কর্, ডাক্ নিমাইএ !'

সাহেব কহেন, 'ঝিমাইনি, কই
এই তো জেগেই রয়েছি !'
মোসাহেব বলে, 'হুজুর জেগেই রয়েছেন, তা
আগেই সবারে কয়েছি !'

সাহেব কহেন, 'জাগিয়া দেখিনু, জুটিয়াছে যত
হনুমান আর অপদেব !'
'হুজুরের চোখ, যাবে কোথা বাবা ?'
প্রণমিয়া কয় মোসাহেব ॥

ছুঁচোর কীর্তন

কীর্তন গায় ছুচুন্দর,
হুতুম প্যাঁচা বাজায় খোল।
ছাতার পাখি দোহার গায়
গোলেমালে হরিবোল ॥

কিচির-মিচির কিচির-কিচ্
ইঁদুর বাজায় মন্দিরা,
তানপুরা ঐ বাজায় ব্যাং
ওস্তাদের সম্বন্ধীরা।
শালিক বায়স ভক্তদল
হরিবোলের লাগায় গোল ॥

হুলো বেড়াল মিয়াঁও ম্যাঁও
করছে শুরু খেয়াল-গান,
ব্যা-এ্যা-এ্যা-এ্যা পুং অজ
মারছে জলদ হলক্-তান।

রাসভ গলা ভাঙল তার
ধ্রুপদ গেয়ে খেয়ে ঘোল ॥

টপ্‌পা-গানের ঝাড়ছে তান
চিঁ-হিঁ-হিঁ-চিঁ-হিঁ-হিঁ অশ্বরাজ,
ঠুংরি-গানের ঝট্‌কা-তান
মারছে ফড়িং ঝোপের মাঝ।
খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গায়
বলদ গিয়ে পিঁজ্‌রোপোল ॥

লেড়ি কুকুর বাউল গায়
পুচ্ছ তুলি উচ্চ মুখ,
ভাটিয়ালি-গান শেয়াল গায়
ভীষণ শীতের ভুল্‌তে দুখ।
গাব্‌-গুব্‌গুব্‌ 'কুক্‌' পাখি
বাজায়, ভুতুম বাজায় ঢোল ॥

ধরা গলায় মহিষ গায়
যেন বুড়ো খাঁ সায়েব,
কাব্‌লিওয়ালা বেহাগ গায়
'মোর মগায়া' খেয়ে শেব্‌।
ভেড়া বলে, 'কণ্ঠ মোর
গেছে ধরে খেয়ে ওল !'

সাইমন-কমিশনের রিপোর্ট

[প্রথম ভাগ]

ভারতের যাহা দেখিলেন

কোরাস্‌ : —
'কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে,'
রিপোর্টে লেখেন সাইমন—

হুটোপুটি করে ছুটোছুটি করে
বুড়োবুড়ি, কাজে নাই মন !

'ম্যাদা' দল আর 'উদো' দল পায়ে
হস্ত বুলায় হর্দম,
পুঁচকে দলের ফচ্‌কে ছোঁড়ারা
ছিটাইছে বটে কর্দম !

ত্যক্তের চেয়ে ভক্তই বেশি,
আহাহা ভক্ত বেঁচে থাক্ !
ছোলা ভাজা দেবো, কাঁচকলা দেবো,
নিশ্চয়ই মনে এঁচে রাখ্॥

আসিতে ভারতে সান্‌কি লইয়া
আসিল ফকির ফোক্‌রা,
পিছন হইতে ঠোক্‌রায় টাকে
ডেঁপো গোটা কয় ছোক্‌রা।

ছেলে যা দেখিনু, ছেলের চাইতে
পিলে বড়, অধিকন্তু—
বৃহত্তম 'জু' দেখিনু জীবনে—
প্রথম দু'পেয়ে জন্তু॥

মাথা নাই হেথা, নাইকো হৃদয়,
শুধু পেট আর পিঠ সার,
এত 'পিঠে' খেয়ে কেমনে হজম
করে, করে নাকো চিৎকার !

ঠুঁটো হাত শুধু চিৎ করে রাখে
শূন্যের পানে তুলিয়া,
বিপদে শ্রীপদ ভরসা, তাহাও
শ্লীপদে গিয়াছে ফুলিয়া॥

মাড়োয়ারি আর 'ম্যালোয়ারি' জ্বর
এদের পরম মিত্র,

মরমরদেরে একেবারে মেরে
রাখিছে দেশ পবিত্র !

ইহাদের হরি বন্ধু মোদেরি
'গুড্ ওল্ড্ জেন্টল্ম্যান্',
কচুরি-পানায় ডোবা ও খানায়
এঁর কৃপা করে 'ভ্যান্ ভ্যান্'॥

এদেশের নারী বেজায় আনাড়ি,
পুরুষের হাতে তবলা,
তবলাতে চাঁটি মারিলে সে কাঁদে,
ইহারা কাঁদে না, অবলা !

জরিশাড়ি-মোড়া চকলেট ওরা
বন্দী হেরেম-বাক্সে,
বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ,
কাজেই বাক্সে থাক্ সে॥

ইস্কুলে, প্রেমে, জ্বরে পড়ে পড়ে
জীবন কাটায় ছেলেরা ;
মাঝে মাঝে করে ভ্রান্ত শিষ্ট
শান্তে লেনিন ভেলেরা।

চোখের চাইতে চশমাই বেশি,
ভাগ্যিস্ ওরা অন্ধ,
নইলে কখন টানিয়া ধরিত
আমাদের গলা-বন্ধ॥

আমাদের দেখাদেখি কেহ কেহ
করিছে ক্লাবের মেম্-বার,
স্কার্ট্ পরে চাষারা, বাবুরা
বিবি লয়ে যায় চেম্বার !

বিলিতি দাওয়াই ধরিতেছে ক্রমে,
আর বাকি নাই বেশি দিন,

গুড্‌বয় হয়ে গিলিছে আফিম,
হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, কুইনিন্॥

কাফ্রি চেহারা, ইংরিজি দাঁত,
টাই বাঁধে পিছে কাছাতে ;
ভীষণ বন্ধু চাষ করে ওরা
অস্ত্র-আইন বাঁচাতে !

চাচা-ভাইপোতে মিল নাই সেথা
আড়াআড়ি টিকি দাড়িতে,
যুদ্ধ বাধাই উহাদেরি দিয়ে,
ধরিয়া আনাই ফাঁড়িতে॥

উহাদের মতো কেলে রঙ সব
গাছ্‌পালা জল আকাশের,
উহাদের গাই মোদেরি গাই-এর
মতো সাদা দুধ দেয় ফের॥

কালো চামড়ার ভিতরে ওদের
আমাদেরি মতো রক্ত,
এ যদি না হতো—শাশ্বত হতো
ও-দেশে মোদের তক্ত !

[দ্বিতীয় ভাগ]

ভারতকে যাহা দেখাইলেন

কোরাস্ : —

'যিশুখ্রিস্টের নাই সে ইচ্ছা,
কি করিব বল আমরা !
চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি
ভারতে বিলিতি আমড়া॥

চামড়া ওদের আমাদের মতো
কিছুতেই নহে হইবার !
হোয়াইট্‌ওয়াশ্‌ যা করিয়াছি—তাই
দেখিতেছি নহে রইবার !

আমাদের মতো যারা নয় তারা
অম্‌নি রবে, কি করে বল্‌ !
সাদাদের মতো কালা অসভ্য
হইবে স্বাধীন? হরিবল্‌ !

আঁঠি ও চামড়া বিলিতি আমড়া
মন্টেগু দিল চুষিতে ;
শাঁস নাই বলে কাঁদিল, দিলাম
বিলিতি কুমড়ো তুষিতে।

তাহাতেও যারা খুশি নয়, এত
ভূষি খেয়ে ভরে নাকো পেট,
ঘুষি বরাদ্দ তাহাদের তরে,
ঝুঁটি ধরে কর মাথা হেঁট॥

পুলিশের লাঠি আরো বড় হোক,
আরো যেন তাতে থাকে গিঁঠ,
হস্তেরে ফেল অস্ত্র-আইনে,
ঘর হতে তোলা হোক ইঁট !

কাগজের শুধু হইয়াছে নোট,
কাগজের হোক রুটিও,
মাথা কেটে দাও, কেটে দাও হাত
থাকে নাকো যেন টুঁটিও॥

যতটুকু দড়ি ছাড়িয়াছ, তাহা
গুটাইয়া লও পুনরায়,
একবার যদি বেড়া ভাঙে, তবে
আরবার ধরা হবে দায় !

আরো প্রশস্ত করে দাও পিঠ
ধুর্মুস-পেটা করিয়া,
টিকি ও দাড়ির চাষ করো, লহ
নখর দন্ত হরিয়া॥

ও-দেশের জলে ম্যালেরিয়া-বিষ,
উহারা বিলিতি-জল খাক।
গুলি খেতে দাও তাদেরে, ওদের
চ্যাঁচায় যে একদল কাক!

পা কেটে ওদের ঠেকো করে দাও,
উহাদের সাথে ছুটিতে
হার মেনে যায় এরোপ্লেন, পায়ে
গুলি পারে নাকো ফুটিতে॥

শিরিঞ্জ্ লইয়া আরো ফাঁপাইয়া
দাও প্লীহা আর যকৃৎ!
ঢাক কিনে দাও হিঁদুরে, মুসল-
মানে বলো, করো বক্‌রিদ।

ভাতে নাই কিছু ভিটামিন্, ওতে
মদ হোক, ওরা খাক ফেন,
এ স্বাস্থ্যে ভাত বড় ক্ষতিকর,
খুব জোর দুটো শাক দেন॥

অতিশয় বেশি কথা কয়ে কয়ে
বাড়াতেছে প্যাল্‌পিটেশন্,
গ্যাগ্ পরাইতে করো সশস্ত্র
ডাক্তারে ইন্‌ভিটেশন্।

মা ভগবতীর সার উহাদের
ব্রেনে আরো দাও পুরিয়া,
যদি থাকে মেরুদণ্ড কারুর
দাও তা ভাঙিয়া চুরিয়া॥

বোমা মেরে মেরে পায় নাকো খুঁজে
আজও উদরে 'ক' অক্ষর,
এ মেষ কেমনে সভ্য ষাঁড়ের
সহিত হানিবে টক্কর?

পায়ে ও গলায় ছাড়া ইহাদের
কোনো সে অঙ্গে বল নাই,
ব্যারাম মাফিক ওষুধ দিলাম,
দিলাম কিন্তু ফল নাই॥

প্রতিদ্বন্দ্বী

বাউল

আমি দেখেছি তোর শ্যামে
দেখেছি কদম-তলা,
আমি দেখেছি তোর অষ্টাবক্রের
আঁকাবাঁকা চলা
তার যত ছলাকলা।
দেখেছি কদম-তলা॥

তুই মোর গোয়ালের ছিঁড়ে দড়ি
রাত-বিরেতে বেড়াস্ চরি,
তুই রাখাল পেয়ে ভুলে গেছিস্
আয়ান-ঘোষের রলা!
দেখেছি কদম-তলা॥

প্রাথমিক শিক্ষা বিল

(নেপথ্যে কোরাস্)
এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
এই দেশটা ভীষণ মূর্খ,
এবার ঘুচাব দেশের দুঃখ।
হবে চাষারা উচ্চ-প্রাইমার,
ওরে আর এদেশের নাই মোর !
ছুটে আয় আয় সব ছেলেমেয়ে—
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

বহু দিন ধরি করি আঁক-পাঁক
এবে মিলিয়াছে মনোমতো ফাঁক।
তোরা মাথা-পিছু সব টাকা গোন্
দিব পণ্ডিত করে বাছাধন !
হবি বাবু সাব রে অলপ্পেয়ে !
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

তোরা পাস্‌নেকো খেতে মাড় ভাত,
নাই পরনে বসন আধ-হাত।
পাবি অন্ন-বস্ত্র এইবার
এই আইন হইবে যেইবার !
টাকা তোল্ তোরা আদা-জল খেয়ে।
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

তোরা কর্‌ছিস কি অবিশ্বাস ?
কেন ছাড়িস্ দীর্ঘনিশ্বাস ?
মোর টাকার কি আর ভাব্‌না,
ঐ টাকা বিনে খেতে পাব না ?
চলে রাজ্য কি তোর মুখ চেয়ে ?
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

এই শিক্ষার লাগি হর্দম
বলি খরচটা কিছু করি কম ?
আজো গ্রাম-পিছু প্রতি বৎসর
আট আনা করে দিই, মনে কর্ !
তবু আছে অজ্ঞান-ভূতে পেয়ে।
(কোরাস্) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

দিয়ে তোদেরি শিল ও নোড়া রে
ভাঙিব তোদেরি দাঁতের গোড়া রে !
'বাই জোভ !' আরে ছি ছি, তা নয়,
তোরা ভাবিস্ তাহাই যা নয় !
ধিনি কেষ্ট রে, নেচে আয় ধেয়ে।
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

বলি, চারটে করে তো পয়সা,
তাতেই চেঁচিয়ে ধরালি বয়সা !
তাও পাঁচটা কোটি তো লোক ছাই,
হয় ক'টাকা সে—তুই বল্ ভাই !
তবু ফ্যালফ্যাল করে রস চেয়ে ?
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

তোরা কতই রকম দিস্ 'সেস্',
হলি 'সেস্' দিয়ে দিয়ে নিঃশেষ,
ওরে জ্ঞান-এরণ্ডের এ যে ফল !
এ-ও না খেলে আর কি খাবি বল্ !
জ্ঞান- কাণ্ডারী এল তরী বেয়ে !
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

হবি এবার বিদ্যে-দিগ্‌গজ,
পোকা করিবে মগজে বজ্‌বজ্ !
হবি মুন্সেফ, হবি সাব্‌জজ্,
হবি মিস্টার যত অন্ত্যজ !
আয় আমাদের গুণ-গান গেয়ে !
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

আপা- তত মনে হয় তেতো নিম্,
ভেবে দ্যাখ শূদ্র ও মুস্‌লিম—
তোরা নাক চোখ বুঁজে গিলে ফেল্ !—
তেলা মাথায় দিব না মোরা তেল।
অন্- তত তোরা তরী আয় বেয়ে !
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

সুর-সাকী

১

ভৈরবী—একতালা

গানগুলি মোর আহত পাখির সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম॥

বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখিরে
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে,
লভিবে মরণে চরণ তোমার
সুন্দর অনুপম॥

তারা সুরের পাখায় উড়িতেছিল গো নভে,
তব নয়ন-শায়কে বিঁধিলে তাদের কবে।

মৃত্যু-আহত কণ্ঠে তাহার
এ কি এ গানের জাগিল জোয়ার,
মরণ-বিষাদে অমৃতের স্বাদ
আনিলে নিষাদ মম॥

২

পিলু—কার্ফা

প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর।
প্রাণ কাঁদে ব্যথায় বিরহ-বিধুর॥

স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিশাইলে কোন্ ঘুমের দেশে,
তড়িত-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে আঁধারি হৃদি-পুর॥

আপনা নিয়ে ছিনু একেলা,
কেন সে কূলে ভিড়ালে ভেলা,
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর॥

ঊষার গাঙে গাহন করি
দাঁড়ালে নভে রঙের পরি,
প্রেমের অরুণ উদিল যবে
মিশালে নভে, হে লীলা-চতুর॥

ছিনু অচেতন বেদনা পিয়ে
জাগালে সোনার পরশ দিয়ে,
জাগিনু যখন ভেঙেছে স্বপন
প্রিয় তুমি নাই ঝুরিতেছে সুর॥

কাঁদি মোরা একূল ওকূল
মাঝে কহে স্রোত বিরহ বিপুল
নাহি পারাপার, বেদনা-বিথার
কাঁদন-পাথর লুটায় ব্যথাতুর॥

৩

ভীমপলশ্রী—একতালা

বিদায়-সন্ধ্যা আসিল ঐ
ঘনায় নয়নে অন্ধকার
হে প্রিয়, আমার যাত্রা-পথ
অশ্রু-পিছল করো না আর॥

এসেছিনু ভেসে স্রোতের ফুল
তুমি কেন প্রিয় করিলে ভুল
তুলিয়া খোঁপায় পরিয়া তায়
ফেলে দিলে হায় স্রোতে আবার॥

ধরণীর প্রেম কুসুম-প্রায়
ফুটিয়া নিমেষে শুকায়ে যায়,
সে ফুলে যে মালা গাঁথিতে চায়
তার চোখে চির-অশ্রু-ধার॥

হেথা কেহ কারো বোঝে না মন,
যারে চাই হেলা হানে সে জন,
যারে পাই সে না হয় আপন
হেথা নাই হৃদি ভালোবাসার॥

তুমি বুঝিবে না কি অভিমান
মিলনের মালা করিল ম্লান,
উড়ে যাই মোর দূর বিমান
সেথা গাবো গান আশে তোমার॥

৪

পিলু-খাম্বাজ—কার্ফা

আজি গানে গানে ঢাকব আমার
গভীর অভিমান।
কাঁটার ঘায়ে কুসুম করে
ফোটাব মোর প্রাণ॥

ভুলতে তোমার অবহেলা
গান গেয়ে মোর কাটবে বেলা,
আঘাত যত হানবে বীণায়
উঠবে তত তান॥

ছিঁড়লে যে ফুল মনের ভুলে
গাঁথব মালা সেই সে ফুলে,
আসবে যখন বন্ধু তোমার
করব তারে দান॥

আমার সুরের ঝর্না-তীরে
রচব গানের উর্বশীরে
তুমি সেই সুরেরই ঝর্না-ধারায়
উঠবে করে স্নান॥

কথায় কথায় মিলায়ে মিল
কবি রে, তোর ভরল কি দিল,
তোর শূন্য হিয়া, শূন্য নিখিল,
মিল পেল না প্রাণ॥

৫

দুর্গা-মান্দ্‌—দাদ্‌রা

কত সে জনম কত সে লোক
পার হয়ে এলে হে প্রিয় মোর।
নিভে গেছে কত তপন চাঁদ
তোমারে খুঁজিয়া হে মনোচোর॥

কত গ্রহে, প্রিয়, কত তারায়
তোমারে খুঁজিয়া ফিরেছি, হায়!
চাহ এ নয়নে, হেরিবে তায়
সে দূর স্মৃতির স্বপন-ঘোর॥

হারাই হারাই ভয় সদাই
বুকে পেয়ে বুক কাঁপে গো তাই,
বারেবারে মালা গাঁথিতে চাই
বারেবারে ছিঁড়ে মিলন-ডোর॥

মিলনের ক্ষণ স্বপনপ্রায়
হে প্রিয়, চকিতে মিলায়ে যায়,
শুকাল না মোর আঁখি-পাতায়
চির-অভিশাপ নয়ন-লোর॥

আজো অপূর্ণ কত সে সাধ,
অভিমানী, তাহে সেধো না বাধ !
না মিটিতে সাধ, স্বপন-চাঁদ,
মিলনের নিশি করো না ভোর॥

৬

পিলু—আদ্ধা কাওয়ালি

কে দুয়ারে এলে মোর তরুণ ভিখারি।
কি যাচে ও আঁখি বুঝিতে যে নারি॥
হৃদি প্রাণ মন
বিভব রতন
ডারিনু চরণে, লহ পথ-চারী॥

দুয়ারে মোর নিতি গেয়ে যাও যে গীতি
নিশিদিন বুকে বেঁধে তারি স্মৃতি,
কি দিয়ে ব্যথা নিবারিতে পারি॥

মিলন বিরহ
যা চাও প্রিয় লহ,
দাও ভিখারিনী-বেশ
দাও ব্যথা অসহ,
মোর নয়নে দাও তব নয়ন-বারি॥

৭

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি

কত আর এ মন্দির-দ্বার,
হে প্রিয় রাখিব খুলি।
বয়ে যায় যে লগ্নের ক্ষণ
জীবনে ঘনায় গোধূলি॥

নিয়ে যাও বিদায়-আরতি,
হলো ম্লান আঁখির জ্যোতি,
ঝরে যায় যে শুষ্ক স্মৃতির
মালিকার কুসুমগুলি ॥

কত চন্দন ক্ষয় হলো হায়
কত ধূপ পুড়িল বৃথায়,
নিরাশায় সে পুষ্প কত
ও পায়ে হইল ধূলি ॥

ও বেদীর তলে কত প্রাণ
হে পাষাণ, নিলে বলিদান !
তবু হায় দিলে না দেখা,
দেবতা, রহিলে ভুলি ॥

৮

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কে পাঠালে লিপির দূতী
গোপন লোকের বন্ধু গোপন।
চিনতে নারি হাতের লেখা
মনের লেখা চেনে গো মন ॥

গান গেয়ে যাই আপন মনে
সুরের পাখি গহন বনে,
সে সুর বেঁধে কার নয়নে
জানে শুধু তারি নয়ন ॥

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম,
গান গেয়ে কি ভেঙেছি ঘুম,
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি মোর গানের স্বপন ॥

সুর-সাকী

নাই ঠিকানা নাই পরিচয়
কে জানে ও মনে কি ভয়,
গানের কমল ও চরণ ছোঁয়
তাইতে মানি ধন্য জীবন॥

সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন॥

৯

ভৈরবী—কার্ফা

ফুল ফাগুনের এল মরশুম
বনে বনে লাগল দোল।
কুসুম-শৌখিন দখিন হাওয়ার
চিত্ত গীত-উতরোল॥

অতনুর ঐ বিষ-মাখা শর
নয় ও দোয়েল শ্যামার শিস্,
ফোটা ফুলে উঠল ভরে
কিশোরী বনের নিচোল॥

গুলবাহারের উত্তরী কার
জড়াল তরু-লতায়,
মুহুমুহু ডাকে কুহু
তন্দ্রা-অলস, দ্বার খোল্॥

রাঙা ফুলে ফুল্ল-আনন
দোলে কানন-সুন্দরী,
বসন্ত তার এসেছে আজ
বরষ পরে পথ-বিভোল্॥

১০

মালবশ্রী মিশ্র—কার্ফা

আমার নয়নে নয়ন রাখি
পান করিতে চাও কোন অমিয়।
আছে এ আঁখিতে উষ্ণ আঁখিজল
মধুর সুধা নাই পরান-প্রিয়॥

ওগো ও শিল্পী, গলাইয়া মোরে
গড়িতে চাহ কোন মানস-প্রতিমারে,
ওগো ও পূজারী, কেন এ আরতি
জাগাতে পাষাণ-প্রণয়-দেবতারে।
এ দেহ-ভৃঙ্গারে থাকে যদি মদ
ওগো প্রেমাস্পদ, পিও গো পিও॥

আমারে করো গুণী, তোমার বীণা,
কাঁদিব সুরে সুরে কণ্ঠ-লীনা,
আমার মুখের মুকুরে কবি
হেরিতে চাই কোন মানসীর ছবি।
চাহ যদি—মোরে করো গো চন্দন
তপ্ত তনু তব শীতল করিও॥

১১

পিলু মিশ্র—লাউনি

নিরালা কানন-পথে কে তুমি চলো একেলা।
দুধারে চরণ-পাতে ফুটায়ে ফুলের মেলা॥

তোমার ঐ কেশের সুবাস ফুলবন করিছে উদাস,
কুসুম ভুলিয়া মলয় ও-কেশে করিছে খেলা॥

লুটায়ে পড়ে ফুলদল পরিবে বলিয়া খোঁপায়,
চলিবে বলি পথতল ফুলেরা পরাগে রাঙায়,
ও-পায়ে আলতা হতে চায় রঙিন্ গোধূলি-বেলা॥

চলিয়া যেও না—বলি লতারা চরণে জড়ায়,
টানিছে কণ্টক-তরু, আঁচল ছাড়িতে না চায়,
আকাশে ইশারায় ডাকে দ্বিতীয়া চাঁদের ভেলা॥

১২

পাহাড়ি—দাদরা

এল ফুলের মরশুম
শারাব ঢালো সাকি।
বকুল-শাখে কোকিল ওঠে ডাকি॥

গেয়ে ওঠে বুলবুল্ আঙুর-বাগে,
নীল আঁখি লাল হলো রাঙা অনুরাগে,
আজি ফুল-বাসরে শিরাজির জলসা
বরবাদ হবে না কি॥

চাঁপার গেলাস ভরি ভোমরা মধু পিয়ে,
মহুয়া ফুলের বাসে আঁখি আসে ঝিমিয়ে।

পাপিয়া পিয়া পিয়া ডাকে বন-মাঝে,
গোলাপ-কপোল রাঙে গোলাপি লাজে,
হৃদয়-ব্যথার দারু আছে তব কাছে—
রেখো না তাহা ঢাকি॥

১৩

ভীমপলশ্রী—কার্ফা

প্রিয় তব গলে দোলে যে হার কুড়িয়ে পাওয়া,
ও যে হার নহে, হৃদয় মোর হারিয়ে যাওয়া॥

তোমারি মতন যেন কাহার সনে
সেদিন পথে চোখাচোখি হলো গোপনে,
মন চকিতে হরিল যে সেই চকিত চাওয়া॥

ছিল চৈতালি সাঁঝ, তাহে পথ নিরালা,
ছিনু একেলা আমি, চলে একেলা বালা,
বহে ঝিরিঝিরি ধীরি ধীরি চৈতি-হাওয়া ॥

চাহিল সে মুখে মোর ঘোমটা তুলে,
তার নয়নে ও ঘটে জল উঠিল দুলে,—
আমি চেয়ে দেখি মোরও আঁখি সলিল-ছাওয়া ॥

১৪

বাগেশ্রী মিশ্র—কার্ফা

ছলছল নয়নে মোর পানে চেয়ো না।
যাবে যাও, নয়নে জল নিয়ে যেয়ো না ॥

থাকে ব্যথা থাক বুকে,
যাও তুমি হাসি মুখে,
আমার চাঁদিনী-রাতি ঘন মেঘ ছেয়ো না ॥

রঙিন পিয়ালাতে মম লোনা অশ্রু-জল ঢালি
পানসে করো না নেশা, জীবন ভরা ব্যথা খালি।
ভুলিতে চাহি যে ব্যথা
মনে এনো না সে কথা,
করুণ সুরে আর বিদায়-গীতি গেয়ো না ॥

১৫

ভৈরব—সেতারখানি

আনো সাকি শিরাজি আনো আঁখি-পিয়ালায়।
অধীর করো মোরে নয়ন-মদিরায় ॥

পান্‌সে জোছনাতে-ঝিম হয়ে আসে মন,
শারাব বিনে হেরো গুলবন উচাটন,
মদালস আঁখি কেন ঘোম্‌টা ঢাকা এমন
বিষাদিত নিরালায় ॥

তরুণ চোখে আনো অরুণ রাগ-ছোঁওয়া,
আঁখির করুণা তব যাচে ভোরের হাওয়া।

জীবন ভরা কাঁটার জ্বালা
ভুলিতে চাহি শারাব-পিয়ালা
তোমার হাতে ঢালা।
দুলাইয়া দাও মোরে আনন্দের হিন্দোলায়
ভুলাইয়া বেদনায়॥

১৬

পিলুমিশ্র—দাদরা

হেনে গেল তীর তিরছ তার চাহনি।
বিঁধিল মরম-মূলে চাহিল যেমনি॥

হৃদয়-বনের নিষাদ নিঠুর,
তনু তার ফুলবন, আঁখি তাহে ফণি॥

শেয়র্ :— এল যবে স্বপন-পরি উড়ায়ে আঁচল সোনালি,
ধেয়ান-লোক হতে গো যেন রূপ ধরে এল রূপওয়ালি।

দেহে তার চাঁদিনী-চন্দন মাখা, হায় চাহিল সে যেই
তার চোখের চোখা তীর খেয়ে গেয়ে উঠিল হৃদি এই—
হেনে গেল তীর হেনে গেল তীর,
তিরছ তার চাহনি॥

১৭

পিলুমিশ্র—কার্ফা

শেয়র্ :— গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়,
এনেছি তুলে রাঙা গুল পরাতে তোমার খোঁপায়।
কি হবে শুনে সে খবর গোলাব কাঁদিল কি না;
হৃদয় ছিঁড়েছি যাহার, বুঝিবে না গো সে বিনা।

ভুল ভাঙায়ো না আর সাকি, ঢালো শারাব-পিয়ালা।
মতলব কহিব পিছে, নেশা ধরুক চোখে বালা॥

জানি আমি জানে বুলবুল
কেন দলিয়া চলি ফুল,
ভালোবাসি আমি যারে, তারে ততই হানি জ্বালা॥

হাসির যে ফূর্তি ওড়ায় তার চোখের জলের দেনা
হিসাব করিয়া কে দেখে, হায় তুমি বুঝিবে না।
বুকের ক্ষত তাই লুকাই পরি রাঙা ফুলের মালা॥

তিক্ত নহে এ শারাব বিফল মোর জীবনের চেয়ে,
শোনায়ো না নীতি-কথা, শোনাও খুশির গজল গেয়ে,
প্রভাতে টুটিবে নেশা, আসে বিদায়ের পালা॥

১৮

ধানী—হোরি

আজি দোল-ফাগুনের দোল লেগেছে
আমের বোলে দোলন-চাঁপায়।
মৌমাছিরা পলাশ ফুলের
গেলাস ভরে মউ পিয়ে যায়॥

শ্যামল তরুর কোলে কোলে
আবির-রাঙা কুসুম দোলে,
দোয়েল শ্যামা লহর তোলে
কৃষ্ণচূড়ার ফুলেল্ শাখায়॥

বন-গোপিনী ফুল ছুঁড়ে ঐ খেলে হোরি দখিন বায়ে,
হলদে পাখি দোদুল দুলে সোনাল্ শাখায় আদুল গায়ে।

ভাঁট-ফুলের ঐ নাট-দেউলে,
রঙিন প্রজাপতি দুলে,
মন ছুটে যায় দূর গোকুলে
বৃন্দাবনে প্রেম-যমুনায়॥

১৯

পিলুখাম্বাজ—কার্ফা

হৃদয় কেন চাহে হৃদয়
আমি জানি মন জানে।
জানে নদী কেন যে সে
ছুটে যায় সাগর পানে॥

কেন মেঘ বারি চাহে
জানে চাতক জানে মেঘ,
জানে চকোর দূর গগনের
চাঁদ কেন তারে টানে॥

কুসুম কেন চাহে শিশির
জানে শিশির জানে ফুল,
জানে বুলবুল আছে কাঁটা
তবু যায় গুল-বাগানে॥

নয়ন চাহে নয়ন-বারি
মন চাহে মনোব্যথা,
প্রাণ আছে যার সেই জানে
কেন চায় প্রাণে প্রাণে॥

২০

পিলু—কার্ফা

আজ শেফালির গায়ে হলুদ
উলু দেয় পিক পাপিয়া।
প্রথম প্রণয়-ভীরু বালা
লাজে ওঠে কাঁপিয়া॥

বনভূমি বাসর সাজায়
ফুলে পাতায় লালে নীলে,
ঝরে শিশির আশিস্-বারি
গগন-ঝারি ছাপিয়া॥

বৃষ্টি-ধোওয়া সবুজ পাতার
শাড়ি করে ঝলমল,
ননদিনী 'বৌ কথা কও'
ডাকে আড়াল থাকিয়া ॥

দেখতে এল দিগ্‌বালিকা
শাদা মেঘের রথে ঐ,
শরৎ-শশীর মঙ্গল-দীপ
জ্বলে গগন ব্যাপিয়া ॥

অতীত প্রণয়-স্মৃতি স্মরি
কেঁদে যায় আশিন হাওয়া,
উড়ে বেড়ায় বর সে ভ্রমর
কমল-পরাগ মাখিয়া ॥

২১

কাফিমিশ্র—কার্ফা

শূন্য আজি গুল্-বাগিচা
যায় কেঁদে দখিন হাওয়া।
রাঙা গুলের বাজার আজি
স্মৃতির কাঁটায় ছাওয়া ॥

ধূলি-ঢাকা ফুল-সমাধি
আজি সে গুলিস্তানে
ছিল যথায় জলসা খুশির
বুলবুলির গজল গাওয়া ॥

শুকনো পাতায় ছেয়েছে আজ
সাকির চরণ-রেখা,
নাহি সেথায় বঁধূর লাগি
বধুর আসা যাওয়া ॥

নাহি মিঠা পানির নহর
পড়ে আছে বালুচর,
এ যেন গো হৃদয়ের
ভরা-ডুবির পথ বাওয়া ॥

২২

সিন্ধু—কার্ফা

সই ভালো করে বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দে।
মোর বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুনি-ফাঁদে ॥

সই চপল পুরুষ সে, তাই কুরুশ-কাঁটায়
রাখিব খোঁপার সাথে বিঁধিয়া লো তায়,
তাহে রেশমি জাল বিছায়ে দে ধরিতে চাঁদে ॥

বাঁধিতে সে বাঁধন-হারা বনের হরিণ,
জড়ায়ে দে জরিন ফিতা মোহন ছাঁদে ॥

প্রথম প্রণয়-রাগের মতো আলতা রঙে
রাঙায়ে দে চরণ মোর এমনি ঢঙে,
পায়ে ধরে বঁধু যেন আমারে সাধে ॥

২৩

পাহাড়ি মিশ্র—দাদরা

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা সজনী ধীরে ধীরে চল।
ধীরে ধীরে ধীরে চল।
চলিতে ছলকি যায় ঘটে জল ছলছল ॥

একে পথ আঁকাবাঁকা,
তাহে কণ্টক-শাখা
আঁচল ধরে টানে, টলে তনু টলমল ॥

ভরা যৌবন-তরী,
তাহে ভরা গাগরি,
বুঝি হয় ভরা-ডুবি, ছি ছি আমার এ কি হলো॥

পথের পাশে ও কে
হাসে ডাগর চোখে,
হাসিবে পথের লোকে সখি সরে যেতে বলো॥

২৪

মাড়—কার্ফা

ঢলঢল তব নয়ন-কমল
কাজল তোমারেই সাজে।
শোভে তোমারই চাঁদের হাসি
হিঙুল অধর-মাঝে॥

ফিরোজা-রঙ শাড়ি চাঁপা রঙে তব
সেজেছে প্রিয়া কি অভিনব,
সুনীল গগনে গোধূলি রঙ যেন
মিশেছে আসিয়া উষা ও সাঁঝে॥

কোমলে কড়িতে বাজে কাঁকন চুড়ি,
শিথিল আঁচল লয়ে খেলে হাওয়া লুকোচুরি,
উষ্ণ কপোল ছুঁয়ে থল-কমলি
আঁউরে গেল যে লাজে॥

২৫

পিলু-মিশ্র—কার্ফা

শেয়র্ :— তোমার আঁখির কসম সাকি
চাহি না মদ আঙুর পেষা।
তোমার ও-নয়নে চাহি
ধরে গো শারাবের নেশা॥

তব মদালস ঐ আঁখি
সাকি দিল দোলা প্রাণে।
বাদল-হাওয়া এ গুলবাগে
বুলবুল কাঁদে গজল গানে॥

গোলাব ফুলের নেশা
ছিল মোর ফুলেল ফাগুনে,
শুকায়ে গেছে ফুলবন
নাহি গোলাব গুলিস্তানে॥

শুনি সাকি তোমার কাছে
ব্যথা ভোলার দারু আছে,
হিয়া কোন অমিয়া যাচে
জানো তুমি, খোদা জানে॥

দুখের পসরা লয়ে
কি হবে কাঁদিয়া বৃথা,
নসিব গিয়াছে যখন,
যাক ঈমান শারাব পানে॥

২৬

পাহাড়ি মিশ্র—রূপক

বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ
ফুটল কি বকুল।
অবেলায় কুঞ্জবীথি মুঞ্জরিতে
এলে কি বুলবুল॥

এলে কি পথ ভুলে মোর আঁধার রাতে
ঘুম-ভাঙানো চাঁদ,
অপরাধ ভুলেছ কি, ভেঙেছ কি
অভিমানের বাঁধ।

প্রদীপ নিভে আসে ইহারি ক্ষীণ আলোকে,
দেখে নিই শেষ দেখা যত সাধ আছে চোখে,
মরণ আজ মধুর হলো পেয়ে তব চরণ রাতুল॥

হে চির-সুন্দর মোর বিদায়-সন্ধ্যা মম
রাঙালে রাঙা রঙে উদয়-উষার সম,
ঝরে পড়ুক তব পায়ে আমার এ জীবন-মুকুল॥

২৭

গৌড়সারং—দাদ্‌রা

ভুলিতে পারিনে তাই আসিয়াছি পথ ভুলি।
ভোলো মোর সে অপরাধ, আজ যে লগ্ন গোধূলি॥

এমনি রঙিন বেলায়
খেলেছি তোমায় আমায়
খুঁজিতে এসেছি তাই
সেই হারানো দিনগুলি॥

তুমি যে গেছ ভুলে ছিল না আমার মনে,
তাই আসিয়াছি তব বেড়া-দেওয়া ফুলবনে।
গেঁথেছি কতই মালা এই বাগানের ফুল তুলি,
আজো হেথা গাহে গান আমার পোষা বুলবুলি॥

চাহ মোর মুখে প্রিয়, এসো গো আরো কাছে,
হয়তো সেদিনের স্মৃতি তব নয়নে আছে,
হয়তো সেদিনের মতোই প্রাণ উঠিবে আকুলি॥

২৮

সিন্ধুমিশ্র—কাহারবা

যে ব্যথায় এ অন্তর-তল নিশিদিন
উঠিছে দুলে।

তারি ঢেউ এ সংগীতে মোর মুরছায়
সুরের কূলে॥

ভালোবাস তোমরা যারে
দুদিনে ভোলো গো তারে,
শরতের সজল কালো মেঘ
কেঁদে—যাও নিমেষে ভুলে॥

কঠিন পুরুষের মন
গলিয়া বহে গো যখন,
বহে সে নদীর মতন
চিরদিন পাষাণ-মূলে॥

আলোর লাগি জাগে ফুল,
নদী ধায় সাগরে যেমন,
চকোর চায় চাঁদ, চাতক মেঘ,
যারে চায় তারেই চায় এ মন।
নিয়ে যায় সুদূর অমরায়
পূজে তায় বাণী-দেউলে॥

২৯

মাঢ়—রূপক

সখি লো তায় আন ডেকে
যে গান গেয়ে যায় পথ দিয়ে।
সই দিব তারে কণ্ঠহার তার কণ্ঠেরি ঐ সুর নিয়ে॥

কারুর পানে নাহি চায়
সে আপন মনে গেয়ে যায়,
হিয়া কাঁপে সুরের নেশায়,
নয়ন আসে মোর ঝিমিয়ে॥

সখি লো শুধিয়ে আয়
সে শিখিল এ গান কোথায়,

এত মধুর তার গলায়
কাহার অধর-সুধা পিয়ে॥

যার গানে এত প্রাণ মাতায়
না জানি কি হয় দেখলে তায়,
তার সুর শুনে কেউ প্রাণ পায়
কেউ ফেলে লো প্রাণ হারিয়ে॥

৩০

বাগেশ্রী—লাউনি

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে
কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি।
তুমি কেন হায় আসিলে হেথায়
সুখের স্বরগ হইতে নামি॥

চারিপাশে মোর উড়িছে কেবল
শুকানো পাতা মলিন ফুলদল,
বৃথাই সেথা হায় তব আঁখি-জল
ছিটাও অবিরল দিবস-যামী॥

এলে অবেলায় পথিক বেভুল
বিঁধিছে কাঁটা নাহি যবে ফুল,
কি দিয়া বরণ করি ও-চরণ
নিভিছে জীবন, জীবন-স্বামী॥

৩১

ভৈরবী—কার্ফা

ডেকে ডেকে কেন সখি ভাঙালি ঘুমের ঘোর।
স্বপনে মোর এসেছিল স্বপন-কুমার মনোচোর॥

সে যেন লো পাশে বসে কহিল হেসে হেসে,
যাব না আর পরদেশে, মোছো মোছো আঁখি-লোর॥

দেখাল তার হৃদয় খুলি, কহিল, হেরো প্রিয়ে
তোমার অধিক ব্যথা হেথায় তোমারে ব্যথা দিয়ে।

হেরিনু—মোর হিয়ার চেয়ে অধিক ক্ষত তার হৃদয়,
সে হৃদয়ে আমার ছবি সকল হিয়া আমি-ময়।
তাহার জীবন-মালার মাঝে আমি যেন সোনার ডোর॥

কহিনু—বুঝেছি সখা তোমার দুখ দেওয়ার ছল,
ভালোবাসার ফুল না শুকায়, তাই চাহ মোর চোখের জল।

কাছে পেয়ে ভুলি যদি করি যদি অনাদর,
তাই গেছিলে পর-বাসে, চির-আপন হয় কি পর।
জেগে দেখি কেঁদে কেঁদে ভিজেছে বুকের আঁচোর॥

৩২

পিলু-ভৈরবী—কার্ফা

ঐ ঘর-ভুলানো সুরে
কে গান গেয়ে যায় দূরে।
তার সুরের সাথে সাথে
মোর মন যেতে চায় উড়ে॥

তার সহজ গলার তানে
সে ফুল ফুটাতে জানে,
তার সুরে ভাটির টানে
নব জোয়ার আসে ঘুরে॥

তার সুরের অনুরাগে
বুকে প্রণয়-বেদন জাগে,
বনে ফুলের আগুন লাগে,
ফুল সুধায় ওঠে পুরে॥

বুঝি সুর-সোহাগে ওরি
পায় যৌবন কিশোরী,
হিয়া বুঁদ হয়ে গো নেশায়
তার পায়ে পায়ে ঘুরে॥

৩৩

বেহাগ-মিশ্র—দাদ্‌রা

আকুল হলি কেন বকুল বনের পাখি।
দেখেছিস্ তুইও নাকি প্রিয়ার ডাগর আঁখি॥
মধু ও বিষ মেশা
সেই সে আঁখির নেশা
তোরে করেছে পাগল, তাই কি এত ডাকাডাকি॥

চোখে পড়িলে বালি জ্বালাতে জ্বলিয়া মরি,
চোখে যাহার পড়েছে চোখ সে বাঁচে কেমন করি।
ফিরাই আঁখি যেদিক পানে
তারি আঁখি মনে আনে,
বলিস পাখি দেখা হলে প্রাণ শুধু আছে বাকি॥

৩৪

বেহাগ—কাওয়ালি

আনমনে জল নিতে ভাসিল গাগরি।
সাঁতার জানি না, আনি কলস্ কেমন করি॥

জানি না, বলিব কি, শুধাবে যবে ননদী
কাহার কথা ভাবে পোড়া মন নিরবধি,
গাগরি না ভাসিয়া ভাসিতাম আমি যদি—
কি বলিব কেন মোর ভিজিল গো ঘাগরী॥

একেলা কুলবধূ, পথ বিজন, নদীর বাঁকে
ডাকিল বৌ-কথা-কও কেন হলুদ-চাঁপার শাখে,
বিদেশে শ্যাম আমার পড়ল মনে সেই সে ডাকে,
ঠাঁই দে যমুনে, বুকে, আমি ডুবিয়া মরি॥

৩৫

ধানী—হোরি

আয় গোপিনী খেলবি হোরি
ফাগের রাঙা পিচকারিতে।
আজ শ্যামে লো করব ঘায়েল
আবির হাসির টিটকারিতে॥

রঙে রাঙা হয়ে শ্যাম আজ
হবে যেন রাই কিশোরী,
যমুনা-জল লাল হবে আজ
আবির ফাগের রঙে ভরি।
কপালের কলঙ্ক মোদের
ধুয়ে যাবে রঙ ঝারিতে॥

গুরুজনের গঞ্জনা আজ
সইব না লো মানব না লাজ,
কূল ভুলে গোকুল পানে
ভেসে যাব রাঙা গীতে॥

৩৬

সারঙমিশ্র—কার্ফা

চাঁপা রঙের শাড়ি আমার
যমুনা-নীর ভরণে গেল ভিজে।
ভয়ে মরি আমি, ঘরে ননদী,
কহিব শুধাইলে কি যে॥

ছি ছি হরি একি খেলো লুকোচুরি,
একলা পথে পেয়ে করো খুনসুড়ি,
রোধিতে তব কর ভাঙিল চুড়ি,
ছলকি গেল কলসি যে॥

ডাঁশা কদম্ব দিবে বলি হরি,
ডাকিল তরু-তলে কেন ছল করি,
কাঁচা বয়সী পাইয়া কিশোরী
মজাইলে, মজিলে নিজে॥

৩৭

পিলু—হোরি

শ্যামের সাথে
চল সখি খেলি সবে হোরি।
রঙ নে রঙ দে মদির আনন্দে
আয় লো বৃন্দাবনী গোরী।
আয় চপল যৌবন-মদে মাতি
অল্প-বয়সী কিশোরী॥

রঙ্গিলা গালে তাম্বুল-রাঙা ঠোঁটে
হিঙ্গুল রঙ লহ্ ভরি;
ভুরু-ভঙ্গিমা সাথে রঙ্গিম হাসি
পড়ুক মুহুমুহু ঝরি॥

৩৮

কাফি—হোরি

আজকে দোলের হিন্দোলায়
আয় তোরা কে দিবি দোল।
ডাক দিয়ে যায় দ্বারে ঐ
হেনার কুঁড়ি আমের বৌল॥

আগুন-রাঙা ফুলে ফাগুন লালে-লাল,
কৃষ্ণ-চূড়ার পাশে রঙন অশোক গালে-গাল,
লোল হয়ে পড়িল ঐ রাতের জোছনা-আঁচল॥

হতাশ পথিক পথ-বিভোল,
ভোল আজি বেদনা ভোল্,

ঢোল খেয়ে যাক নীল আকাশ
　　　শুনে তোদের হাসির রোল,
দ্বার খুলে দেখ—ফুলেল রাত
　　　ফুলে ফুলে ডামাডোল॥

৩৯

সিন্ধু-ভৈরবী—কার্ফা

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে
　　　আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
সয়েছি বুকে নিবিড় সুখে
　　　তোমার হাতের সূচির জ্বালা॥

আজিও জাগে লোহিত রাগে
　　　রঙন গোলাবে তাহারি ব্যথা,
তব ও-গলে দুলিব বলে
　　　দিয়াছি কুলে কলঙ্ক কালা॥

যদি ও-গলে নেবে না তুলে
　　　কেন বধিলে ফুলের পরান,
অভিমানে হায় মালা যে শুকায়
　　　ঝরে ঝরে যায় লাজে নিরালা॥

৪০

জৌনপুরী—দাদ্‌রা

একেলা গোরী জলকে চলে গঙ্গাতীর।
অঙ্গে ঢুলিয়া পড়ে লালসে অলস সমীর॥

　　কাঁকনে কলসে বাজে
　　কত কথা পথ মাঝে,
　　　　আঁচল চুমিছে শিশির॥

তটিনীতে চলে কি গো
সোনার বরণ মায়া-মৃগ,
নয়নে আবেশ মদির।
রাঙা উষার রাঙা সতিন,
পথ-ভোলা ছন্দ কবির॥

৪১

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

পিয়া গেছে কবে পরদেশ
পিউ কাহাঁ ডাকে পাপিয়া।
দোয়েল শ্যামার শিসে তারি
হুতাশ উঠিছে ছাপিয়া॥

পাতার আড়ালে মুখ ঢাকি
মুহু মুহু কুহু ওঠে ডাকি,
বাজে ধ্বনি তারি উহু উহু
বিরহী পরান ব্যাপিয়া॥

'বৌ কথা কও' পাখি ডাকে,
কেন মনে পড়ে যায় তাকে,
কথা কও বউ ডাকিত সে
নিশীথ উঠিত কাঁপিয়া॥

৪২

আশাবরী—আদ্ধা কাওয়ালি

সখি ঐ শোনো বাঁশি বাজে।
মন লাগে না গৃহ-কাজে॥

কত সুরে কত ছলে
বাঁশিতে সে কথা বলে,
মোর মন প্রাণ ছুটে চলে
যথা বাঁশি বাজে বন মাঝে॥

এপারে ঘরে ননদী,
ওপারে যমুনা নদী,
কেঁদে মরি নিরবধি
যাইতে পারি না লাজে॥

সখি কেন সে বাঁশিতে সাধে
নিশিদিন রাধে রাধে,
প্রাণ গুমরি গুমরি কাঁদে
হৃদে এনে দে রাখাল-রাজে॥

৪৩

সাহানা—একতালা

বিরহের নিশি কিছুতে আর
চাহে না পোহাতে ওগো প্রিয়।
জাগরণে দেখা দিলে না নাথ
স্বপনে আসিয়া দেখা দিও॥

হেরিব কবে সে মোহন রূপ,
শুকায়েছে মালা, পুড়েছে ধূপ,
নিভে যদি যায় জীবন-দীপ
তুমি এসে নাথ নিভাইও॥

তব আশা-পথ চাহি বৃথায়
দিবস মাস বরষ যায়,
এ জনমে যদি ভুলিলে হায়
পরজনমে না ভুলিও॥

৪৪

আশা—কার্ফা

ঢের কেঁদেছি ঢের সেধেছি,
আর পারিনে; যেতে দে তায়।

গলল না যে চোখের জলে
গলবে কি সে মুখের কথায়॥

যে চলে যায় হৃদয় দলে
নাই কিছু তার হৃদয় বলে,
তারে মিছে অভিমানের ছলে
ডাকতে আরো বাজে ব্যথায়॥

বঁধুর চলে যাওয়ার পরে
কাঁদব লো তার পথে পড়ে,
তার চরণ-রেখা বুকে ধরে
শেষ করিব জীবন সেথায়॥

৪৫

পাহাড়ি-মাঢ়—কার্ফা

সে চলে গেছে বলে কি গো
স্মৃতিও তার যায় ভোলা। (হায়)
মনে হলে তার কথা
আজো মর্মে যে মোর দেয় দোলা॥

ঐ প্রতিটি ধূলি-কণায়
আছে তার ছোঁওয়া লেগে হেথায়,
আজো তাহারি আসার আশায়
রাখি মোর ঘরের সব দ্বার খোলা॥

হেথা সে এসেছিল যবে
ঘর ভরেছিল ফুল-উৎসবে,
মোর কাজ ছিল শুধু ভবে
তার হার গাঁথা আর ফুল তোলা।

সে নাই বলে বেশি করে
শুধু তার কথাই মনে পড়ে,
হেরি তার ছবি ভুবন ভরে
তারে ভুলিতে মিছে বলা॥

৪৬

পিলুমিশ্র—কার্ফা

এ জনমে মোদের মিলন
হবে না আর, জানি জানি।
মাঝে সাগর, এপার ওপার
করি মোরা কানাকানি॥

দুজনে দুকূলে থাকি
কাঁদি মোরা চখা-চখি,
বিরহের রাত পোহায় না আর
বুকে শুকায় বুকের বাণী॥

মোদের পূজা আরতি হায়
চোখের জলে, গহন ব্যথায়,
মোদের বুকে বাঁশী বাজায়
বেদনারি বীণাপাণি॥

হেথায় মিলন-রাতের মালা ম্লান হয়ে যায় প্রভাতবেলা,
সকালে যার তরে কাঁদি, বিকালে তায় হেলাফেলা।
মোদের এ প্রেম-ফুল না শুকায়
নিঠুর হাতের কঠোর ছোঁওয়ায়,
ব্যথার মাঝে চির-অমর মোদের মিলন-কুসুমদানী॥

৪৭

মাঢ়—পাঞ্জাবি ঠেকা

হায় স্মরণে আসে গো অতীত কথা।
নয়নে জল ভরে তাই হৃদয় করে ব্যথা।
মুখ তার রহি রহি পড়ে মোর মনে॥

তার স্মৃতি ভুলিতে চাহি যতই
সখি মনে পড়ে তারে ততই,
সে কাঁদায় সখি মোরে ঘুমে জাগরণে॥

তার সাথে গেছে প্রাণ, দেহ আছে পড়ে,
বাঁচার অধিক আমি সখি গো আছি মরে॥

নাহি ফুল, আছে কাঁটার স্মৃতি,
নাহি আর সে চাঁদিনী তিথি,
নাহি আর সুখ শান্তি সখি এ জীবনে॥

৪৮

ভাটিয়ালি—কার্ফা

নদী এই মিনতি তোমার কাছে।
ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমারে যে দেশে মোর বন্ধু আছে॥

নদী তোমার জলের পথ ধরে সে চলে গেল একা,
আমি সেই হতে তার পথ চেয়ে রই, পেলাম না আর দেখা,
ধুলার এ পথ নয় যে বন্ধু থাক্‌বে চরণ-রেখা।
আমি মীন হয়ে রহিব জলে, ছুটব ঢেউ-এর পাছে।

আমি ডুবে যদি মরি, তোমার নয় সে অপরাধ,
কূলে থেকে পাইনে খুঁজে, তাই জেগেছে সাধ
আমি দেখব ডুবে তোমার জলে আছি কি মোর চাঁদ,
বড় জ্বালা বুকে রে নদী টেনে লহ কাছে।
নদী, অভাগা এই যাচে॥

৪৯

ভাটিয়ালি—কার্ফা

ও কূল-ভাঙা নদী রে
আমার চোখের জল এনেছি মিশাতে তোর নীরে॥

যে লোনাজলের সিন্ধুতে নদী নিতি তব আনাগোনা,
মোর চোখের জল লাগবে না ভাই তার চেয়ে বেশি লোনা,
আমায় কাঁদতে দেখে আসবিনে তুই উজান বেয়ে ফিরে॥

আমার মন বোঝে না নদী,
তাই বারেবারে আসি ফিরে তোর কাছে নিরবধি।
তোর অতল তলে ডুবিতে চাই, তুই ঠেলে দিস তীরে॥

তোর জোয়ারে সাগর ঠেলে ফেলে দেয়, তবু ভাটির স্রোতে
তুই ফিরে ফিরে যাস রে নদী সেই সাগরের পথে,
নদী তেমনি অবুঝ আমারো মন তোরই পিছে ফিরে॥

৫০

ভাটিয়ালি—কার্ফা

কুঁচ-বরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ।
আমায় লয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ॥

পরনে তার মেঘ-ডম্বরু উদয়-তারার শাড়ি,
রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুযে করে কাড়াকাড়ি,
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই,
আমার চির-পথিক বেশ॥

পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে,
সন্ধ্যা সকাল আসে তারি আলতা হতে পায়ে।

সে রয় না ঘরে, ঘুরে বেড়ায় ময়নামতীর চরে,
তারে দেখলে মরা বেঁচে ওঠে, জ্যান্ত মানুষ মরে,
তোর জল-তরঙ্গ বাজে রে তার সোনার চুড়ির রেশ॥

৫১

জৌনপুরী মিশ্র—দাদ্‌রা

এসো মা ভারত-জননী আবার
জগৎ-তারিণী সাজে।
রাজরানি মার ভিখারিনী বেশ
দেখে প্রাণে বড় বাজে॥

শিশু-জগতেরে মায়ের মতন
তুমি মা প্রথম করিলে পালন,
আজ মা তোরি সন্তানগণ
কাঁদিছে দৈন্য লাজে॥

আঁধার বিশ্বে তুমি কল্যাণী
জ্বালিলে প্রথম জ্ঞান-দীপ আনি,
হইলে বিশ্ব-নন্দিতা রানি
নিখিল নর-সমাজে॥

দেখা মা পুন সে অতীত মহিমা,
মুছে দে ভীরুতা গ্লানির কালিমা,
রাঙায়ে আবার দশদিক-সীমা
দাঁড়া মা বিশ্ব-মাঝে॥

৫২

গৌরসারং—একতালা

দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ
ভারত-লক্ষ্মী আয় মা আয়।
কবে সে ডুবিলি অতল পাথারে
উঠিলি না আর হায় মা হায়॥

মন্থনে শুধু উঠে হলাহল,
শিব নাই, পান করে কে গরল,
অমৃত-ভাণ্ড লয়ে আয় মা গো
জ্বলিয়া মরি বিষের জ্বালায়॥

হরিৎ-ক্ষেত্রে সোনার শস্যে
দুলে নাকো আর তোর আঁচল,
শুকায়েছে মা গো মায়ের স্তন্য
গভীর দুগ্ধ নদীর জল॥

চাহি না মোক্ষ, চাই মা বাঁচিতে
অক্ষয় আয়ু লয়ে ধরণীতে,
চাই প্রাণ, চাই ক্ষুধায় অন্ন
মুক্ত আলোকে মুক্ত বায়॥

৫৩

খাম্বাজ মিশ্র—কার্ফা

বাজায়ে কাঁচের চুড়ি
পরানে দোল দিয়ে কে যায়।
কাঁকনে চুড়িতে বাজে সুর মধুর আওয়াজ,
নাচনের লাগল ছোঁয়াচ এ তনুর কাচ-মহলায়॥

আঁচলে বাঁধা তার কোন বীণ,
রিনিঝিন বাজে চাবির রিং,
কারে রাখি কারে শুনি,
চলে যায় সে যে চপল পায়॥

চরণ-কমল ধরি নূপুর মিনতি-করে,
ভ্রমর সম গুঞ্জরি চরণ ঘেরি গুঞ্জরে।

কারে দেখি কারে শুনি—
চলনের দোলন-গতি, না তাহার নূপুর-ধ্বনি,
হিয়া মোর পথে তার লুটায়
চরণ-পরশ আশায়॥

৫৪

ভৈরবী—কার্ফা

মন কার কথা ভেবে এমন উদাস করে।
দেখেছি ভোর-বেলাতে স্বপ্নে কারে
জেগে তায় মনে নাহি পড়ে।

কবে সে ভোর-বেলাতে
গেছিলাম ফুল কুড়াতে,
পথে কার নয়ন-ফণী দংশিল বুকের 'পরে!
আজি কি সেই চাহনির বিষের জ্বালা
উঠিল ব্যথায় ভরে॥

মনে করিতে তারে শিহরি উঠি ভয়ে,
ভুলিতে গেলে আরো ব্যথা বাজে হৃদয়ে,
এমনি করে কি গো বন-মৃগ
মরুতে ছুটে মরে॥

৫৫

কীর্তন

আমি কেন হেরিলাম নবঘনশ্যাম
কালারে কালো কালিন্দী-কূলে।
সে যে বাঁশরির তানে সকরুণ গানে
ডাকিল প্রেম-কদম্ব-মূলে।
তার সাগর-অতল ডাগর আঁখির কূলে
সে কি ঢেউ উঠিল দুলে॥

সখি সে কি সকরুণ আঁখি লো
ভয় অনুরাগ-মাখামাখি লো,
তার অশ্রু-সজল আঁখি ছলছল
দূর মেঘপানে ডাকিল॥

কেন কলস ভরিতে গেনু যমুনা-তীরে,
মোর কলসির সাথে গেল ভাসি লাজ-কূল-মান আকুল নীরে।
কলসির জল মোর নয়নে ভরিয়া সই আসিনু ফিরে॥

সখি লো, তোদের সে রাই নাই,
তোদের গোকুলের রাই গোকুলে নাই,
এ-কূলে নাই ও-কূলে নাই।
গোকুলের রাই গোকুলে নাই।

সে যে হারাইয়া গেছে শ্যামের রূপে লো
নবীন নীরদে বিজলি-প্রায়।
সে রবি শশী সম ডুবিয়া গেছে লো
সুনীল রূপের গগন-গায়॥

হরি-চন্দন-পঙ্কে লো সখি
শীতল করে দে জ্বালা,
দুলায়ে দে গলে বল্লভ-রূপী
শ্যাম পল্লব-মালা !
নীল কমল আর অপরাজিতার
শেজ্ পেতে দে লো কোমল বিথার,
পেতে দে শয্যা পেতে দে,
নীল শয্যা পেতে দে পেতে দে !
মোর শ্যামের স্মৃতির নীল শিখী-পাখা,
চূড়া বেঁধে কেশে গেঁথে দে !
পরাইয়া দে লো সখি
অঙ্গে নীলাম্বরী,
জড়াইয়া কালো বরণ
আমি যেন মরি॥

৫৬

কীর্তন

না মিটিতে মনোসাধ
যেয়ো না হে শ্যামচাঁদ
আঁধার করিয়া ব্রজধাম।
সোনার বরণী রাই
অঙ্গে মাখিয়া ছাই
দিশা নাই, কাঁদে অবিরাম॥

রাই অবিরাম কাঁদে হে
তারে কাঁদায় যে তারি তরে
অবিরাম কাঁদে হে॥

তারে বুঝালে বুঝে না
ধৈরয নাহি বাঁধে হে।
তারে ত্যাজিয়া যাইবে শ্যাম
কোন অপরাধে হে॥

সে যে নয়ন মেলিতে হেরে তুমিময় সবি হে,
হেরে নয়ন মুদিলে শ্যাম তোমারি সে ছবি হে
রহি সুনীল গগন-তলে
ভুলিবে সে কোন ছলে
ও সুনীল রূপ অভিরাম।
রহি শ্যামল ধরার কোলে
ভুলিবে সে কোন্ ছলে
ও শ্যামল রূপ অভিরাম॥

সখা হে—
এখনো মাধবীলতা
কহেনি কুসুম-কথা
জড়াইয়া তরুর গলে,
এখনো ফোটেনি ভাষা,
আধ-ফোটা ভালোবাসা
ঢাকা লাজ-পল্লব-তলে।
বলা হলো না হলো না,
বুকের ভাষা মুখে বলা যে হলো না।
না শুনে তা রসময়
যেয়ো না হে অসময়
অভিমান থাকে যদি মনে,
রাই যে কথা মুখে না বলে
হেরো তা চোখের জলে
বিদায়ে হেরো গো, যাহা
পেলে না মিলনে॥

সখা আমরা নারী, বল্‌তে নারি!
আমরা মনের কথা বল্‌তে নারি।
চির-নয়ন-জলে গল্‌তে পারি
তবু খুলে বলতে নারি।

মোরা নিজেরে নিজেই ছলতে পারি
মুখে তবু বল্‌তে নারি।
মোরা মরণ-কোলে চল্‌তে পারি
মুখ ফুটে তবু বলতে নারি॥

নবীন নীরদ-বরণ শ্যাম
জানিতাম মোরা তখনি,
ঐ করুণ সজল কাজল মেঘে
থাকে গো ভীষণ অশনি।
তুমি আগুন জ্বালিলে,
ওহে নিরদয় ! বুকে কেন
আগুন জ্বালিলে।
বুকে আগুন জ্বালায়ে—চোখে
সলিল ঢালিলে !
তাহে আগুন নেভে কি ?
চোখের জলে বুকের আগুন নেভে কি॥

কাঁদিসনে যমুনা নদী শুকাইয়া শোকে,
বাঁচিয়া রহিবি লো তুই শ্রীরাধার চোখে।
সেথা বইবি উজান,
তুই রাধার চোখে বইবি উজান,
তার দুই নয়নের দুকূল ছেপে
বক্ষ ব্যেপে বইবি উজান !
শুনিবি দুকূলে রোদন
শ্যাম শ্যাম নাম॥

৫৭
কীর্তন

তুমি কোন পথে এলে হে মায়াবী কবি
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরি।
এল রাজ-সভা ছাড়ি ছুটি গুণিজন
তোমার সে সুরে পাশরি॥

তোমার চলার শ্যাম বনপথ
কদম-কেশর-কীর্ণ,
তুমি কেয়ার বনের খেয়া-ঘাটে হলে
গোপনে কি অবতীর্ণ?
তুমি অপরাজিতার সুনীল মাধুরী
দুচোখে আনিলে করিয়া কি চুরি?
তোমায় নাগ-কেশরের ফণি-ঘেরা মউ
পান করাল কে কিশোরী?

জনপুরী যবে কল-কোলাহলে
মগ্নোৎসব রাজসভাতলে,
তুমি একাকী বসিয়া দূর নদী-তটে
ছায়া-বটে বাঁশি বাজালে,
তুমি বসি নিরজনে ভাঁট ফুল দিয়া
বালিকা বাণীরে সাজালে॥

যবে রুদ্র আসিল ডম্বরু-করে
ত্রিশূল বিঁধিয়া নীল অম্বরে,
তুমি ফেলিয়া বাঁশরি আপনা পাশরি
এলে সে প্রলয়-নাটে গো,
তুমি প্রাণের রক্তে রাঙালে তোমার
জীবন-গোধূলি পাটে গো॥

হে চির-কিশোর, হে চির-তরুণ,
চির-শিশু চির-কোমল করুণ!
দাও অমিয়া আরো অমিয়া,
দাও উদয়-ঊষারে লজ্জা গো তুমি
গোধূলির রঙে রাঙিয়া!
প্রখর রবি-প্রদীপ্ত গগনে
তুমি রাঙা মেঘ খেলো আন্‌মনে,
উৎসব-শেষে দেউলাঙ্গনে
নিরালা বাজাও বাঁশরি,
আমি স্বপন-জড়িত ঘুমে সেই সুর
শুনিব সকল পাশরি॥

৫৮

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি

যে ব্যথায় এ অন্তর-তল হে প্রিয়
উঠিছে দুলে,
তারি ঢেউএ সংগীতে মোর মূরছায়
সুরের কূলে॥

ভালোবাসা তোমরা যারে
দুদিনে ভোলো গো তারে,
শরতের সজল কালো মেঘ কেঁদে যাও
নিমেষে ভুলে॥

আমার হৃদি যারে চায়
নিয়ে যায় তারে অমরায়,
পূজি তায়, হে সুন্দর মোর, নিশিদিন
বাণী দেউলে॥

কঠিন পুরুষের মন
গলিয়া বহে গো যখন
বহে সে নদীর মতন চিরদিন,
রহে না ভুলে॥

৫৯

ভৈরবী—কার্ফা

থাক সুন্দর ভুল আমার
ছলনা-মধুর তব মন।
ভুল করে তুমি 'ভালোবাসি' বলে
দিও গো ভুলের হরষণ॥

মরীচিকা থাক্, না থাকুক জল
ভোলাবে তৃষ্ণা সেই মায়া-ছল,
তাহারি আশায় আজো বাঁচি হায়,
মরুভূমে ধাই অনুখন॥

রাঙা রামধনু বৃষ্টির শেষে
জানি জানি প্রিয়, সত্য নহে সে,
নিমেষে উঠিয়া নিমেষে সে মেশে
তবু রেঙে ওঠে এ গগন॥

প্রভাত ভাবিয়া কাক-জ্যোৎস্নায়
জাগিয়া যেমন পাখি গান গায়
তেমনি পরান গেয়ে যাক গান
হোক সে অকাল-জাগরণ॥

৬০

ভৈরবী—দাদ্‌রা

এ কি সুরে তুমি গান শুনালে ভিন্‌দেশি পাখি।
এ যে সুর নহে, মদির সুরা, রে সুরের সাকি॥

বসি মোর জানালা পাশে
কেন বুক-ভাঙা নিরাশে,
যাও ঘুম ভাঙায়ে নিতি সকরুণ সুরে ডাকি।
তোর ও সুরে কাঁদ্‌ছে উষা অস্ত চাঁদের গলা ধরে,
ভোর-গগনের কপোল বেয়ে শিশির-অশ্রু গড়িয়ে পড়ে॥

আমি রইতে নারি ঘরে,
আমার প্রাণ কেমন করে,
আমার মন লাগে না কাজে, জলে ভরে আঁখি॥

৬১

পাহাড়ি মিশ্র—দাদ্‌রা

আজিকে তনু মনে লেগেছে রঙ লেগেছে রঙ।
বধূর বেশে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং॥

কাননে আলো-ছায়া,
নয়নে রঙের মায়া,
দুলে দোদুল্ কায়া পরানে বাজিছে সারং॥

সে রঙের সাগর-কোলে
কত চাঁদ রবি দোলে,
বাজে গগন-তলে জলদ-তালে মেঘ-মৃদং॥

৬২

ধানী—হোরি ঠেকা

আজি দোল-ফাগুনের দোল লেগেছে
আমের বৌলে দোলন-চাঁপায়।
মৌমাছিরা পলাশ ফুলের গেলাস ভরে মউ পিয়ে যায়।
শ্যামল পাতার কোলে কোলে
আবির-রাঙা কুসুম দোলে,
দোয়েল শ্যামা লহর তোলে
কৃষ্ণচূড়ার ফুলেল শাখায়॥

বন-গোপিনী ফুল ছুঁড়ে ঐ
খেলে হোরি দখিন-বায়ে,
হলদে পাখি দোদুল্ দুলে
সোনাল শাখায় আদুল গায়ে।

ভাঁট-ফুলের এ নাট-দেউলে
রঙিন প্রজাপতি দুলে,
মন ছুটে যায় দূর গোকুলে
বৃন্দাবনে প্রেম-যমুনায়॥

৬৩

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

কাহার তরে হায় নিশিদিন কাঁদে মন প্রাণ
জানে শুধু সেই, জানে আর হৃদি ব্যথা-ম্লান॥

কমল-পাতে যেন জল প্রণয় তার সই
বুলবুলি চপল ছলে যায় লতিকা-বিতান॥

জানে শুধু সে নিতে মন, দিতে জানে না,
দলিয়া চলে সে মুকুল, বারণ মানে না।
জীবন লয়ে খেলে সে মরণ-খেলা,
সকালে যারে চাহে তায় বিকালে হেলা।
কুসুম-সমাধি রচে সে নিঠুর পাষাণ॥

চাহি শুধু এই,—যেন সে বাসিয়া ভালো
এমনি ব্যথা পায় সে ওগো ভগবান॥

৬৪

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সামলে চলো পিছল পথ গোরী।
ভরা যৌবন তায় ভরা গাগরি॥

নীর ভরণে এসে সখি নদী-তীর
তীর খেয়ো না হৃদয়ে ডাগর আঁখির,
জলে ভাসিবে নয়ন কিশোরী॥

হৃদি নিঙাড়ি এ পথে প্রেমিক কত
সখি করেছে রুধির-পিছল এ পথ,
কেহ উঠিল না এ পথে পড়ি॥

তব ঘটের সলিল চাহিয়া সই
কত তৃষ্ণা-আতুর পথিক দাঁড়ায়ে ঐ,
মরু-ভূমে তুমি মেঘ-পরী॥

৬৫

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

আমার সোনার হিন্দুস্থান।
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ॥

ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারেবারে এল ভগবান॥

আদিম যুগের তুমি প্রথমা ধাত্রী,
তোমার আলোকে হলো প্রভাত রাত্রি,
সবে বিলাইলে অমৃত সংগীত জ্ঞান॥

সোনার শস্যে তব ঝলমল বর্ণ
অন্তরে মানিক্য-মণি-হীরা-স্বর্ণ,
তুমি বর্বরে করিয়াছ মানব মহান॥

হিংসা-দ্বেষ-ভোগ-ক্লান্ত এ বিশ্ব
আবার শিখিবে ত্যাগ, হবে তব শিষ্য,
তুমি বাঁচাবে সবারে করি অমৃত দান॥

৬৬

ভৈরবী—কার্ফা

আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয় যায়॥

ধানের খেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়॥

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লিগ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি,
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায়॥

কাজলা-দিঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেয়ে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায়॥

নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টিপ পরে সন্ধ্যাতারার,
ঊষার গাঙে ঘট ভরিয়ে যায় সে মেয়ে ভোরবেলায়॥

হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে
ভাটিয়ালি গায় ভাটির স্রোতে, গায় বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়॥

৬৭

মাঢ়—কার্ফা

লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর-জলে সিনান করি।
হাতে লয়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সুধা ভরি॥

আন মা আবার আঁচলে তোর নবীন ধানের মঞ্জরি সে,
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে, খাজনা মাগো দিব কিসে,
ডুবে গেছে সপ্ত ডিঙা, রত্ন-বোঝাই সোনার তরী॥

ক্ষীরোদ-সাগর-কন্যা যে তুই, খেতে দে ক্ষীর সর মা আবার,
পান্তা লবণ পায় না ছেলে, রাজরানি মার এ কোন বিচার,
কার কাছে মা নালিশ করি, অনন্ত শয়নে হরি॥

তোরও কি মা ধরল ঘুমে নারায়ণের ছোঁয়াচ লেগে,
বর্গি এল দেশে মা গো, খোকারা তোর কাঁদে জেগে,
তুই এসে তায় ঘুম পাড়া মা হাতে দিয়ে ঝিনুক কড়ি॥

কোন দুখে তুই রইলি ভুলে বাপের বাড়ি অতল-তলে,
ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষ, ভরল যে দেশ হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে বাঁচা, মা তোর পায়ে ধরি॥

৬৮

ভাটিয়ালি—কার্ফা

সাত ভাই চম্পা জাগো রে, ঐ পারুল তোদের ডাকে।
ভাই আর কত ঘুমাবি সবুজ পাতা-ঘেরা শাখে॥

কি জাদু করিল তোদের বিদেশি সৎ-মায়ে,
রাজার দুলাল ঘুমিয়ে আছিস আঁধার কানন-ছায়ে,
নিজেরা না জাগলে কবে মুক্ত করবি মাকে॥

তোদের বোন এনেছে জিয়ন-কাঠি প্রাণের পরশ-মণি,
মায়া-নিদ্রা ভোলাতে ঐ গায় সে জাগরণী।
গুবরে পোকায় মউ খেয়ে যায় তোদের ঐ মৌচাকে॥

তোদের চাঁপা রঙে চাপা আছে অরুণ-কিরণ-রেখা,
তোরা জাগবি রে যেই, অমনি পাবি দিনমণির দেখা ;
বোনের সাথে ভাই জাগিলে ভয় করি আর কাকে॥

৬৯

বাউল—নবতাল

গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজিয়ে কে যায়।
সুরের নেশায় নুয়ে পড়ে ভুঁই-কদম তার পায়ে জড়ায়॥

সুর শুনে তার সাঁঝের ঠোঁটে,
বাঁকা শশীর হাসি ফোটে
গো-পথ বেয়ে ধেনু ছোটে
রাঙা মাটির আবির ছড়ায়॥

গগন-গোঠে গ্রহ তারা
সে সুর শুনে দিশাহারা,
হাটের পথিক ভেবে সারা
ঘরে ফেরার পথ ভুলে যায়॥

জল নিতে নদীকূলে
কূলবালা কুল ভুলে,
সন্ধ্যাতারা প্রদীপ তুলে
বাঁশুরিয়ার নয়নে চায়॥

৭০

কীর্তন

তোরা যা লো সখি মথুরাতে
দেখে আয় কেমন আছে শ্যাম।
তোরা কুব্জা-সখার কাছে
নিসনে লো নিসনে রাধা নাম॥

তারে রাধার কথা
স্মরণ করায়ে দিয়ে দিসনে লাজ দিসনে ব্যথা।
বড় বাজ্‌বে ব্যথা,
মোর শ্যাম যদি লো পায় ব্যথা তার দ্বিগুণ ব্যথা বাজবে বুকে
সে অভাগিনী রাধায় ভুলে যে দেশে হোক আছে সুখে॥

সখি গো—
দেখে তোরে বিন্দে লো, বৃন্দাবনের কথা
গোবিন্দ শুধায় সে যদি,
(সখি লো),
বলিস—হে মাধব, মাধবী-কুঞ্জ তব ভেঙে গেছে
শুকায়েছে যমুনা নদী
(সখি হে)।
যমুনা শুকাইয়া শ্যাম তব শোকে হে,
লভিয়াছে আশ্রয় শ্রীরাধার চোখে হে।

ব্রজে বাজে নাকো বেণু, চরে নাকো ধেনু,
ফুল-দোল-রাস বন্ধ,
আর ময়ূর নাচে না তমাল-চূড়ায়,
কেঁদে লুটায় যশোদা-নন্দ।
বলিস্—তুমি আসার সাথে শ্যাম
পুড়ে গেছে ব্রজধাম।
গেছে জ্বলিয়া পুড়িয়া
গেছে গোকূলের খেলাঘর অকূলে ভাসিয়া।
বলিস্—কি হবে শুনে সে কথা
তুমি রাখাল নও তো আর,
এখন তুমি রাজাধিরাজ, এখন তুমি কুবুজার॥

৭১

সিন্ধু কাফি—যৎ

জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা
আবার রণ-চণ্ডী সাজে
তুই যদি না জাগিস মা গো
ছেলেরা তোর জাগবে না যে॥

অন্নদা তোর ছেলে-মেয়ে
অন্নহারা ফেরে ধেয়ে,
বাঁচার অধিক আছি মরে, দেখে কি প্রাণে কি বাজে॥

শ্মশান ভালোবাসিস যে তুই,
ভূ-ভারত আজ হলো শ্মশান,
এই শ্মশানে আয় মা নেচে,
কঙ্কালে তুই জাগা মা প্রাণ।

চাই মা আলো মুক্ত বায়ু
প্রাণ চাই, চাই পরমায়ু
মোহ-নিদ্রা ত্যাগ কর মা
শিব জাগা তুই শবের মাঝে॥

৭২

কাজরী—দাদ্‌রা

বিজলি চাহনি কাজল কালো নয়নে।
রহি রহি কেন হানিছ ক্ষণে ক্ষণে॥

ভীরু প্রণয় মম
ঝড়ের পাখির সম
শরণ মাগে তোমার মনো-বনে॥

আমার প্রণয় প্রদীপ-শিখা তোমার শ্বাসে থেকে থেকে
কেঁপে মরে, ওগো প্রিয়, বাঁচাও তারে আঁচল ঢেকে।

ধ্যান যাহার ওই রাঙা চরণ, বেঁধো না তায় বেণীর ফাঁদে ;
কি হবে পিঞ্জরে রাখি বেঁধেছ যায় বাহুর বাঁধে ;
কেন হানো আঘাত যে হেরে আছে রণে॥

৭৩

খাম্বাজ-পিলু—দাদ্‌রা

খ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল উড়ে যায়।
চলিতে নারি পথে দাঁড়ায়ে নিরুপায়॥

খুলে পড়ে গো বাজুবন্দ্‌ ধরিতে আঁচল,
কোন্‌ ঘূর্ণি বাতাস এল ছন্দ-পাগল,
লাগে নাচের ছোঁয়া দেহের কাচ-মহলায়।
হয়ে পায়েলা উতলা সাধে ধরিয়া পায়॥

খুলিয়া পড়ে খোঁপা, কবরী ফুলহার,
হাওয়ার রূপে গো এল কি বঁধু আমার,
এমনি দুরন্ত আদর সোহাগ তার,
এ কি পুলক-শিহরণে পরান মুরছায়॥

৭৪

পাহাড়ি—দাদ্‌রা

মোর হৃদি-ব্যথার কেউ সাথী নাহি।
লয়ে আহত প্রাণ একা গান গাহি॥

দিবস বরষ মাস
বুকে চাপি হা-হুতাশ
চলি মরুপথে মেঘ-ছায়া চাহি॥

কানন রচি বৃথা, কুসুম নাহি ফোটে,
বাসি হয় গাঁথা মালা পথের ধুলায় লোটে,
কবে বহিবে নির্ঝর-ধারা পাষাণ বাহি॥

৭৫

সিন্ধুমিশ্র—দাদ্‌রা

সাগর হতে চুরি ডাগর তব আঁখি।
গভীর চাহনিতে করুণা মাখামাখি॥

শফরী সম তাহে ভাসিছে আঁখি-তারা,
তাহারি লোভে যেন উড়িছে ভুরু-পাখি॥

দুলে তরঙ্গ তাহে কভু ঘোর কভু ধীরে
আঁখির লীলা হেরি আঁখিতে আঁখি রাখি॥

ভীরু হরিণ চোখে অশনি হানো কেন,
শারাব-পিয়ালাতে জহর কেন সাকি॥

আঁখির ঝিনুকে কবে ফলিবে প্রেম-মোতি,
ডুবিবে আঁখি-নীরে সেদিনের নাহি বাকি॥

৭৬

মান্দ্‌মিশ্র—কার্ফা

সুরের ধারার পাগল-ঝোরা
নামিল সখি মোর পরানে
যেন কাহারবায় গজল কে গায়
সাকির সাথে গুল্‌-বাগানে।।

ভরি মোর নিশীথ নিঝুম
বাজে নূপুর কার রুমুঝুম্‌
মোর চোখে নাহি ঘুম,
পাষাণ টুটে লো যায় ছুটে।
মন-তটিনী মোর সাগর পানে।।

পানসে চাঁদের জোছনাতে ঐ বেলের কুঁড়ি মুঞ্জরে,
মোর মন যেতে চায় ফুল-বিছানো বকুল-বীথির পথ ধরে।
আজ চাইবে যে, দিব তাকে
সই ফুল ছুঁয়ে এই আপনাকে,
বাহির আমায় ডাক দিয়েছে আর কি ঘরে মন থাকে।
অরুণ রাগে হৃদয় জাগে,
ভাসিয়া যাব নৃত্যে গানে।।

৭৭

বেহাগ খাম্বাজ—কার্ফা

নাচন লাগে ঐ তরুলতায় পাতায় ফুলে।
ফুল-শৌখিন দখিন হাওয়া
নাচে সাথে দুলে দুলে।।

নাচে অথির-মতি,
রঙিন-পাখা প্রজাপতি,
বন দুলায়ে মন ভুলায়ে।
ঝিল্লি-নূপুর বাজায়ে
নাচে বনে নিশীথিনী এলোচুলে।।

মৃণাল-তনু কমল নাচে এলো খোঁপায় নীল জলে,
ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায় নির্ঝর পাষাণ-তলে।

বাদলা হাওয়ায় তালবনা ঐ বাজায় চটুল দাদ্‌রা তাল,
নদীর ঢেউ-এ মৃদং বাজে, পানসি নাচে টালমাটাল।
নেচে নেচে গ্রহতারা দিশাহারা নটরাজের নাট-দেউলে॥

৭৮

জংলা—কার্ফা

দিল দোলা দিল দোলা
কোন দখিন হাওয়া গজল-গাওয়া
কুসুম-ছাওয়া বনে।
ওঠে চমকি চমকি পরান ক্ষণে ক্ষণে॥

ফুল-বধূদের মধু যেচে
বেড়ায় হিয়া নেচে নেচে,
দেখেছিলাম স্বপনে যায়
পেয়েছি তায় আজকে জাগরণে॥

কূল ছাপিয়ে মন-তটিনী নটিনীর বেশে
দুলে দুলে যায় ভেসে।
বসন ভূষণ আজি শাসন নাহি মানে
খুশির তুফানে।

আপনাকে কার পায়ে
দিতে চাহি বিলায়ে,
চাই কুঞ্জপথে ঝরে যেতে
ঝরা ফুলের সনে॥

৭৯

বাউল—কার্ফা

মা ষষ্ঠী গো, তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি।
আর অস্থির করিসনে মা আমায় দয়া করি॥

ষষ্ঠী মা, তোর কৃপার চেয়ে যষ্টি-প্রহার ভালো,
কৃপা যদি করলি মা গো, মেয়েগুলোই কালো !
শিলাবৃষ্টির মতো যে তোর কৃপা পড়ে ঝরি ॥

ছাদে বারান্দায় উঠানে ধরে না লেপ কাঁথা,
খোরোসানি গন্ধে মা গো নাড়ি করে ব্যথা,
রাত্রিবেলায় গুনতে—মাথায় খুন যায় যে চড়ি ॥

পূর্বজন্মে ছিলেন গিন্নি সগর রাজার রানি,
যত বলি আন্নাকালি ততই কি আমদানি !
মা গো কাঁঠাল গাছকে হার মানাল আমার প্রাণেশ্বরী ॥

কসুর করেছিলাম মা গো শ্বশুরকন্যে এনে,
আর ঘোড়া ছুটাবি কত, ধর এবার রাশ টেনে,
মানুষ না রেলগাড়ি আমি তাই ভেবে মা মরি ॥

ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের প্রথমটি বাদ দিয়ে
দিলি সবই, এবার ফিরে যা মা বেরাল নিয়ে।
কালো মেয়ের পারের মাশুল দে মা শাদা কড়ি ॥

৮০

ছায়ানট—দাদ্‌রা

হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই
ভারতের দুই আঁখি-তারা
এক বাগানে দুটি তরু দেবদারু আর কদম-চারা ॥

যেন গঙ্গা সিন্ধু নদী
যায় গো বয়ে নিরবধি,
এক হিমালয় হতে আসে, এক সাগরের হয় গো হারা ॥

বুল্‌বুল্ আর কোকিল পাখি
এক কাননে যায় গো ডাকি,
ভাগীরথী যমুনা বয় মায়ের চোখের যুগল ধারা ॥

ঝগড়া করে ভায়ে ভায়ে
এক জননীর কোল লয়ে
মধুর যে এ কলহ ভাই পিঠোপিঠি ভায়ের পারা॥

পেটে-ধরা ছেলের চেয়ে চোখে ধরার মায়া বেশি,
অতিথি ছিল অতীতে, আজ সে সখা প্রতিবেশী।
ফুল পাতিয়ে গোলাপ বেলি
একই মায়ের বুকে খেলি,
পাগলা তারা, আল্লা ভগবানে ভাবে ভিন্ন যারা॥

৮১

ভৈরবী—একতালা

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥

এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান॥

এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই,
মোরা এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান॥

চিনতে নেরে আঁধার রাতে করি মোরা হানাহানি,
সকাল হলে হবে রে ভাই ভায়ে ভায়ে জানাজানি।
কাঁদব তখন গলা ধরে,
চাইব ক্ষমা পরস্পরে,
হাসবে সেদিন গরব ভরে এই হিন্দুস্থান॥

৮২

ইমন মিশ্র—একতালা

মানবতাহীন ভারত শ্মশানে দাও মানবতা, হে পরমেশ !
কি হবে লইয়া মানবতাহীন ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষ ॥

কালের পুতুল এরা প্রাণহীন
পাষাণ আত্মবিশ্বাস-হীন,
নিজেরে ইহারা চিনে না, কেমনে চিনিবে ইহারা নিজের দেশ ॥

ফিরিছে শ্মশানে যেন প্রেত-পাল,
নর নাই, শুধু নর-কঙ্কাল,
এই চির-অভিশপ্তের মাঝে জাগাও হে প্রভু প্রাণের রেশ ॥

ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেম-বোধ,
কেবলি কলহ কেবলি বিরোধ,
দেয়ালের পরে তুলিয়া দেয়াল নিজেরে নিজেরা করিছে শেষ
হে দেশ-বিধাতা, দূর করো এই লজ্জা ও গ্লানি, এ দীন বেশ ॥

৮৩

কানাড়া মিশ্র—একতালা

উদার ভারত ! সকল মানবে
দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্শি জৈন বৌদ্ধ হিন্দু
খ্রিস্টান শিখ মুসলমান ॥

তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া
মিলেছে সকল ধর্ম জাতি,
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা
সকল দেশের করেছে জ্ঞাতি ;
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া, হয়েছ
বিশ্ব-মানব-পীঠস্থান ॥

নিজ সন্তানে রাখি নিরন্ন
অন্য সবারে অন্ন দাও,
তোমার স্বর্ণ রৌপ্য মানিকে
বিশ্বের ভাণ্ডার ভরাও ;
আপনি মগ্ন ঘন তমসায়
ভুবনে করিয়া আলোক দান॥

বক্ষে ধরিয়া কত সে যুগের
কত বিজেতার গ্লানির স্মৃতি,
প্রভাত আশায় সর্বসহা মা
যাপিছ দুখের কৃষ্ণা তিথি,
এমনি নিশীথে এসেছিল বুকে
আসিবে আবার সে ভগবান॥

৮৪

মালগুঞ্জ—জলদ্ তেতালা

ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে।
ভুলে আছিস দেশ-জননী কেমন করে॥

ব্যথিত বুকে মা গো তোমার মন্দির গড়ি
করি পূজা আরতি কত যুগ যুগ ধরি,
ধূপ পুড়েছে মা গো, চন্দন শুকায়ে যায়,
আয় মা আয় পুন রানির মুকুট পরে॥

দুখের পসরা মা আর যে বহিতে নারি,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকায়েছে আঁখি-বারি,
এ গ্লানি লজ্জা মা সহিতে নাহি পারি,
বিশ্ব-বন্দিতা এস দুখ-নিশি ভোরে॥

অতীত মহিমা লয়ে এস মহিমাময়ী,
হীনবল সন্তানে কর মা ভুবন-বিজয়ী,
দুখ-তপস্যা মা কবে তব হবে শেষ,
আয় মা নব-আশা রবির প্রদীপ ধরে॥

৮৫

ভৈরবী—দাদ্‌রা

আজ ভারতের নব আগমনী
জাগিয়া উঠেছে মহাশ্মশান।
জাগরণী গায় প্রভাতের পাখি,
মরুতে বসেছে ফুল-বাথান॥

টলেছে অটল হিমালয় আজি,
সাগরে শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি,
হলাহল শেষে উঠিছে অমৃত
বাঁচাইতে মৃত মানব-প্রাণ॥

আঁধারে করেছে হানাহানি যারা
আলোকে চিনেছে আত্মীয় তারা,
এক হয়ে গেছে খ্রিস্টান শিখ
পার্শি হিন্দু মুসলমান॥

ধ্যানের ভারত নবরূপ ধরে
গড়িয়া উঠিছে গৌরব ভরে,
বিদূরিত হবে বিশ্বে এবার
হিংসা দ্বন্দ্ব অকল্যাণ॥

এই তাপসীর চরণের তলে
পাইয়াছে জ্ঞান-আলোক সকলে,
প্রণাম করিয়া দেশ দলে দলে,
আসিবে করিতে তীর্থস্নান॥

৮৬

ভৈরবী—কাশ্মীরী খেম্‌টা

নাইয়া! ধীরে চালাও তরণী।
একে ভরা ভাদর তায় বালা মাতোয়ালা
মেঘলা রজনী॥

হায় পারে নেওয়ার ছলে নিলে মাঝ-নদীতে,
যৌবন-নদী টলমল নারি রোধিতে,
ঐ ব্যাকুল বাতাস হরি নিল লাজ বাস,
তায় চঞ্চল-চিত যে তুমি চাহ বধিতে,
পায়ে ধরি ছাড়ো বঁধু
আমি পরের ঘরের ঘরনি॥

তরঙ্গ ঘোর রঙ্গ করে, অঙ্গে লাগে দোল,
একি এ নেশার ঘোরে তনু মন আঁখি লোল।

দুলিছে নদী দুলে বায়ু দুলিছে তরী,
কেমনে থির রাখি মোর চিত উতরোল।
ওঠে ডিঙি পানসি ভরি বারি কি করি
কিশোরী রমণী॥

৮৭

মিশ্র খাম্বাজ—কার্ফা

প্রিয়ার চেয়ে শালি ভালো,
বাবার চেয়ে মামা।
ডাইনের চেয়ে ডুগি ভালো
অর্থাৎ কিনা বামা॥

একশালা-সে দোশালা আচ্ছা,
চণ্ডুর চেয়ে গাঁজা,
'তেনার' চেয়ে ভালো 'তেনার'
হাত দিয়ে পান সাজা,
ধাক্কার চেয়ে গুঁতো ভালো
উকোর চেয়ে ঝামা॥

টিকির চেয়ে বেণী ভালো,
ধুতির চেয়ে শাড়ি,
পাঁঠার চেয়ে মুরগি ভালো,
থানার চেয়ে ফাঁড়ি,

ঠুঁটোর চেয়ে নুলো ভালো,
প্যান্ট চেয়ে পায়জামা ॥

পেয়াদার চেয়ে যম ভালো ভাই
শালের চেয়ে বাঁশ,
দাড়ির চেয়ে গুম্ফ ভালো
আঁটির চেয়ে শাঁস,
ছেলের চেয়ে ছালা ভালো,
পেতের চেয়ে ধামা ॥

পাকার চেয়ে কাঁচা ভালো,
কালোর চেয়ে ফর্সা,
পেত্নির চেয়ে ভূত ভালো ভাই
ছাড়বার থাকে ভরসা।
ঝগড়ার চেয়ে রগ্‌ড়া ভালো,
কাল্লুর চেয়ে গামা ॥

৮৮

জংলা—কার্ফা

কেরানি আর গরুর কাঁধ
এই দুই-ই সমান দাদা।
এক লাগাড়ে জোয়াল বাঁধা
টানছে খেয়ে নুন আদা ॥

দুইজনে যা জাব্‌না পায়
দশগুণ তার নাদ্‌না খায়,
হটর হটর টানছে গাড়ি
মানে নাকো জল কাদা ॥

দুইজনাতে কথায় কথায়
পাঁচন-গুঁতো ন্যাজা মলা খায়,
ছ্যাকড়া টানে বোঝা-ও বহে
কভু ঘোড়া কভু গাধা ॥

বড় সায়েব আর গাড়োয়ান
দুই স্যাঙাৎই এক সমান,
হতে নাহি পারে হবেও নাকো
এমন সম্বন্ধ পাতান,
গরিবের বৌ বৌদি সবার
বলে নে বাপ, নেই বাধা॥

৮৯

পিলু খাম্বাজ—কার্ফা

শা আর শুঁড়ি মিলে
শাশুড়ি কি হয় গো।
শ্যাম-প্রেমে বাধা দেয়
স্বামী তারে কয় গো॥

নয় নদী মিলে হয় ননদী সে দজ্জাল,
জুতো জামা-ই সার যার—জামাই সে মহাকাল,
যার কসুর হয় না সে শ্বশুর মহাশয় গো॥

সে ভাদ্দর-বউ, যার ভাদ্দর মাসে বিয়ে,
দেবর সে জন, দেয় বর যে দাদারে দিয়ে।
ভাসুর সে, অসুরের মতো যারে ভয় গো॥

বেহায়া চশম-খোর, তাই কি বেহাই কই,
পিষিয়া মারেন বলে নাম কি পিসিমা ঐ,
সবারই সে ভাগ নেয় ভাগনেরই জয় গো॥

৯০

খাম্বাজ—লোফা

তোমায় আমায় ও প্রেয়সী
মিল খেয়েছে, রাজ-যোটক।
আমি যেন গোদা চরণ
তুমি তাহে বিস্ফোটক॥

আমি কুমড়ো তুমি দা,
আমি কাঁচকলা তুমি আদা,
তুমি তেজি আমি ম্যাদা,
আমি সাপ, তুমি বেজি যেন, বাপ !
তুমি হস্তিনী আমি ঘোটক ॥

তুমি বঁটি, আমি চিচিঙ্গে,
আমি চিল, পিছে তুমি ফিঙে,
আমি টিঙটিঙে তুমি ডিঙডিঙে !
আমি ভেতো বাঙালিটি, তুমি যেন বর্গি ঠগ ॥

আমি দাড়ি তুমি খুর,
তুমি সাপ আমি ন্যাজুড়,
তুমি মাফ, আমি কসুর,
আমি ভাঙা ডোঙা কলার ভেলা,
তুমি খিদিরপুরি ডক ॥

তুমি বঁড়শি আমি মাছ,
আমি মোম তুমি আগুন-আঁচ,
তুমি হিরে আমি কাচ,
তুমি আর জন্মে স্বামী হয়ো,
আমায় দিও পাদোদক ॥

৯১

সোহিনী বসন্ত—কার্ফা

ছিটাইয়া ঝাল নুন এল ফাল্গুন মাস।
কাঁচা বুকে ধরে ঘুণ, শ্বাস ওঠে ফোঁস ফোঁস ॥

শিমুল ফলের মতো ফটাফট্ ফাটে হিয়া,
প্রেম-তুলো বের হয়ে গো ছড়াইয়া,
সবে বালিশ ধরিয়া করে ছটফট হাঁসফাঁস ॥

চিবুতে সজনে খাড়া সজনীরা ভুলে যায়,
আনাগোনা করে প্রেম পরানের দরজায়,
হৃদয়ের ইঞ্জিনে গ্যাস ওঠে ভোঁস ভাঁস॥

কচি আম-ঝোল-টক খাইয়া গিন্নি মায়
বৌঝির সাথে করে টক্কাই টক্কাই!
আইবুড়ো আইবুড়ি জল গেলে ছ-গেলাস॥

বিরহিনীদের আঁখি-কলসি হয়েছে ফুটো,
গাধাও আজ গাহে গান ফেলিয়া ঘাসের মুঠো,
নোনা-পাকা মন বলে, কবে আসে তালশাঁস॥

৯২

পিলু—দাদ্‌রা

কহ প্রিয়ে, কেমনে এ রাতি কাটাই।
কহিতে শরমে বাধে, তামুক যে নাই॥

প্রাণ করে আঁকুপাঁকু,
কোথায় গেলে পাই তামাকু,
পেটে যেন চলে মাকু
বুক করে আইঢাই।
তামাকু যে নাই॥

বসে আছি নৈচে ধরে
শূন্য কলকে শূন্যে তুলে,
ধোঁওয়া বিনে চোঁওয়া ঢেকুর
ঠেলে ওঠে কণ্ঠ-মূলে।
প্রাণের দায়ে খেতে হবে
চেঁছে হুঁকোর কাই।
তামাকু যে নাই॥

হুঁকোর জলের গন্ধ শুঁকে
কোনরূপে কাটিত এ-রাত
ছুঁচো তাড়াইতে তাহাও
শেষ করেছ, হায় রে বরাত !
গুল থাকলেও হতো উপায়,
দাঁত মেজেছ তাই দিয়ে, হায় !
রংপুরে তোমার বাড়ি ভেবেও শান্তি পাই॥

৯৩

কাফি—ঝাঁপতালা

বুকের ভিতর জ্বলছে আগুন
দমকল ডাক ওলো সই।
শিগগির ফোন কর বঁধুরে
নইলে পুড়ে ভস্ম হই॥

অনুরাগ-দেশলাই নিয়ে
প্রেমের স্টোভ জ্বালতে গিয়ে,
আমার প্রাণের খোড়ো ঘরে
লাগল আগুন ঐ লো ঐ॥

প্রেমের কেরোসিন যে এত
অল্পে জ্বলে, জানিনে তো !
কি দাবানল জ্বলছে বুকে
জানবে না কেউ আমি বই॥

প্রণয় প্রীতির তোষক গদি
রক্ষে করতে চায় সে যদি,
তারে আনতে বলিস মনে করে
আদর সোহাগ—বালতি মই॥

৯৪

পিলু—কার্ফা

একি হাড়-ভাঙা শীত এল মামা।
যেন সারা গায়ে ঘষে দিচ্ছে ঝামা॥

হইয়া হাড়-গোড় ভাঙা দ
ক্যাঙারুর বাচ্চা যেন গো,
সেঁধিয়ে লেপের পেটে
কাঁপিয়া মরি, ভয়ে থ!
গিন্নি ছুটে এসে চাপা দেয় যে ধামা॥

বাঘা শীত, কাঁপি থরথর,
যেন গো মালোয়ারির জ্বর,
বেরালে আঁচড়ায় যেন
শাণিয়ে দন্ত নখর,
মা গো দাঁড়াতে নারি, চলি দিয়ে হামা॥

হাঁড়িতে চড়িয়ে আমায়
উনুনে রাখো গো ত্বরায়,
পেটে মোর ভরিয়া তুলো
বালাপোষ করো গো আমায়!
হলো শরীর আমার ফেটে মহিষ-চামা।
ওরে হরে! নিয়ে আয় মোজা পায়জামা॥

৯৫

বেহাগ মিশ্র—দাদ্‌রা

আমি দেখন-হাসি।
আমায় দেখলে পরে হাসতে হাসতে
পেয়ে যাবে কাশি॥

আমি হাসির হাঁসলি ফিরি করি,
এলে আমার হাসির দেশে
বুড়োরা সব ছোঁড়া হয়, হেসে
ছোঁড়ারা যায় টেঁসে !
আমার হাঁস-খালিতে বাড়ি
আমি হাস্নুহানার মাসি॥

এলে আমার হাসির হেঁসেলে,
তার হাঁসফাঁসানি লেগে
অন্তে শুধু দন্ত থাকে
শরীরটা যায় ভেগে !
আমি পাতিহাঁসির আণ্ডা বেচি,
আর হাসির ময়দা থাঁসি॥

সে-দিন পথে যাচ্ছিল সব রাজার হাতি উট
আমায় দেখে হাসতে হাসতে চোঁ চোঁ দিলে ছুট্,
হেসে পালিয়ে দড়ি ছিঁড়ে মটরু মিঞার খাসি॥

৯৬

চতুরঙ্গ

রাম-ছাগী গায় চতুরঙ্গ বেড়ার ধারে।
গাইয়ে ষাঁড়-সাথে বাছুর হাম্বা রবে
ভীষণ নাদ ছাড়ে,
ফেটে বুঝি গেল কান, প্রাণে মারে !
শুনিয়া হাই তোলে ভেউ ভেউ রোলে—
ভুলোটা পগার-পারে॥

তেলেনা :—ডিম নে রে, তা দেরে, আমি না রে,
তুই দে রে ; নে রে ডিম, দে রে তা,
তা দে না,
ওদের না না, তাদের না না, তুই
দে রে ডিম !

ওদের নাড়ি তাদের নারী দেদার নারী,
দে রে নারী, যা ধেৎ, টানাটানি !
সরগম— ধা পা র ধা রে গা, গা রে গা ধা,
গা রে গা ধা, নি ধা মা মা
পা রে নি, মা রে গা, সা রা শা মা।

তবলার বোল :—ভেগে যা, মেগে খা, মেরেকেটে খা,
মেরে কেটে খা, তেড়ে ধরে কাট দুম,
ধরে কেটে রাখুন না রাখুন না,
নাক ধরে টান, কান দুটি যাক,
শুধু কাটা থাক দুম॥

৯৭

কীর্তন

আমার হরিনামে রুচি
কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন।
আমি মালপো-র লাগি তলপি বাঁধিয়া
এ কল্প-লোকে এসেছি মন॥

'রাধা-বল্লভী' লোভে পূজি রাধা-বল্লভে,
রস-গোল্লার লাগি আসি রাস-মোচ্ছবে !
আমার গোল্লায় গেছে মন রস-গোল্লায় গেছে মন !

ও তো রসগোল্লা কভু নয়
যেন ন্যাড়া-মাথা বাবাজি থালাতে হয়েন উদয় !
গজা দেখে প্রেম যে গজায় হৃদিতলে রে,
পানতোয়া দেখে প্রাণ নাচে হরি বলে রে !
ঐ গোলগাল মোয়া মায়াময় এই সংসার দেয় ভুলিয়ে,
আর ক্ষীরের খোয়াতে খোয়াইতে কুল মন ওঠে চুলবুলিয়ে !

মন বলে হরি হরি হাত বলে হরো হে
অরসিকে তেড়ে আসে বলে ওহে ধরো হে !
সংসারেতে ভক্ত শুধু রাঁধুনি ও ময়রাই—
সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে !
যারা ময়দা পেয়ে মালপো বিলোয়
সে দুই ভাই আজি এসেছে রে !
আমি চিনি মেখে গায়ে যোগী হবো দাদা যাব ময়রার দেশে
রস- করার কড়াই-এ ডুবিয়া মরিব গলে সন্দেশ ঠেসে।
ভোজন-ভজহরির শোনো এই তথ্য
গো-ময় সংসারে ভোজনই সত্য ॥

জুলফিকার

১

মার্চের—সুর

দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামি লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল॥

গাজি মুস্তাফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কি সুর্খ-তাজ,
রেজা পহলবি সাথে জাগিয়াছে
বিরান মুলুক ইরানও আজ,
গোলামি বিসরি' জেগেছে মিসরি,
জগলুল সাথে প্রাণ-মাতাল॥

ভুলি গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ
নেজদ আরবে ইবনে সউদ,
আমানুল্লার পরশে জেগেছে
কাবুলে নবীন আল-মাহমুদ,
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজ
বন্দি করিম রীফ-কামাল॥

জাগে ফয়সল ইরাক আজমে,
জাগে নব হারুন-আল-রশিদ,
জাগে বয়তুল মোকাদ্দস রে,
জাগে শাম দেখ টুটিয়া নিঁদ,
জাগে না কো শুধু হিন্দের
দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল॥

মোরা আসহাব কাহাফের মতো
হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,

আমাদের কেহ ছিল বাদশাহ
কোন কালে, তারি করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার
কাঁপিবে চরণে টালমাটাল॥

২

খাম্বাজ—কার্ফা

কোথায় তখত তাউস,
কোথায় সে বাদশাহি।
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম
ফরিয়াদ য়্যা এলাহি॥

কোথায় সে বীর খালেদ,
কোথায় তারেক মুসা,
নাহি সে হজরত আলি,
সে জুলফিকার নাহি॥

নাহি সে উমর খাত্তাব,
নাহি সে ইসলামি জোশ,
করিল জয় যে দুনিয়া,
আজ নাহি সে সিপাহি॥

হাসান হোসেন সে কোথায়,
কোথায় বীর শহিদান —
কোরবানি দিতে আপনায়
আল্লার মুখ চাহি॥

কোথায় সে তেজ ঈমান,
কোথায় সে শান শওকত,
তকদিরে নাই সে মাহতাব,
আছে পড়ে শুধু সিয়াহি॥

৩

কাফি—কার্ফা

খুশি লয়ে খোশরোজের
আয় খেয়ালি খোশ-নসিব।
জ্বাল দেয়ালি শবেরাতের,
জ্বাল রে তাজা প্রাণ-প্রদীপ॥

আন্ নয়া দীনি ফরমান
দরাজ দিলের দৃপ্ত গান,
প্রাণ পেয়ে আজ গোরস্থান
তোর ডাকে জাগুক নকিব॥

আন্ মহিমা হজরতের
শক্তি আন্ শেরে খোদার,
কোরবানি আন্ কারবালার
আন্ রহম মা ফাতেমার।
আন্ উমরের শৌর্য বল,
সিদ্দিকের আন্ সাচ্চা মন,
হাসান হোসেনের সে ত্যাগ,
শহিদানের মৃত্যু-পণ।
খোদার হবিব শেষ নবি,
তুই হবি নবির হবিব॥

খোৎবা পড়বি মসজিদে
তুই খতিব নূতন ভাষায়,
শুষ্ক মালঞ্চের বুকে
ফুল ফুটাবি তোর হাওয়ায়,
এসমে-আজম এনে মৃত
মুসলিমে তুই কর সজীব॥

৪

ভৈরবী—কার্ফা

জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান॥

যাহার তকবির ধ্বনি
তকদির বদলালো দুনিয়ার,
না–ফরমানির জামানায়
আনিল ফরমান খোদার,
পড়িয়া বিরান আজি সে বুলবুলিস্তান॥

নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ঈমান,
নাহি আলির জুলফিকার,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি বীর শহিদান॥

নাহি আর বাজুতে কুওত
নাহি খালেদ মুসা তারেক,
নাহি বাদশাহি তখত তাউস,
ফকীর আজ দুনিয়ার মালিক,
ইসলাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্থান॥

৫

মর্সিয়া জয়জয়ন্তী মিশ্র—সাদ্রা

মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়॥

কাঁদিয়া জয়নাল আবেদিন বেহুঁশ হল কারবালায়।
বেহেশ্‌তে লুটিয়া কাঁদে আলি ও মা ফাতেমায়॥

আজও শুনি কাঁদে যেন কুল মুলুক আসমান জমিন।
ঝরে মেঘে খুন লালে–লাল শোক–মরু সাহারায়॥

কাশেমের লাশ লয়ে কাঁদে বিবি সকিনা।
আসগরের ঐ কচি বুকে তীর দেখে কাঁদে খোদায়॥

কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তারি মর্সিয়া।
ঝরে হাজার বছর ধরে অশ্রু তারি শোকে হায়॥

৬

পিলু–খাম্বাজ—দাদরা

শহীদি ঈদগাহে দেখ আজ জমায়ত ভারি।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামি ফরমান জারি॥
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মোরক্কো ইরাক,
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে সারি সারি॥

ছিল বেহুঁশ যারা আঁসু ও আফসোস লয়ে,
চাহে ফিরদৌস তারা জেগেছে নও জোশ লয়ে।
তুইও আয় এই জমা'তে ভুলে যা দুনিয়াদারি॥

ছিল জিন্দানে যারা আজকে তারা জিন্দা হয়ে
ছোটে ময়দানে দারাজ–দিল আজি শমশের লয়ে।
তকদির বদলেছে আজ উঠিছে তকবীর তারি॥

৭

পিলু—কার্ফা

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন আসমানি তাকিদ॥

তোর সোনাদানা বালাখানা
সব রাহে লিল্লাহ্
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ
ভাঙাইতে নিঁদ॥

তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন
সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজি মুসলিম হয়েছে শহিদ॥

আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত–দুশমন
হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল
ইসলামে মুরিদ।

যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা
নিত্‌–উপবাসী
সেই গরীব এতিম মিসকিনে দে
যা কিছু মফিদ॥

ঢাল হৃদয়ের তোর তশতরিতে
শিরণি তৌহিদের,
তোর দাওত কবুল করবেন হজরত,
হয় মনে উমিদ॥

তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে
ইট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোল রে গড়ে
প্রেমেরি মসজিদ॥

৮

মান্দ—কার্ফা

তোমারি মহিমা সব বিশ্বপালক করতার।
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার।
বিশ্বপালক করতার॥

রোজ–হাশরের বিচার–দিনে
তুমিই মালিক এয় খোদা,
আরাধনা করি প্রভু,
আমরা কেবলি তোমার।
বিশ্বপালক করতার॥

সহায় যাচি তোমারি নাথ,
দেখাও মোদের সরল পথ,
তাদের পথে চালাও খোদা
বিলাও যাদের পুরস্কার।
বিশ্বপালক করতার॥

অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে প্রান্ত-পথ,
চালায়ো না তাদের পথে,
এই চাহি পরওয়ারদেগার।
বিশ্বপালক করতার॥

৯

পাহাড়ী—কার্ফা

সাহারাতে ফুটল রে
রঙিন গুলে-লালা।
সেই ফুলেরই খোশবুতে
আজ দুনিয়া মাতোয়ালা॥

সে ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি
চাঁদ-সুরুয গ্রহ-তারায়,
ঝুঁকে পড়ে চুমে সে ফুল
নীল গগন নিরালা॥

সেই ফুলেরই রওশনিতে
আরশ কুর্শি রওশন,
সেই ফুলেরই রং লেগে
আজ ত্রিভুবন উজালা॥

সেই ফুলেরই গুলিস্তানে
আসে লাখো পাখি,
সে ফুলেরে ধরতে বুকে দোলে রে ডাল-পালা॥

চাহে সে ফুল জিন্ ও ইনসান
হুর পরি ফেরেশতায়,
ফকির দরবেশ বাদশা চাহে
করতে গলে মালা ॥

চেনে রসিক ভোম্‌রা বুলবুল
সেই ফুলের ঠিকানা,
কেউ বলে হজরত মোহাম্মদ
কেউ বা কমলিওয়ালা ॥

১০

সিন্ধু—কার্ফা

দেখে যা রে দুলা সাজে
সেজেছেন মোদের নবি।
বর্ণিতে সে রূপ মধুর
হার মানে নিখিল-কবি ॥

আউলিয়া আর আম্বিয়া সব
পিছে চলে বরাতি,
আসমানে যায় মশাল জ্বেলে
গ্রহ তারা চাঁদ রবি ॥

হুর পরি সব গায় নাচে আজ,
দেয় 'মোবারক-বাদ' আলম,
আরশ কুর্শি ঝুঁকে পড়ে
দেখতে সে মোহন ছবি ॥

আজ আরশের বাসর-ঘরে
হবে মোবারক রুয়ৎ,
বুকে খোদার ইশ্‌ক নিয়ে
নওশা ঐ আল-আরবি ॥

মেরাজের পথে হজরত যান চড়ে ঐ বোররাকে,
আয় কলমা শাহাদতের যৌতুক
দিয়ে তাঁর চরণ ছোঁবি॥

১১

ভৈরবী—কার্ফা

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবি মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়॥

আমার কিসের শঙ্কা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥

কলেমা আমার তাবিজ, তৌহিদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান আমার বর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ।

'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী,
আখের মোকাম ফেরদৌস খোদার আরশ যথায় রয়॥

আরব মেসের চীন হিন্দ মুসলিম-জাহান মোর ভাই,
কেহ নয় উচ্চ কেহ নীচ, এখানে সমান সবাই।

এক দেহ এক দিল এক প্রাণ,
আমির ফকির এক সমান,
এক তকবিরে উঠি জেগে, আমার হবেই হবে জয়॥

১২

ভৈরবী—কার্ফা

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে
এল নবীন সওদাগর।
বদনসিব আয়, আয় গুনাহগার,
নতুন করে সওদা কর॥

জীবন ভরে করলি লোকসান,
আজ হিসাব তার খতিয়ে নে,
বিনি-মূলে দেয় বিলিয়ে সে যে বেহেশতি নজর॥
কোরানের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে,
লুটে'নে রে লুটে'নে সব
ভরে তোল তোর শূন্য ঘর॥

কলেমার ঐ কানাকড়ির বদলে দেয় এই বণিক
শাফায়তের সাত রাজার ধন,
কে নিবি আয় ত্বরা কর॥

কিয়ামতে বাজারে ভাই
মুনাফা যে চাও বহুৎ,
এই ব্যাপারির হও খরিদ্দার,
লও রে ইহার সীলমোহর॥

আরশ হতে পথ ভুলে এ
এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ,
পুঁজি আল্লাহু আকবার॥

১৩

পিলু—কার্ফা

যাবি কে মদিনায়, আয় ত্বরা করি।
তোর খেয়া-ঘাটে এল পুণ্য-তরী॥

আবুবকর উমর খাত্তাব
আর উসমান আলি হাইদর
দাঁড়ি এ সোনার তরণীর
পাপী সব নাই নাই আর ডর।

এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ,
পাকা সব মাঝি ও মাল্লা,

মাঝিদের মুখে সারি-গান
শোন ঐ 'লা শরীক আল্লাহ্' !
পাপ দরিয়ার তুফানে আর নাহি ডরি ॥

ঈমানের পারানী কড়ি আছে যার
আয় এ সোনার নায়,
ধরিয়া দীনের রশি
কলেমার জাহাজ-ঘাটায়।
ফেরদৌস হতে ডাকে হুরি পরি ॥

১৪

সিন্ধু—বাগেশ্রী—কার্ফা

বক্ষে আমার কাবার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ
গাই তারি গান পথ-বেভুল ॥

লায়লির প্রেমে মজনু পাগল
আমি পাগল 'লা-ইলা'র ;
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে,
অরসিকে কয় বাতুল ॥

হৃদয়ে মোর খুশির বাগান
বুলবুলি তায় গায় সদাই,
ওরা খোদার রহম মাগে
আমি খোদার ইশ্‌ক চাই।

আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান হাজার মোয়াজ্জিন,
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা
রুহ পড়ে তা রাত্রিদিন।

খাতুনে-জিন্নত আমার মা,
হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না রোজ-কিয়ামত
পুল-সিরাতের কঠিন পুল ॥

১৫

পিলু খাম্বাজ—সাদ্রা

আহমদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ্ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন ॥

যে চিনতে পারে রয় না ঘরে
হয় সে উদাসী,
সে সকল ত্যাজি ভজে শুধু
নবিজির চরণ ॥

ঐ রূপ দেখে রে পাগল হল
মনসুর হল্লাজ
সে 'আনল্হক' 'আনল্হক' বলে
ত্যজিল জীবন ॥

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে,
তোর রুহানি আয়নাতে দেখ রে
সেই নূরি রওশন ॥

১৬

মাঢ় মিশ্র—কার্ফা

খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে
বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে।

ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ
এল যে এই পথ ধরে।।

দুনিয়াদারির শেষে আমার
নামাজ রোজার বদলাতে
চাই না বেহেশ্‌ত খোদার কাছে
নিত্য মোনাজাত করে।।

কায়েস যেমন লায়লি লাগি
লভিল মজনুঁ খেতাব,
যেমন ফরহাদ শিরির প্রেমে
হল দিওয়ানা বেতাব,
বে-খুদিতে মশগুল আমি
তেমনি মোর খোদার তরে।।

পুড়ে মরার ভয় না রাখে,
পতঙ্গ আগুনে ধায় ;
সিন্ধুতে মেটে না তৃষ্ণা,
চাতক বারি-বিন্দু চায় ;
চকোর চাহে চাঁদের সুধা,
চাঁদ সে আসমানে কোথায় ;
সুরুয থাকে কোন সুদূরে,
সূর্যমুখী তারেই চায় ;
তেমনি আমি চাহি খোদায়,
চাহি না হিসাব করে।।

১৭

মাঢ়-মিশ্র—দাদরা

আয় মরু-পারের হাওয়া,
নিয়ে যা রে মদিনায়।
জাত পাক মোস্তফার
রওজা মোবারক যেথায়।।

পড়িয়া আছি দুখে
মাশরেকি এই মুল্লুকে,
পড়ব মগরেবের নামাজ
কবে খানায়ে-কাবায়॥

হজরতের নাম তসবি করে,
যাব রে মিসকিন বেশে,
ইসলামেরই দীন-ই-ডঙ্কা
বাজল প্রথম যে দেশে॥

কাঁদব মাজার-শরিফ ধরে,
শুনব সেথায় কান পাতি,
হয়ত সেথা নবির মুখে
রব ওঠে 'য়্যা উম্মতি!'
আজও কোরআনের কালাম
হয়তো সেথা শোনা যায়॥

১৮

তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে॥
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে॥

কুল-মখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এল ঐ,
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, কে এল ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা পড়ে লুটে, —কে এল ঐ,
পড়ে দরুদ ফেরেশতা,
বেহেশতে সব দুয়ার খোলে॥

মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
'এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই' কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ নিল যে জন,

বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবি,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলরোলে॥

১৯

মিশ্র খাম্বাজ—কার্ফা

সৈয়দে মক্কি মদনি
আমার নবি মোহাম্মদ।
করুণা-সিন্ধু খোদার বন্ধু
নিখিল মানব-প্রেমাস্পদ॥

আদম নূহ ইবরাহিম দাউদ
সোলেমান মুসা আর ঈসা,
সাক্ষ্য দিল আমার নবির,
তাদের কালাম হ'ল রদ॥

যাঁহার মাঝে দেখল জগৎ
ইশারা খোদার নূরের,
পাপ দুনিয়ায় আনল যে রে
পুণ্য বেহেশতি সনদ॥

হায় সেকান্দর খুঁজল বৃথাই
আব-হায়াত এই দুনিয়ায়,
বিলিয়ে দিল আমার নবি
সে সুধা মানব সবায়।

হায় জুলেখা মজল বৃথাই
ইউসোফের ঐ রূপ দেখে
দেখলে আমার নবির সুরত
যোগীন হত ভস্ম মেখে।
শুনলে নবির শিরিন জবান,
দাউদ মাগিত মদদ॥

ছিল নবির নূর পেশানিতে,
তাই ডুবল না কিশতি নূহের,
পুড়ল না আগুনে হজরত
ইবরাহিম সে নমরুদের,
বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ করে নবির পদ ;
দোজখ আমার হারাম হল
পিয়ে কোরানের শিরিন শহদ॥

২০

আশাবরী পিলু—কার্ফা

রাখিসনে ধরিয়া মোরে,
ডেকেছে মদিনা আমায়।
আরফাত-ময়দান হতে
তারি তকবির শোনা যায়॥

কেটেছে পায়ের বেড়ি,
পেয়েছি আজাদি ফরমান,
কাটিল জিন্দেগি বৃথাই
দুনিয়ার জিন্দান-খানায়॥

ফুটিল নবির মুখে
যেখানে খোদার বাণী,
উঠিল প্রথম তকবির
'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি,
যে দেশের পাহাড়ে মুসা
দেখিল খোদার জ্যোতি,
যাব রে যাব সেইখানে,
রব না পড়িয়া হেথায়॥

যে দেশের ধূলিতে
আছে নবীজির চরণ-ধূলি,
সে ধূলি করিব সুর্মা,
চুমিব নয়নে তুলি,

যে দেশের বাতাসে আছে
নবিজির দেহের খোশবু,
যে দেশের মাটিতে আছে
নবিজির দেহ মিশে হায়॥

খেলেছে যেথায় ফাতেমা,
খেলেছে হাসান ও হোসেন,
যাব সেই বেহেশ্‌তে ধরার,
খোদার ঐ ঘর কা'বা যথায়।

২১

জংলা—দাদ্‌রা

দরিয়ায় ঘোর তুফান, পার কর নাইয়া।
রজনী আঁধার ঘোর, মেঘ আসে ছাইয়া॥

যাত্রী গুনাহ্‌গার জীর্ণ তরণী,
অসীম পাথারে কাঁদি পথ হারাইয়া॥

হে চির কাণ্ডারী,
পাপে তাপে বোঝাই তরী,
তুমি না করিলে পার,
পার হব কেমন করি।
সুখ-দিনে ভুলে থাকি,
বিপদে তোমারে স্মরি,
ডুবাবে কি তব নাম,
আমারে ডুবাইয়া॥

মার কাছে মার খেয়ে
শিশু যেমন ডাকে,
যত দাও দুখ শোক,
ততই ডাকি তোমাকে।

জানি শুধু তুমি আছ,
আসিবে আমার ডাকে,
তোমারি এ তরী প্রভু,
তুমি চল বাহিয়া ॥

২২

কাফি-মিশ্র—দাদ্‌রা

ঝরা ফুল দলে কে অতিথি
সাঁঝের বেলায় এলে কানন-বীথি ॥

চোখে কি মায়া
ফেলেছে ছায়া
যৌবন-মদির দোদুল্ কায়া।

তোমার ছোঁওয়ায় নাচন লাগে
দখিন হাওয়ায়,
লাগে চাঁদের স্বপন বকুল চাঁপায়,
কোয়েলিয়া কুহরে কূ কূ গীতি ॥

২৩

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কার্ফা

কে এলে মোর ব্যথার গানে
গোপন লোকের বন্ধু গোপন।
নাইতে আমার গানের ধারায়
এলে্ সুরের মানসী কোন্ ॥

গান গেয়ে যাই আপন মনে
সুরের পাখি গহন বনে,
সে সুর বেঁধে কার নয়নে,
জানে শুধু তারি নয়ন ॥

কে গো তুমি গন্ধ–কুসুম,
গান গেয়ে কি ভেঙেছি ঘুম,
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি মোর গানের স্বপন ॥

সুরের গোপন বাসর–ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন ॥

২৪

চিত্রা–গৌরী—ঠুংরী

রবে না এ বৈকালী ঝড় সন্ধ্যায়।
বহিবে ঝিরিঝিরি চৈতালী বায় ॥

দুপুরে যে ধরেছিল দীপক তান
বেলাশেষে গাহিবে সে মূলতানে গান,
কাঁদিবে সে পূরবীতে গোধূলি–বেলায় ॥

নৌবতে বাজিবে গো ভীম-পলশ্রী,
উদাস পিলুর সুরে ঝুরিবে বাঁশি,
বাজিবে নূপুর হয়ে তটিনী ও পায় ॥

আলেয়া

[নাটিকা]

নাট্য-নিকেতনে অভিনীত
পৌষ ১৩৩৮

উৎসর্গ

নট-রাজের চির-নৃত্য-সাথী
সকল নট-নটীর নামে
'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম।

এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হতে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী—চিরকালের নর-নারী প্রতীক—এই আগুনে দগ্ধ হলো, তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।

তিনটি পুরুষ

মীনকেতু—রূপ-সুন্দর।
চন্দ্রকেতু—মহিমা-সুন্দর, ত্যাগ-সুন্দর।
উগ্রাদিত্য—শক্তি-মাতাল।

তিনটি নারী

কৃষ্ণা—চিরকালের ব্যর্থ-প্রেম নারী, জীবনে সে কাউকে ভালোবাসতে পারলে না—এই তার জীবনের চরম দুঃখ।

জয়ন্তী—যে-তেজে যে-শক্তিতে নারী রানি হয়, নারীর সেই তেজ সেই শক্তি।

চন্দ্রিকা—চিরকালের কুসুম-পেলব প্রাণ-চঞ্চল নারী, যে শুধু পৌরুষ-কঠোর পুরুষকে ভালোবাসতে চায় ! মরুভূমির পরে যে বনশ্রী, সংগ্রামের শেষে যে কল্যাণ, এ তাই। এরই তপস্যায় পশু-নর মানুষ হয়, মৃত্যু-পথের পথিক প্রাণ পায়। ...

নারীর হৃদয়—তাদের ভালোবাসা কুহেলিকাময়। এও এক আলেয়া। এ যে কখন কাকে পথ ভোলায়, কখন কাকে চায়, তা চির-রহস্যের তিমিরে আচ্ছন্ন।

যাকে সে চিরকাল অবহেলা করে এসেছে, —তাকেই সে ফিরে পেতে চায় তার চলে যাওয়ার পরে। যাকে যে চিরকাল চেয়েছে—সেই তখন তার চলে-যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর পিছনে পড়ে যায়।

পুরুষও তেমনি হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে তার মানসীকে খুঁজে ফেরে। তাই তার কাছে আজকার সুন্দর, কাল হয়ে ওঠে বাসি। হৃদয়ের এই তীর্থ-পথে তার যাত্রার আর শেষ নেই। তাই সে এক মন্দিরে পূজা নিবেদন করে আর মন্দিরের বেদিতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

হৃদয়ের এই রহস্যই মানুষকে করেছে চির-রহস্যময়, পৃথিবীকে করেছে বিচিত্র-সুন্দর।

'আলেয়া' তারির ইঙ্গিত।

কুশীলবগণ

মীনকেতু		গান্ধার-রাজ
চন্দ্রকেতু		ঐ সেনাপতি
কৃষ্ণা		ঐ প্রধানা মন্ত্রী
কাকলি	...	ঐ প্রধানা গায়িকা
রঙ্গনাথ	...	ঐ বয়স্য
মধুশ্রবা	...	ঐ সভা-কবি
জয়ন্তী	...	যশোল্মীরের রানি
চন্দ্রিকা	...	ঐ কনিষ্ঠা সহোদরা
উগ্রাদিত্য	...	ঐ সেনাপতি

সৈন্যগণ, প্রমোদ-উদ্যানের সুন্দরীগণ, যোগিনীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

[অন্ধকার নিশীথিনী। আলেয়ার আলো মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিভিয়া যাইতেছে। দিশেহারা পথিক তাহারি পিছনে ছুটিয়া পথ হারাইতেছে। ...

আলেয়ার নৃত্য ও তাহারি অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে দিশেহারা পথিকের গীত।]

[গান]

পথিক :

নিশি নিশি মোরে ডাকে সে স্বপনে।
নিরাশার আলো জ্বালিয়া গোপনে॥
জানি না মায়াবিনী কি মায়া জানে,
কেবলি বাহিরে পরান টানে,
ঘুরে ঘুরে মরি আঁধার গহনে॥

শত পথিকে ও রূপে ছল হানে,
অপরূপা শত রূপে শত গানে।
পথে পথে বাজে তাহারি বাঁশি,
সে সুরে নিখিল-মন উদাসী,
দহে জাদুকরী বিধুর দহনে॥

[গান শেষ করিয়া পথিকের প্রস্থান।]

[গান ও নৃত্য করিতে করিতে দুইটি প্রজাপতির প্রবেশ।]

[গান]

প্রজাপতিদ্বয় :

দুলে আলো শতদল ঝলমল ঝলমল।
চলো লো মেলি পাখা রঙিন লঘু চপল॥
যদি অনল-শিখায় এ পাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি—ভালোবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল॥
কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বেঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল— ফুলঝরা বনতল॥

চলিতে ফুল দলি, চাহে যে তারে ছলি
সেই সে পথে চলি, যে পথে আলেয়া ছল॥

[গীত-শেষে প্রজাপতি দুইটি আলেয়ার নিকট যাইতেই আলেয়া নিভিয়া গেল। আলেয়া নিভিয়া যাওয়ার সাথে সাথে কয়েকটি রক্ত-বাস পুষ্পতনু কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রজাপতি দুইটি তাহাদের দেখিয়া তাহাদের দিকে উড়িয়া গেল। প্রজাপতি ও সেই কিশোরীদের গান।]

[গান]

কিশোরীরা : মোরা ফুটিয়া বঁধু
হেরো তোমারি আশায়।

প্রথম কিশোরী : আমি অনুরাগ-রাঙা
আমি গোলাব-শাখায়॥

দ্বিতীয় কিশোরী : বন-কুন্তলে গরবী
আমি কানন-করবী।

তৃতীয় কিশোরী : আমি সরসী-কমলা
আমি ষোড়শী কমলা
চতুর্থ কিশোরী : আমি চম্পক খোঁপায়॥

প্রজাপতিদ্বয় : নিভিল আলেয়া-আলো পথ চলিতে,
তোমরা আসিলে কি গো মন ছলিতে।

কিশোরীরা : মোরা অনির্বাণ-শিখা দীপ্তিমতী,
আমরা কুসুম রাঙা আমরা জ্যোতি।

প্রজাপতিদ্বয় : মোরা চাহি না কো প্রেম, চাহি
মোহিনী মায়ায়॥

[গীত-শেষে প্রজাপতি দুইটি ও কিশোরীগণ অন্ধকারের যবনিকা ঠেলিয়া উষার দীপ্তি দেখাইয়া অন্যপথে চলিয়া গেল।]

প্রথম অঙ্ক

[গান্ধার-রাজের প্রমোদ-উদ্যান ও দর্‌দালান, পশ্চাতে পর্বতমালা। পর্বতগাত্র বাহিয়া ঝর্নাধারা বহিয়া যাইতেছে। অনতিদূরে দেখা যাইতেছে গান্ধার রাজপ্রাসাদ—রুধির-পালঙ্ক প্রস্তরের ... রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছে। পর্বত-চূড়ায় পাণ্ডুর-গণ্ড কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ। ধীরে ধীরে উষার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিতেছে। ঝর্নাধারায় সেই রঙ প্রতিফলিত হইয়া গলিত রামধনুর মতো সুন্দর দেখাইতেছে। ... প্রমোদ-উদ্যানের অলিন্দে বাহু উপাধান করিয়া নিশি-জাগরণ-ক্লান্ত সম্রাটের প্রমোদ-সঙ্গিনী তরুণীরা-কিশোরীরা স্খলিত অঞ্চলে ঘুমাইতেছে। সহসা রাজপুরীর তোরণদ্বারে প্রভাতী সুরে বাঁশি ফুকারিয়া উঠিল। ঘুমন্ত তরুণীর দল সচকিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া তন্দ্রালস করে তাহাদের বসনভূষণ সম্বৃত করিতে লাগিল।]

[ভোরের হাওয়ার গান ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ]

[গান]

ভোরের হাওয়া :

পোহাল পোহাল নিশি খোলো গো আঁখি।
কুঞ্জ-দুয়ারে তব ডাকিছে পাখি।
ঐ বংশী বাজে দূরে শোনো ঘুম-ভাঙানো সুরে,
খুলি দ্বার বঁধুরে লহ্ গো ডাকি॥

[প্রস্থান]

[গান]

সুন্দরীরা :

ভোরের হাওয়া, এলে ঘুম ভাঙাতে কি
চুম হেনে নয়ন-পাতে।
ঝিরিঝিরি ধীরিধীরি কুণ্ঠিত ভাষা
গুণ্ঠিতারে শুনাতে॥
হিম-অঞ্জলি মাজি তনুখানি
ফুল-অঞ্জলি আনো ভরি দুই পাণি,
ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি—

বিশ্ব-সুষমা-সভাতে॥

[সহসা শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। প্রধানা গায়িকা কাকলি গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।]

[গান]

কাকলি :

ফুল কিশোরী ! জাগো জাগো, নিশি ভোর।
দুয়ারে দখিন-হাওয়া—খোলো খোলো পল্লব-দোর॥
জাগাইয়া ধীরে ধীরে যৌবন তনু-তীরে
চলে যাবে উদাসী কিশোর॥

[প্রস্থান]

[গান]

সুন্দরীরা : চিনি ও নিঠুরে চিনি
পায়ে দলে মন জিনি
ভেঙো না ভেঙো না ঘুম-ঘোর।
মধুমাসে আসে সে যে ফুলবাস-চোর॥
[একটু পরেই হাসিতে হাসিতে সম্রাট মীনকেতু ও পশ্চাতে সভাকবি মধুশ্রবার প্রবেশ।]

মীনকেতু : (তরুণী কিশোরীদের কাহারো গালে, কাহারো অধরে তর্জনী দিয়া মৃদু টোকা দিতে দিতে, কাহারো খোঁপা খুলিয়া দিয়া, কাহারো বেণী ধরিয়া টানিয়া ফেলিতে ফেলিতে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া) সুন্দর ! কেমন কবি ?

কবি : শুধু সুন্দর নয় সম্রাট, অপরূপ ! ঐ লতার ফুল সুন্দর, কিন্তু এই রূপের ফুলদল অপরূপ !

মীনকেতু : (কবির পিঠ চাপড়াইয়া) সাধু কবি, সাধু ! সত্যই এ অপরূপ ! —জানো কবি, তাঁদের সকলেই আমার স্বদেশিনী নন, এঁরা শত দেশের শত-দল। আমার প্রমোদ-কাননে এঁদের সংগ্রহ করেছি বহু অনুসন্ধান করে। (পশ্চাতে পর্বত-গাত্রে প্রবাহিতা ঝর্না দেখিয়া) পশ্চাতে ওই উদ্দাম জলপ্রপাত, আর সম্মুখে এইরূপ-যৌবনের উচ্ছল ঝর্নাধারা—, মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, তৃষ্ণার্ত ভোগলিপ্সু পুরুষ, যৌবনের দেবতা। (পায়চারি করিতে করিতে) আমি চাই—আমি চাই—

কবি : 'আমরা জানি মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া'—

মীনকেতু : হাঁ, ঠিক বলেছ কবি, চোখ পুরে রূপ চাই, পাত্র পুরে সুরা চাই। (হঠাৎ হাসিয়া তরুণী ও কিশোরীদের কাছে গিয়া) তুই কে রে? — বস্‌রা গোলাব বুঝি? বাঃ, যেমন রঙ তেমনি শোভা, ঠোঁটে গালে লাল আভা যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। ... তুই—তুই বুঝি ইরানি নার্গিস? ... হাঁ, নার্গিস ফুলের পাপ্‌ড়ির মতোই তোর চোখ! ভুরু তো নয়, যেন বাঁকা তলোয়ার ; আর তার নিচেই ওই চকচকে চোখ যেন তলোয়ারের ধার! ওঃ, তাতে আবার কালো কাজলের শান দেওয়া হয়েছে! একবার তাকালে আর রক্ষে নেই! (বুকে হাত দিয়া) একেবারেই ইস্‌পার উস্‌পার! (অন্য দিক দিয়া) আহা, তুমি কে সুন্দরী? তুমি বুঝি বঙ্গের শেফালি! (কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) শেফালি ফুলের মতোই তোমার শোভা, শেফালি-বৃন্তের মতোই তোমার প্রাণ বেদনায় রাঙা! —আর তুমি? তুমি বুঝি সুদূর চীনের চন্দ্রমল্লিকা? তোমার এত রূপ, কিন্তু তুমি অমন ভোরের চাঁদের মতো পাণ্ডুর কেন? অ! তোমার বুঝি এদেশে মন টিক্‌ছে না? —তা কি করবে বলো, টিক্‌তেই হবে, না টিকে উপায় নেই! আমি যে তোমাদের চাই! গাও, গাও, মন টেকার গান গাও! যে-গান শুনে সকালবেলার ফুল বিকেলবেলার কথা ভুলে যায়, ভোরের নিশি সূর্যোদয়ের কথা ভোলে ; বনের পাখি নীড়ের পথ ভোলে—সেই গান।

[সুন্দরীদের গান ও নৃত্য]

[গান]

সুন্দরীরা :

যৌবন-তটিনী ছুটে চলে ছলছল্।
ধরণীর তরণী টলমল টলমল॥
কূলের বাঁধন খোল্
আয় কে দিবি রে দোল্,
প্রাণের সাগরে রোল ওঠে ঐ কল কল্॥
তটে তটে ঘট-কঙ্কণে নট-মল্লারে ওঠে গান,
মুখে হাসি বুকে শ্মশান।
আজিও তরুণী ধরা রঙে রূপে ঝলমল্,
রূপে রসে ঢলঢল্॥

[ম্লানমুখে কৃষ্ণার প্রবেশ]

মীনকেতু : ও কে? কৃষ্ণা? প্রধান মন্ত্রী—তারপর, এমন অসময়ে এখানে যে!

কৃষ্ণা : বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্যে আপনার আনন্দের বাধা হয়ে এসেছি, সম্রাট !

[সভাকবি এতক্ষণ এক ফুল হইতে আর এক ফুলের কাছে গিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন, কৃষ্ণার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন]

কবি : এ ফুল-সভায় তো রাজসভার মন্ত্রীর আসার কথা নয়, দেবী !

মীনকেতু : (হাসিয়া) ঠিক বলেছ কবি, যেমন আমি এখানে এসেছি মীনকেতু হয়ে—সম্রাট হয়ে নয়।

কৃষ্ণা : আমিও ফুলবনে আসি, কবি ! তবে তোমাদের মতো আয়োজনের আড়ম্বর নিয়ে আসিনে। আমি কৃষ্ণা, নিশীথিনী ! আমি নীরবে আসি,নীরবে যাই ! হয়তো-বা আমার চোখের শিশিরেই তোমাদের কাননের ফুল ফোটে ! (সম্রাটের দিকে তাকাইয়া) আমি তাহলে যেতে পারি, সম্রাট !

মীনকেতু : রাজ্যের ব্যাপার রাজসভাতেই বলো কৃষ্ণা, এখানে নয়। কিন্তু ! এসেছ যখন, গায়ে একটু ফুলেল হাওয়ার ছোঁয়াচ না-হয় লাগিয়েই গেলে। ওঃ, ভুলে গিয়েছিলুম, ওতে বোধ হয় তোমার মন্ত্রীত্বের মুখোশটা খুলে কৃষ্ণার মুখোশ বেরিয়ে পড়বে ! রাত্রির আবরণ খুলে চাঁদের আভা ফুটে উঠ্‌বে।

কৃষ্ণা : (ধীর স্থির কণ্ঠে) সম্রাটের কি এটা জানা উচিত নয়, যে, তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর সাথে এই নটীদের সাম্‌নে এই ব্যবহার আমাদের সকলেরই মহিমাকে খর্ব করে।

[সম্রাটের ইঙ্গিত তরুণী ও কিশোরীর দল অভিনন্দন করিয়া চলিয়া গেল]

মীনকেতু : (কৃষ্ণার হাত ধরিয়া) ওরা নটি নয়, কৃষ্ণা, ওরা আমার প্রমোদ-সহচারী। আমি রাজার মহিমার মুখোশ খুলে এ প্রমোদ-কাননে আসি ওদের নিয়ে আনন্দ কর্‌তে।

কৃষ্ণা : (হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া) আমি জানি সম্রাট, যে, নারী জাতিকে অবমাননা করবার জন্যই আমায়, একজন নারীকে—আপনার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রূপ করেছেন ! অথবা এ হয়তো আপনার একটা খেয়াল ! কিন্তু সম্রাট, আপনার যা খেলা, তা হয়তো অন্যের মৃত্যু !

মীনকেতু : (হাসিয়া) তুমি যে আজকাল একটুকু রহস্যও সহ্য করতে পারো না কৃষ্ণা। যে দাড়িভরা হাঁড়িমুখের ভয়ে দেশ থেকে বুড়োগুলোকে তাড়ালুম, তারা দেখ্‌ছি দল বেঁধে তোমার মনে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে চোখ তুলতেই দেখব, তোমার মুখে দাড়ির বাজার বসে গেছে।

কবি : বুড়োর দাড়ি এমনি করেই প্রতিশোধ নেয় সম্রাট। মুখের দাড়ি মনে গিয়ে বোঝা হয়ে ওঠে।

গান

এসেছে নবনে বুড়ো যৌবনেরি রাজ-সভাতে।
কুঁজো-পিঠ বই বয়ে হায় কমল-ধরা ঠুঁটো হাতে।
ভরিল সৃষ্টি এবার দৃষ্টি খাটো ষষ্টি-ধরা জ্যেষ্ঠতাতে
নাতি সব সুপ্‌নখার নাকি কথার ভূষুণ্ডি মাঠ
আঁধার রাতে
দাওয়াতে টান্‌তে হুঁকো, উনুনে-মুখো,
নড়েও না কো ন্যাজ মলাতে।
ভাই সব বল হরি, কল্‌সি দড়ি, ঝুলিয়েছে
নিজেই গলাতে।।

মীনকেতু : (হাসিয়া) সত্য বলেছ মধুশ্রবা, বৃদ্ধত্ব আর সংস্কারকে তাড়ানো তত সহজ নয় দেখছি। ওরা কোন্ সময় যে শ্রীজ্ঞানামৃত বিতরণের লোভ দেখিয়ে তরুণ-তরুণীর মন জুড়ে বসে, তা দেবা ন জানন্তি। আমি যৌবনের হাট বসাব বলে সাম্রাজ্যের বাইরে পিঁজরাপোল করে বুড়ো মনের লোকগুলোকে রেখে এলুম, তারা কি আবার ফিরে আস্‌তে আরম্ভ করেছে? (কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া) দেখো কৃষ্ণা, আমি তরুণীদের কাছে কিছুতেই গম্ভীর হতে পারিনে। সুন্দরের কাছে রাজমহিমা দেখানোর মতো হাসির জিনিস আর কিছু কি আছে? ধরো, এই ফোটা ফুলের আর ওই সব উন্মুখ-যৌবনা কিশোরীদের কাছে এমন সুন্দর সকালটা যদি রাজ্যের কথা কয়ে কাটিয়ে দিই—ও কি কৃষ্ণা, হাস্‌ছ?

কৃষ্ণা : মার্জনা করবেন সম্রাট! আমিও আপনার ঐ আনন্দ হাসির তরঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে যাই, ভুলে যাই আপনি আমাদের মহিমান্বিত সম্রাট; আর আমি তাঁর প্রধান মন্ত্রী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) মনে হয় আপনি আমার সেই ভুলে-যাওয়া দিনের শৈশব-সাথী!

কবি : সম্রাট, একজনের মুখ যখন আর একজনের কর্ণমূলের দিকে এগিয়ে আসে, তখন লজ্জার দায় এড়াতে তৃতীয় ব্যক্তির সেখান থেকে সরে পড়াই শোভন এবং রীতি। [প্রস্থান]

মীনকেতু : (হাসিয়া কবির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া—কৃষ্ণার পানে ফিরিয়া) তুমি আমায় জানো কৃষ্ণা, আমি সিংহাসনে যখন বসি, তখন আমি ঐ—কেবল তোমরা যা বলো—মহিমময় সম্রাট, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ

করি তখন আমি রক্ত-পাগল সেনানী, কিন্তু সুন্দর ফুলবনে আমিও সুন্দরের ধেয়ানী, হয়তো-বা কবিই। যেখানে শুধু তুমি আর আমি, সেখানে তুমি আমায় সেই ছেলেবেলার মতো করেই ডাক-নাম ধরে ডেকো!

কৃষ্ণা : জানি না, তুমি কি! এতদিন ধরে তো তোমায় দেখেছি, তবু যেন তোমায় বুঝতে পারলুম না। আকাশের চাঁদের মতোই তুমি সুদূর, অমনি জ্যোৎস্নায় কলঙ্কের মাখামাখি।

মীনকেতু : তবুও ওই সুদূর কলঙ্কী-ই তো পৃথিবীর সাত সাগরকে দিবা-রাত্রি জোয়ার-ভাটার দোল খাওয়ায়!

কৃষ্ণা : সত্যিই তাই। এম্‌নি তোমার আকর্ষণ। (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা মীনকেতু, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলে—মনে পড়ে?

মীনকেতু : (হাসিয়া) চাঁদ কাকে ভালোবাসে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা : ও কলঙ্কী, ও হয়তো কাউকেই ভালোবাসে না।

মীনকেতু : (হাততালি দিয়া) ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, ওই কলঙ্কীকেই সবাই ভালোবাসে, ও কাউকে ভালোবাসে না!

[গান করিতে করিতে একটি মেয়ের প্রবেশ]

[গান]

মেয়েটি :

কেন ঘুম ভাঙালে প্রিয়
যদি ঠেলিবে পায়ে॥
বৃথা বিকশিত কুসুম কি যাবে শুকায়ে।
একা বন-কুসুম ছিনু বনে ঘুমায়ে॥
ছিল পাশরি আপন বেভুল কিশোরী হিয়া
বধূর বিধুর যৌবন কেন দিলে জাগায়ে।
প্রিয় গো প্রিয়—
আকাশ বাতাস কেন ব্যথার রঙে তুমি
দিলে রাঙায়ে॥

মেয়েটি : রাজা, কাল রাতে তোমার অনুরাগ দিয়ে আমায় বিকশিত করেছিলে। আমার সেই বিকশিত ফুলের অর্ঘ্য তোমায় দিতে এসেছি। তুমি বলেছিলে ...

মীনকেতু : (হাসিয়া) সুন্দরী, রাত্রে তোমায় যে-কথা বলেছিলুম, তা রাত্রের জন্যই সত্য ছিল। দিনের আলোকেও তা সত্য হবে এমন কথা তো বলিনি। রাত্রে যখন কাছে ছিলে, তখন তুমি ছিলে কুমুদিনী, আমি

ছিলুম চাঁদ। এখন দিন যখন এল, তখন আমি হলুম সূর্য, আমি এখন সূর্যমুখীর, কমলের! যাও! চলে যাও! বিকশিত হয়েছ, এখন সারাদিন চোখ বুঁজে থেকে সন্ধেবেলায় ঝরে পড়ো! যাও!

[ম্লানমুখে দু'হাতে চোখ ঢাকিয়া মেয়েটির প্রস্থান]

কৃষ্ণা : (আহত স্বরে) মীনকেতু!

(মীনকেতু হো হো করে হেসে উঠল।)

[গান করিতে করিতে আর একটি মেয়ের প্রবেশ। নাম তার মালা।]

[গান]

মালা :

চাঁদিনী রাতে কানন–সভাতে আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
নিবিড় সুখে সয়েছি বুকে তোমার হাতের সূচীর জ্বালা॥
এখনো জাগে লোহিত রাগে
রঙিন গোলাবে তাহারি ব্যথা,
তোমার গলে দুলিব বলে
দিয়েছি কূলে কলঙ্ক কালা॥
যদি ও–গলে নেবে না তুলে
কেন বধিলে ফুলের পরান,
অভিমানে হায় মালা যে শুকায়,
ঝরে ঝরে যায় লাজে নিরালা॥

মীনকেতু : তুমি আবার কে সুন্দরী?

মালা : সম্রাট, চিনতে পারছ না? আমার নাম মালা! কাল সারারাত যে তোমার গলা জড়িয়ে ছিলুম। আমি ছিলুম কাঁটাবনের ছড়ানো ফুল, তুমি তো আমায় মালা করে সার্থক করেছ!

মীনকেতু : আঃ, তুমি যদি সার্থকই হয়ে গেলে, তবে আবার কেন? এখন তোমার সুতো থেকে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়ুক। ফুল ফুটলে ওকে যেমন মালা গেঁথে সার্থক করতে হয়, তেমনি রাত্রিশেষে সে বাসিমালা ফেলেও দিতে হয়!

[বুক চাপিয়া ধরিয়া মালার প্রস্থান]

কৃষ্ণা : উঃ! আর আমি থাকতে পারছিনে! মীনকেতু! তুমি কি?

মীনকেতু : হাঁ, ওই ওর নিয়তি। রাত্রের বাসিফুলকে রাত্রিশেষেও যে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তার সহায়–সম্বল তো নেই–ই, তার যৌবনও মরে গেছে।

কৃষ্ণা : নিষ্ঠুর! তোমার কি হৃদয় বলে—মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই?

মীনকেতু : (হাসিয়া) আমি মনুষ্যত্বের পূজা করি না, কৃষ্ণা ! আমি যৌবনের পূজারী ! ফুল আর হৃদয় দলে চলাই আমার ধর্ম।

কৃষ্ণা : তোমায় দেখে বুঝতে পারি মীনকেতু, কেন শাস্ত্রে বলে পাপের দেবতা মারের চেয়ে সুন্দর এ বিশ্বে কেউ নেই।

মীনকেতু : (হাসিয়া কৃষ্ণার গালে তর্জনী দিয়া মৃদু আঘাত করিতে করিতে) ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, মারের চেয়ে, মিথ্যার চেয়ে, মায়ার চেয়ে কি সুন্দর কিছু আছে? চাঁদে কলঙ্ক আছে বলেই তো চাঁদ এত আকর্ষণ করে, তোমার কপালের ঐ কালো টিপটাই তো মুখের সমস্ত লাবণ্যকে হার মানিয়েছে। রামধনু মিথ্যা বলেই তো অত সুন্দর ! যৌবন ভুল করে পাপ করে বলেই তো ওর উপর এত লোভ, ও এত সুন্দর !

[মুখে-চোখে বিলাস-ক্লান্তির চিহ্ন-যুক্তা মদোন্মত্তা এক নারীর টলিতে টলিতে প্রবেশ]

[গান]

মদালসা :

কেন রঙিন নেশায় মোরে রাঙালে।
কেন সহজ ছন্দে যদি ভাঙালে॥
শীর্ণা তনুর মোর তটিনীতে কেন
আনিলে ফেনিল জল-উচ্ছ্বাস হেন,
পাতাল-তলের ক্ষুধা মাতাল এ যৌবন
মদির-পরশে কেন জাগালে॥

কৃষ্ণা : ও কুৎসিত নারীকে এখনি তাড়াও এখান থেকে ! ও কে তোমার ?

মীনকেতু : (হাসিয়া) তুমি যে পাপের মিথ্যার কথার কথা বলছিলে, ও হচ্ছে তারই অপদেবতা। তোমাদের দেবতার মন্দির থেকে ফেরবার পথে ঐ অপদেবতাকে দেখলে ওকেও নমস্কার করিতে ভুলিনে, কৃষ্ণা ! ওর বাঁকা চোখ তোমার সত্যের সোজা চোখের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

কৃষ্ণা : উঃ ভগবান ! (বসিয়া পড়িল।)

মীনকেতু : (মেয়েটির দিকে তাকিয়ে) তুমি মদালসা না বসন্তসেনা? ওরির একটা-কিছু হবে বুঝি? কিন্তু আজ অতিরিক্ত মদ খেয়েছ এবং অলসও যে হয়েচ তা চলা দেখেই বুঝেছি।

মদালসা : কি প্রাণ, আজ যে ফুরসৎই নেই? (কৃষ্ণাকে দেখে) একে আবার কোথা থেকে আমদানি করলে? আমরা কি চিরকালের জন্যে রপ্তানি হয়ে গেলুম? আচ্ছা, এ রাজ্যি থাকবে না বেশি দিন। দেখি প্রাণ, তখন কার দাঁড়ে গিয়ে যব-ছোলা খাও !

মীনকেতু : আহা রাগ করো কেন সুন্দরী, মাঝে মাঝে পুণ্য করে পাপেরও মুখ বদ্‌লে নিতে হয়, এ-সব পুণ্যাত্মারা যখন বাসি হয়ে উঠ্‌বেন তখন তোমারই দুয়ারে আবার যাব।

[মদালসার টলিতে টলিতে প্রস্থান]

[প্রধানা গায়িকা কাকলি ও সখীদের গান]

[গান]

কাকলি ও সখীরা :

ধরো ধরো ভরো ভরো এ রঙিন পেয়ালি।
আঁধার এ নিশীথে জ্বালো জ্বালো জ্বালো দেয়ালি॥
চাঁদিনী যবে মলিন প্রখর আলোকে
প্রদীপ নব জ্বালো গো চোখে,
নতুন নেশা লয়ে জাগো জাগো খেয়ালি॥
ভোলো ভোলো রাতের স্বপন,
প্রভাতে আনো নব জীবন !
শতদলে আঁখি-জলে করো গোপন,
হায় বেদনা ভরে কার তরে
বৃথাই খেয়ালি॥

মীনকেতু : ঠিক সময় এসেছ তোমার কাকলি। তোমার যৌবনের গান আর এদের যৌবনের প্রতীক্ষাই করছিলুম। এই ফুলফোঁটার গান শুনে বালিকা কিশোরী হয়, তরুণী যৌবন পায়, রাতের কুঁড়ি দিনের ফুল হয়ে হাসে, এই আমার রাজ্যের জাতীয় সঙ্গীত।

কবি : ঠিক রাজ্যের নয় সম্রাট, এ আমাদের যৌবনের জাতীয় সঙ্গীত।

মীনকেতু : (কবিকে সুরাপাত্র আগাইয়া দিয়া) নাও কবি, একটু অমৃত পান করে নাও, তোমার কণ্ঠে আরো—আরো অমৃত ঝরে পড়ুক। (কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া) কিন্তু কৃষ্ণা, তুমি অমন ম্লান মুখে বসে থেকো না। উৎসবের সহস্র প্রদীপের মাঝে একটা প্রদীপও যদি মিট্‌মিট্ করতে থাকে—

কৃষ্ণা : (মীনকেতুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) তখন তাকে একেবারে নিবিয়ে দেওয়াই সঙ্গত, সম্রাট !

মীনকেতু : (সুরার পাত্র কৃষ্ণার দিকে আগাইয়া দিয়া) আমি প্রদীপ নিবাই না কৃষ্ণা, ভালো করে জ্বেলে তুলে তার আলোতে গিয়ে জাঁকিয়ে বসি। এই নাও, একটু স্নেহ-পদার্থ ঢেলে নাও, নিবু নিবু প্রদীপ দপদপ করে জ্বলে উঠবে।

কৃষ্ণা : (পিছাইয়া গিয়া) আমি দীপশিখা নই সম্রাট, আমি কৃষ্ণা, নিশীথিনী। আর-ও সুধা আপনারাই পান করুন।

কবি : বোতলকে মাতাল হতে কে দেখেছে কবে, সম্রাট! ওদের যে অন্তরে বাহির সুধা, ওদের সুধার দরকার করে না।

মীনকেতু : না হে কবি, উনি হচ্ছেন, 'নীলকণ্ঠী'—শিব তো বল্‌তে পারিনে, শিবা বল্‌ব? নাঃ, তাহলে হয়তো এখনি বিশ্রী তান ধরে দেবে। কিন্তু কৃষ্ণা, তুমি যদি নিশীথিনীই হও আমি তো কলঙ্কী চাঁদ। চাঁদ উঠ্‌লে তো নিশীথিনীর মুখ অমন মন্ত্র-মুখো হয়ে থাকে না।

কৃষ্ণা : কিন্তু আজকের এ চাঁদ দ্বিতীয়ার চাঁদ, সম্রাট! এ চাঁদের কিরণে নিশীথিনীর মুখে যে হাসি ফুটে ওঠে, তা কান্নার চেয়েও করুণ।

কবি : বাবা, অমন ষোল্‌কলায় পূর্ণ চাঁদও দ্বিতীয়বার চাঁদ হয়ে গেল! অঃ! ওর চৌদ্দটা কলাই বুঝি আজ অন্ধকারে ঢাকা!

কৃষ্ণা : হাঁ কবি, সময় সময় চাঁদের কলঙ্কটা এমনি বিপুল হয়ে ওঠে! (সম্রাটের দিকে তাকিয়ে) ও কলঙ্ক নয় সম্রাট, ও হচ্ছে দুঃখের পৃথিবীর ছায়া।

মীনকেতু : অঃ, তুমি শুধু নিশীথিনীই নও—তুমি কুয়াশা! এই ক্ষীণ দ্বিতীয়ার চাঁদের জ্যোৎস্নাটুকুকেও মলিন না করে ছাড়বে না! যাক, ওটাও আমার মন্দ লাগে না। সুন্দরের মুখে হাসি যেমন মানায় ও চোখের মরীচিকাও তার চেয়ে কম মানায় না। (দূরে সূর্যোদয়) ওই সূর্য উঠ্‌ছে, ওই সূর্য—ও যেন দুঃখের, জরার প্রতীক। ওর খরতাপে অশ্রু শুকায়, ফুল ঝরে, তরুণী উষার গালের লালি যায় ম্লান হয়ে, রাতের চাঁদ হয়ে ওঠে দীপ্তিহীন। নাঃ, আজকের মদে জলের ভাগই বোধ হয় বেশি ছিল—নেশাটা ক্রমেই পান্‌সে হয়ে আসছে। কই কবি, তোমার সেনাদল গেল কোথায়?

[গান]

তরুণীরা : আধো ধরণী আলো আধো আঁধার।
কে জানে দুখ-নিশি পোহাল কার॥

আধো কঠিন ধরা, আধেক জল,
আধো মৃণাল-কাঁটা আধো কমল,
আধো সুর, আধো সুরা,—বিরহ বিহার॥

আধো ব্যথিত বুকে আধেক আশা,
আধেক গোপন, আধেক ভাষা।
আধো ভালবাসা আধেক হেলা,
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত–বেলা,
আধো রবির আলো আধো নীহার।।

[কবি ছাড়া আর সকলের প্রস্থান]

মীনকেতু : কবি।

কবি : যাচ্ছি সম্রাট। আকাশের দেবী ও মাটির মানুষের যখন নিরিবিলি দুটো কথা কওয়ার জন্য মুখ চাওয়া–চাওয়ি করে তখন সব চেয়ে মুশকিল হয় ত্রিশঙ্কুর। লজ্জার দায় এড়াতে বেচারা স্বর্গেও উঠে যেতে পারে না, পৃথিবীতেও নেমে আসতে পারে না।

[প্রস্থান]

মীনকেতু : (চলে যেতে যেতে ফিরে এসে) যার আগে যাওয়ার কথা, সে–ই যে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা : আমি ভাবছি সম্রাট, এই ফুল দলে চলার কি কোনো জবাবদিহি করতে হবে না কারুর কাছে? এর কি সত্যিই কোনো অপরাধ নেই?

মীনকেতু : নেই কৃষ্ণা, কোনো অপরাধ নেই। আর যদি থাকেই তো সে অপরাধ আমার নয়,—সে অপরাধ এই চলমান পায়ের, আমার দৃপ্ত গতিবেগের। এই হচ্ছে চির–চঞ্চল যৌবনের চিরকালের রীতি, এই অপরাধে যৌবন যুগে যুগে অপরাধী। [প্রস্থান]

কৃষ্ণা : (সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া) নির্মম ! দস্যু ! (কৃতাঞ্জলিপুটে আকুল কণ্ঠে) তবুও তুমি সুন্দর—অপরূপ। কিন্তু একি ! কান্নায় আমার বুক ভেঙে আসছে কেন? ও তো আমার হৃদয়ের কেউ নয়, শুধু এই রাজ্যের রাজা। আমিও ওর কেউ নই। ও সম্রাট, আমি মন্ত্রী। তবু— এমন করে কেন? উঃ ! এ কোন মায়ামৃগ আমায় ছলনা করতে এল? (মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।)

[কাকলি আসিয়া নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, কাকলি গান করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণা উঠিয়া বসিল।]

[গান]

কাকলি : আঁধার রাতে কে গো একেলা।
নয়ন–সলিলে ভাসালে ভেলা।।

কি দুখে আজি যোগিনী সাজি
আপনারে লয়ে এ হেলা-ফেলা॥

সোনার কাঁকন ও দুটি করে
হেরো গো জড়ায়ে মিনতি করে।

ফেলিয়া ধুলায় দিও না গো তায়
সাধিছে নূপুর চরণ ধরে।
কাঁদিয়া কারে খোঁজে ওপারে
আজও যে তোমার প্রভাতবেলা॥

কৃষ্ণা : দেখেছিস কাকলি, এই তার দৃপ্ত পদরেখা। (পথ হইতে একটি পদদলিত রাঙা গোলাব তুলিয়া লইয়া) এই তার পায়ে-দলা রক্ত গোলাব, এমনি করে ফুল আর হৃদয় দলে সে তার পায়ের তলার পথ রক্ত-রাঙা করে চলে যায়।

কাকলি : কেন ভাই, আলেয়ার পিছনে ঘুরে মরছ? হৃদয় দলে চলাই যার ধর্ম, কেন—

কৃষ্ণা : তুই ভুল বুঝেছিস কাকলি! আমি ওর কথা ভেবে কষ্ট পাই নারী বলে। বন্ধু বলে। তবু ও আলো কেন যেন কেবলি টানতে থাকে। আমি প্রাণপণে বাধা দিই। মাঝে মাঝে হয়তো মনে হয়, ওই মিথ্যার পেছনে ঘোরার চেয়ে বুঝি বড় আনন্দ আমার জীবনে আর নেই। হৃদয়ের না হলেও ও তো শৈশবে বন্ধু ছিল। ... আচ্ছা কাকলি, তুই যে গান গাইলি এ কার কাছে শিখেছিস?

কাকলি : কবি মধুশ্রবার কাছে।

কৃষ্ণা : কবি মধুশ্রবা। এমন চোখের জলের গান সে লিখলে? সে যে আনন্দের পাখি, সে তো দুঃখ-বেদনাকে স্বীকারই করে না। সবাই দেখছি তাহলে আলেয়ার পেছনে ঘুরছে।

কাকলি : এ কথা আমিও কবিকে বলেছিলুম। সে হেসে বললে, কাঁটার মুখে যে ফুলের সার্থকতা আমি তাকেই দেখি, আমার বুকের তারগুলো ব্যথায় অত টনটন করে ওঠে বলেই তো হাতে এমন বীণা বাজে!

কৃষ্ণা : (চিন্তিত হইয়া) হুঁ, আমি বুঝেছি কাকলি। কবি এক-একদিন কেমন করে যেন আমার দিকে চায়। (একটু ভাবিয়া) কিন্তু সে তার কথার ঝড়ে মনের মেঘকে কেবলই দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঠেলে দেয়। ও-ই সব চেয়ে সুখী! কোনো কিছু দাবি করে না, কেবল দিয়েই ওর আনন্দ।

[চন্দ্রকেতুর প্রবেশ]

সেনাপতি, তুমি এখানে ! তুমি সীমান্ত রক্ষা করতে যাওনি? কাকলি তুই চল, আমি যাচ্ছি।

[কাকলির প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু : তুমি কোন সীমান্ত রক্ষার কথা বলছ কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা : তুমি কি জানো না, যশল্মীরের রানী জয়ন্তী গান্ধার রাজ্য আক্রমণ করেছে?

চন্দ্রকেতু : জানি কৃষ্ণা, শুধু আক্রমণ নয়, আমাদের সীমান্তরক্ষী সেনাদলকে পরাজিত করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কৃষ্ণা : আমাদের অপরাজেয় সেনাদল পরাজিত হলো একজন নারীর হাতে? আর তা জেনেও তুমি আজও রাজধানীতে বসে আছ?

চন্দ্রকেতু : আমার কর্তব্য আমি জানি কৃষ্ণা। নারীর বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিনে। আমার সহকারী সেনাপতিকে পাঠিয়েছি, শুনছি সে-ও নাকি পরাজিত হয়েছে।

কৃষ্ণা : আমি এ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, আমি জানতে চাই সেনাপতি, আমাদের অপরাজেয় সেনাদলের এই সর্বপ্রথম পরাজয়ের লজ্জা কার? কে এর জন্য দায়ী?

চন্দ্রকেতু : তুমি।

কৃষ্ণা : আমি !

চন্দ্রকেতু : হাঁ তুমি ! (ব্যথাক্লিষ্ট কণ্ঠে) আমি কোন সীমান্ত রক্ষা করব কৃষ্ণা ! জয়ন্তী গান্ধার সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করেছে, সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কতটুকু শক্তির প্রয়োজন? কিন্তু এ হৃদয়ের পূর্ব সীমান্ত যে আক্রমণ করেছে তার সাথে যে পারিনে।

কৃষ্ণা : (দৃপ্ত কণ্ঠে) সেনাপতি, আমি শুধু কৃষ্ণা নই, আমি এ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।

চন্দ্রকেতু : জানি কৃষ্ণা ! তুমি যখন রাজসভায় প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসো, তখন তোমায় অভিবাদন করি, কিন্তু যে তার অন্তরের বেদনার ভারে এই পথের ধলায় লুটিয়ে পড়ে, তার নাম হতভাগিনী কৃষ্ণা !

কৃষ্ণা : (চমকিত হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে) চন্দ্রকেতু, বন্ধু !

চন্দ্রকেতু : (আকুল কণ্ঠে) ডাকো কৃষ্ণা, সেনাপতি নয়, বন্ধু নয়, শুধু আমার নাম ধরে ডাকো। তোমার মুখে আমার নাম যেন কত যুগ পরে শুনলাম। আঃ ! নিজের নামও নিজের কানে এমন মিষ্টি শুনায় ! এমনি করে কৈশোরে তুমি আমার নাম ধরে ডাকতে, আর আমার রক্তে যেন আগুন ধরে যেত।

কৃষ্ণা : (ম্লান হাসি হাসিয়া) আজো তোমার মনে আছে সে কথা? আমারও মনে পড়ে চন্দ্রকেতু, একদিন তুমি, আমি আর মীনকেতু এই প্রমোদ-উদ্যানের পথে এক সাথে খেলা করেছি, তখনো রাজার সিংহাসন আর রাজ্যের দায়িত্ব এসে আমাদের আড়াল করে দাঁড়ায়নি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তখন কে জানত, এই পথেই আমাদের নতুন করে খেলা শুরু হবে। (একটু ভাবিয়া হাসিয়া) আমি মীনকেতুর পাশে বসে তাকে বল্‌তাম, তুমি রাজা, আমি রানি, ফিরে দেখতাম তুমি ম্লান মুখে চলে যাচ্ছ, আমার চাঁদনি রাত যেন বাদ্‌লা মেঘে ছেয়ে ফেল্‌ত।

চন্দ্রকেতু : সত্য বল্‌ছ কৃষ্ণা? আমার অশ্রু তোমার চাঁদনি রাতকে মলিন করেছে কোনোদিন তাহলে?

কৃষ্ণা : করেছে বন্ধু! তুমি আমার বুকে মাধবী রাতের পূর্ণ চাঁদের রূপে উদয় হওনি কোনোদিন, কিন্তু চোখে বাদল রাতের বর্ষাধারা হয়ে নেমেছ।

চন্দ্রকেতু : (উত্তেজিত কণ্ঠে) ধন্যবাদ, কৃষ্ণা! কিন্তু তোমার এও হয়তো মনে আছে যে, আমি শৈশবের সে খেলায় বারবার ম্লানমুখে ফিরেই আসিনি! একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলুম, তোমার বিরুদ্ধে, তোমার মীনকেতুর বিরুদ্ধে। তোমায় জোর করে ছিনিয়ে নিলুম, মীনকেতু যুদ্ধ করলে, কিন্তু আমার হাতে পরাজিত হলো। বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে তোমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, তুমি কাঁদছ। বুঝলুম, তুমি বিজয়ীকে চাও না— তুমি চাও তাকেই যার কাছে তুমি পরাজিতা লাঞ্ছিতা। তোমায় ফিরিয়ে দিলুম তোমার রাজার হাতে।

কৃষ্ণা : তুমি ভুল করেছ চন্দ্রকেতু! হয়তো সবাই এই ভুল করে। আমি মানি, মীনকেতুকে আমার ভালো লাগে। কিন্তু সে ভালো লাগা ভালোবাসা নয়। সিংহ দেখলে যেমন আনন্দ হয়, ভয় হয়, এও তেমনি। কিন্তু সে কথা থাক, সেদিন তোমার হাতে পরাজিত হয়ে মীনকেতু কি বলেছে, মনে আছে? সে হেসে বলেছিল, 'বন্ধু, আমি যদি কৃষ্ণাকে তোমার মতো করে চাইতুম, তাহলে আমিও তোমায় এমনি করে পরাজিত করতুম। যাকে চাইনে তার জন্যে যুদ্ধ করতে শক্তি আসবে কোত্থেকে!' সে আরো বলেছিল, 'চন্দ্রকেতু, আমি যদি সম্রাট হই, তোমাকে আমার সেনাপতি করব।'

চন্দ্রকেতু : সেনাপতি আমায় সে করেনি, আমি আমার শক্তিতে সেনাপতি হয়েছি। কিন্তু কৃষ্ণা, কি নিষ্ঠুর তুমি, ও-কথাগুলো তোমার মনে না করিয়ে দিলেও তো চলত।

কৃষ্ণা : দুঃখ কোরো না বন্ধু, তোমায় বুকের প্রেম দিতে পারিনি বলেই তো চোখের জল দিই। আমি নারী, আমি জানি, হৃদয়হীনতা দিয়ে হৃদয়কে যত আকর্ষণ করা যায়, তার অর্ধেকও হয়তো ভালোবাসা দিয়ে আকর্ষণ করা যায় না। আমি ভালোবাসা পাইনি, তুমিও ভালোবাসা পাওনি—এইখানেই তো আমরা বন্ধু! কিন্তু তুমি তো আমার চেয়েও ভাগ্যবান। আমি যে কাউকে ভালোবাসতেই পারলুম না। তুমি তো তবু একজনকে ভালোবাসতে পেরেছ!

চন্দ্রকেতু : দোহাই কৃষ্ণা, বন্ধু বোলো না। বোলো না! আমি চাই না তোমার কাছে ঐটুকু। বন্ধু মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে, হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। (হাত ধরিয়া) কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা : (ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া) কিন্তু তা তো হয় না চন্দ্রকেতু!

[গান করিতে করিতে কাকলির প্রবেশ]

[গান]

কাকলি : যৌবনে যোগিনী আর কতকাল
রবি অভিমানিনী।
ফিরে ফিরে গেল কেঁদে মধুযামিনী॥
লয়ে ফুলডালি এল বনমালি,
জ্বালিল আকাশ তারার দীপালি,
ভাঙিল না ধ্যান মন্দির-বাসিনী॥

কৃষ্ণা : আমি চললুম, রাজসভায় যাওয়ার সময় হলো, পথ ছেড়ে দাও!

চন্দ্রকেতু : আমি কোনো দিনই তোমার পথরোধ করে দাঁড়াইনি কৃষ্ণা। আজো দাঁড়াব না। আমি চিরকালের জন্য তোমার পথ থেকে সরে যাব। কিন্তু যাবার আগে আমার শেষ কথা বলে যাব।

কৃষ্ণা : কাকলি, তুই চল, আমি যাচ্ছি।

[কাকলির প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু : তুমি জানো কৃষ্ণা, আমি জীবনে কোনো যুদ্ধে পরাজিত হইনি। একদিন শৈশবে যেমন জোর করে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলুম, ইচ্ছা করলে আজো তেমনি করে ছিনিয়ে নিতে পারি। আমার হাতে সাম্রাজ্য নেই, কিন্তু তরবারি আছে, বাহুতে শক্তি আছে—কিন্তু না—তা নেব না। তোমাকে জয় করেই নেব।

কৃষ্ণা : যুদ্ধ-জয় আর হৃদয়-জয় সমান সহজ নয় সেনাপতি।

চন্দ্রকেতু : বেশ কৃষ্ণা, আমিও না-হয় হৃদয়ের ওই রাঙা রণভূমে পরাজিত হয়েই লুটিয়ে পড়ব। কিন্তু সেই পরাজয়ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ

যুদ্ধজয়। আমি জানি, আজ আমি যেমন করে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ছি তুমিও সেদিন পরাজিত—আমরা বিদায়-পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে ; কিন্তু সেদিন আমি তোমারই মতো উপেক্ষা করে চলে যাব নিরুদ্দেশের পথে।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণা : (মূঢ়ের মতো সেইদিকে তাকাইয়া আকুল কণ্ঠে) কে আমার নাম রেখেছিল কৃষ্ণা ? কৃষ্ণা নিশীথিনীর মতোই আমার এক প্রান্তে সূর্যাস্ত, আর এক প্রান্তে পূর্ণ চাঁদের উদয় ! না ! সূর্যাস্ত যখন হলো ?—এ কি বলছি ?

[রাজসভার সাজে সজ্জিত হইয়া মীনকেতুর প্রবেশ]

মীনকেতু : সত্যি কৃষ্ণা, কুহেলিকারও একটা আকর্ষণ আছে ! আমি রাজসভায় যাচ্ছিলুম, যেতে যেতে তোমার ম্লানমুখ মনে পড়ল। মনে হলো, এখনো তুমি তেমনি করে বসে আছ। রাজসভা আজ এখানেই আহ্বান কর। সভাসদগণকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

[অভিবাদন করিয়া কৃষ্ণার প্রস্থান ও রঙ্গনাথের প্রবেশ]

মীনকেতু : এস, এস রঙ্গনাথ, বড় একা একা ঠেকছিল। তুমি বোধ হয় শুনেছ, আমি আমার এ প্রমোদ-কাননেই আজ রাজসভা আহ্বান করেছি। (হঠাৎ চমকিত হইয়া রুক্ষস্বরে) কিন্তু ও কি রঙ্গনাথ, তুমি আবার দাড়ি রাখতে শুরু করেছ ? জানো আমার আদেশ, কেউ দাড়ি রাখলে তাকে কি দণ্ড গ্রহণ করতে হয় ? ও কুশ্রী জিনিস রূপকে কলঙ্কিত করে, যৌবনের সভায় ওর স্থান নেই।

রঙ্গনাথ : জানি সম্রাট, দাড়ি রাখতে চাইলে আমার দেহ আর মাথাটাকে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু চাঁদের কলঙ্কের মতো দাড়িতে কি মুখের জৌলুস বাড়ে না, সম্রাট ? তা ছাড়া কি করি বলুন, আমি তো দাড়ি চাইনে, কিন্তু দাড়ি যে আমায় চায়। ও বুঝি আমার আর-জন্মের পরিত্যক্তা কালো বউ ছিল, তাই এজন্মে দাড়ি-রূপে এসে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিছুতেই গাল ছাড়তে চায় না, যত দূর করে দিই তত সে আঁকড়ে ধরে। তাছাড়া, সম্রাট, আমরা কামাব দাড়ি, আর নাপিত কামাবে পয়সা—এও তো আর সহ্য করতে পারিনে।

মীনকেতু : (হাসিয়া) আচ্ছা, এবার থেকে আমার নরসুন্দরকে বলে দেব, তোমার কাছে সে পয়সা কামাবে না, দাড়িই কামাবে।

রঙ্গনাথ : দোহাই সম্রাট ! পয়সা কামিয়েই ওরা দাড়ির চেয়ে গালই কামায় বেশি, কিন্তু বিনি-পয়সায় কামানো হলে হয়তো গলাটাই কামিয়ে দেবে ! আর কৃপা করে যদি পাঠানই, তবে নরসুন্দরকে না পাঠিয়ে ক্ষুরসুন্দর কাউকে পাঠাবেন। ওর ক্ষুর তো নয় যেন

খুরপো ! সম্রাট একটা গান শুনবেন ? গানটা অবশ্য আমার স্ত্রী রচনা করেছেন !

মীনকেতু : (উচ্চ হাস্য করিয়া) তোমার স্ত্রীর গান ? তাও আবার তোমার দাড়ি নিয়ে ? গাও, গাও—ও চমৎকার হবে।

রঙ্গনাথ : সে তো গান নয় সম্রাট—সে শুধু নাকের জল চোখের জল। আমার বড় দাড়ির অত্যাচার তার সয়েছিল, কিন্তু কামানো দাড়ির খোঁচানি আর সইতে না পেরে বেদনার আনন্দে কবি হয়ে গানই লিখে ফেললে।

[গান]

খুঁচি খুঁচি সূচি–সারি
হাঁড়ি মুখে কালো দাড়ি
যেন কন্টক বৈঁচির বনে।
তারে ছাড়াতে বসন ছিঁড়ে, ক্ষুর ভাঙে রণে॥
দেয় ভঙ্গ রণে ক্ষুর খুরপো হয়ে
তারে কাটতে পালায় মাঠে কাস্তে ভয়ে !
সে যে আঁধার বাদাড়–বন শ্মশ্রুর ঝোঁপ,
পাশে গুল্মলতার ঝাড় কন্টক–গোঁফ।
(শ্যামের দাড়ি রে —)
শয়নে যাইতে মোর নয়ন ঝুরে লো সই
অঙ্গ কাঁপিয়া মরে ডরে। (সখি লো)
ও যে মুখ নয়, পিতামহ ভীষ্ম শুইয়া যেন
খর শর–শয্যার পরে ! (সখি লো)
সজারুর সনে নিতি লড়াই
যাই রে দাড়ির বালাই যাই।
শ্যামের দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল যে গো ভালো
ছিল না খোঁচার জ্বালা
আমায় দাড়ির আঙুল বুলায়ে বুলায়ে
ঘুম পাড়াইত কালা।
আমার আবেশে নয়ন মুদে যে যেত !
সে পরশে নয়ন বুঁজে যে যেত।
আমি খড়ের পালুই ধরে শুইতাম যেন গো,
তাহে শীত নিবারিত, অরে কাটিল সে কেন গো !
শ্যামের মুখের মতন কে দিল এমন
দাড়িরূপী মুড়ো ঝ্যাঁটা গো,

কালার গণ্ড জড়ায়ে কিলবিল করে
শত সে সতীন-কাঁটা গো,
আমি জ্বলে যে মলাম,
সখি আমায় ধরো ধরো, জ্বলে যে মলাম॥

[কৃষ্ণা, মধুশ্রবা, চন্দ্রকেতু, কাকলি, বন্দিনীগণ, ছত্রধারিণী, করঙ্কবাহিনী ও অন্যান্য সভাসদগণের প্রবেশ]

[গান]

কাকলি ও বন্দিনীগণ : জাগো যুবতী। আসে যুবরাজ॥

অশোক-রাঙা বসনে সাজ।
আসন পাতো বনে অঞ্চল আধ,
বন্দনা-গীতি-ভাষা বাধো বাধো,
কপোলে লাজ॥

উছলি ওঠে যৌবন আকুল তরঙ্গে,
খেলিছে অনঙ্গ নয়নে বুকে অঙ্গে
আকুল তরঙ্গে।

আগমনী-ছন্দে মেঘ-মৃদঙ্গে,
ভবন-শিখী গাহে বন-কুহু সঙ্গে।
বাজো হৃদি-অঙ্গনে বাঁশরি বাজো॥

[কাকলি ও বন্দিনীগণের প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু : সম্রাট, জয়ন্তী আমাদের সীমান্ত-রক্ষী সেনাদলকে পরাজিত করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমার সহকারী সেনাপতিকে তার গতিরোধ করতে পাঠিয়েছি। শুনছি সে-ও পরাজিত হয়েছে।

কৃষ্ণা : কিন্তু আমাদের এ পরাজয়ের অর্ধেক লজ্জা তোমার, সেনাপতি! তুমি নিজে সৈন্য পরিচালন করলে কখনো আমাদের এ পরাজয় ঘটত না।

চন্দ্রকেতু : তা জানি, কিন্তু আমি নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিনে।

মধুশ্রবা : তুমি জানো না সেনাপতি, সব নারী নারী নয়। শৌর্যশালিনী নারীর পরাক্রম যে কোনো পরাক্রমশালী পুরুষের পৌরুষের চেয়েও

ভয়ঙ্কর। নদীর জল তরল স্বচ্ছ, কিন্তু সেই জল যখন বন্যার ধারারূপে ছুটে আসে, তখন তার মুখে ঐরাবতও ভেসে যায়।

রঙ্গনাথ : (অন্যদিকে তাকাইয়া) ঠিক বলেছ বাবা, মদ্দা-মেয়ে পুরুষের বাবা। সেনাপতি যদি একবার আমার স্ত্রীকে দেখতেন, তাহলে বুঝতেন, কেন মায়ের নাম মহিষ-মর্দিনী!

মীনকেতু : এই কি সেই যশল্মীরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্যেশ্বরের কন্যা, সেনাপতি? কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম সে উন্মাদিনী। দিবারাত্র নাকি সে রাজস্থানের মরুভূমিতে ঘূর্ণিবায়ুর সাথে নৃত্য করে ফেরে। ওর নাম ওদেশে মরু-নটী।

চন্দ্রকেতু : হাঁ সম্রাট, এ সেই রহস্যময়ী মরুচারিণী। মরুভূমির দূরন্ত বেদে ও বেদেনির দল এর সহচর-সহচরী, সেনা-সামন্ত—সব। এদের নিয়ে সে মরু-ঝনঝার মতো পর্বতে প্রান্তরে নৃত্য করে ফেরে।

[অধোমুখে সহকারী সেনাপতির প্রবেশ]

একি? সহকারী সেনাপতি? তুমি তাহলে সত্যই পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছ?

সহ-সেনাপতি : মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় সম্রাট, কিন্তু ও মায়াবিনী। কেমন করে কি হলো বুঝতে পারলুম না, যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলুম আমার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে। মনে হলো, আমাদের ওপর দিয়ে একটা দাবানল বয়ে গেল! ও নারী নয় সম্রাট, ও আগুনের শিখা! ওর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারে—এত শক্তি বুঝি পৃথিবীর কোনো সেনানীরই নেই। সেদিন প্রত্যুষে সে যখন রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল, মনে হলো, সমস্ত আকাশে আগুন ধরে গেছে। আমি মুখ-চোখ কিছুই দেখতে পাইনি, তবু চোখ যেন ঝলসে গেল। সহস্র কিরণ দিনমণির মতো তার সহস্র-শিখা ফণা বিস্তার করে এগিয়ে এল, আমরা ফুৎকারে উড়ে গেলুম।

মীনকেতু : তোমায় সে বন্দী করলে না সেনাপতি?

সহ-সেনাপতি : না সম্রাট। আমি তখনো অচেতন অবস্থায় পড়েছিলুম। হঠাৎ কিসের মাতাল-করা সৌরভে আমার জ্ঞান ফিরে পেলুম। দেখলুম, সেই বিজয়িনী নারী আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। ভয়ে আমার চক্ষু আপনি মুদে এল। আমি তার দিকে তাকাতে পারলুম না! সে আমায় বল্‌লে, তোমায় বন্দী করব না সেনাপতি, তোমার—তোমার সম্রাটকে বন্দী করতে এসেছি।

মীনকেতু : (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) কি বললে সেনানী! আমাকে সে বন্দী করতে এসেছে? (সিংহাসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়া) মন্ত্রী, সেনাপতি,

চিনেছি,—চিনেছি আমি এই নারীকে। এরই প্রতীক্ষায় আমার দুর্দান্ত যৌবন কেবলি ফুল আর হৃদয় দলে তার চলার পথ তৈরি করছিল। এরই আমগনের আশায় এত হৃদয়ের এত প্রেম-নিবেদনকে অবহেলা করে চলেছি। ও জয়ন্তী নয়, যশল্মীরের অধিশ্বরী নয়, ও মরুচারিণী-মায়াবিনী, চিরকালের চির-বিজয়িনী! সে তার প্রতি চরণ-পাতে শুষ্ক মরুর বুকে মরূদ্যান রচনা করে চলে, পাষাণের বুক ভেঙে অশ্রুর ঝর্নাধারা বইয়ে দেয়, পাহাড়ের শুষ্ক হাড়ে নিত্য-নতুন ফুল ফোটায়—এ সেই নারী। মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদগণ! আমার অপরাজেয় সৈন্যদলের এই প্রথম পরাজয়—নারীর হাতে, সুন্দরের হাতে, এ আমারই পরাজয়, তোমাদের সম্রাটের পরাজয়, যৌবনের রাজার পরাজয়। এখনই ঘোষণা করে দাও, আমার সাম্রাজ্য জুড়ে উৎসব চলুক, আনন্দের সহস্র দীপালি জ্বলে উঠুক! বলে দাও, আজ তাদের রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজলক্ষ্মী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করছে। আমার এই রাজসভা এখনি উৎসব-প্রাঙ্গণে পরিণত হোক। কবি, নিয়ে এস তোমার বেণু, বীণা, সুরা ও নর্তকীর দল। আজ যৌবনের এই প্রথম পরাজয়ের পরম ক্ষণকে বরণ করতে যেন হাসি, গান, আনন্দের এতটুকু কার্পণ্য না করি! কৃষ্ণা, তুমি অমন ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে কেন? তোমাদের রাজ্যের বিজয়িনী রাজলক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করে আনার দায়িত্ব যে তোমারই। আনন্দ করো, আনন্দ করো!

সভাসদগণ : জয়, গান্ধার-সাম্রাজ্যের ভাবী রাজলক্ষ্মীর জয়!

কৃষ্ণা : মার্জনা করবেন, সম্রাট। আমি যদি সত্য সত্যই এই সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হই, তাহলে আদেশ দিন, আমি সেই বিজয়িনীর গতিরোধ করব। আমি নারী, নারী কোন শক্তিতে যুদ্ধে জয়ী হয়, তা আমি জানি। ওর মায়ায় আপনার তরুণ সেনাপতিদের চোখ ঝলসে যেতে পারে, তারা পরাজিত হতে পারে, ওরা পুরুষ, কিন্তু আমি তার এই অভিযানের ঔদ্ধত্যের শাস্তিদান করব।

মীনকেতু : পারবে না কৃষ্ণা, পারবে না। যে নারী আমার সীমান্তের দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রকারের বাধাকে অতিক্রম করে আমার চির-বিজয়ী সেনাদলকে এমন পরাস্ত করেছে, সে সামান্যা নারী নয়, সে চিরকালের বিজয়িনী।

কৃষ্ণা : সে যদি সম্রাটের মনের দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর অতিক্রম করে হৃদয়-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে থাকে, তো, স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তবু সেই বিজয়িনীর সাথে আমার শক্তি-পরীক্ষার কোনো অধিকারই কি নেই, সম্রাট?

মীনকেতু : নিশ্চয় আছে, কৃষ্ণা। আমি আদেশ দিলুম তুমি যেতে পারো তার শক্তি পরীক্ষায়।

চন্দ্রকেতু : সেনাপতি জীবিত থাকতে মন্ত্রীর সৈন্য পরিচালনার চেয়ে আমাদের বড় কলঙ্ক আর কি থাকতে পারে সম্রাট? মন্ত্রী রাজ্যই পরিচালনা করেন, সৈন্যদল চালনা করা সেনাপতির কাজ।

কৃষ্ণা : (সক্রোধে ও বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে) চুপ করো সেনাপতি। তুমি আজ হীন–বীর্য কাপুরুষ, তোমার শক্তি থাকলে আমাদের অজেয় সেনাদলের এই হীন পরাজয় ঘটত না।

চন্দ্রকেতু : কাপুরুষই যদি হয়ে থাকি সে অপরাধ আমি ছাড়া হয়তো আর কারুর।

মীনকেতু : ঠিক বলেছ চন্দ্রকেতু। মাঝে মাঝে অটল পৌরুষের মহিমাও খর্ব হয়, বিজয়ীর রথের চূড়ায় নীলাম্বরীর আঁচল দুলে ওঠে বলেই তো পৃথিবী আজো সুন্দর! তুমি যে কারণে কাপুরুষের আখ্যা পেলে, ঠিক সেই কারণেই হয়তো আমারও বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তরবারি ধারণ করতে পারছিনে।

চন্দ্রকেতু : আমি এখনো নিজেকে তত দুর্বল মনে করিনে, সম্রাট। যদি শক্তিই হারিয়ে থাকি, তাহলেও যে-শক্তি এখনো এই বাহুতে অবশিষ্ট আছে, পৃথিবী জয়ের জন্য সেই শক্তিকেই যথেষ্ট মনে করি। (প্রস্থানোদ্যত) আমি কি কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি, সম্রাট?

মীনকেতু : না, সেনাপতি। তুমি যে আমার দক্ষিণ হস্তের তরবারি। কিন্তু সেনাপতি, আজ যে আমারি তরবারি-মুষ্টি শিথিল হয়ে গেছে, তুমি শক্তি পাবে কোত্থেকে? তুমি এতদিন অস্ত্রের যুদ্ধে, নর–সংগ্রামেই বিজয়ী হয়েছ, কিন্তু হৃদয়ের যুদ্ধে নারীকে জয় করার সংগ্রামেও জয়ী হয়ে ফেরা, সে তোমার চেয়ে শতগুণে শক্তিধর বীরপুরুষেরাও পারেননি, বন্ধু।

চন্দ্রকেতু : এ তো আমার হৃদয়–জয়ের অভিযান নয়, সম্রাট, এ অভিযান শুধু যুদ্ধ–জয়ের জন্য, সাম্রাজ্য–রক্ষার জন্য।

মীনকেতু : (একবার কৃষ্ণা ও একবার চন্দ্রকেতুর দিকে তাকাইয়া চতুর হাসি হাসিয়া) এইখানেই তো রহস্য চন্দ্রকেতু। যেখানে আসল যুদ্ধ চলেছে সেনাপতির, সে–রণক্ষেত্র ছেড়ে সে যদি এক শূন্য মাঠে গিয়ে তরবারি ঘোরায় তাহলে তার জয়ের আশাটা বেশ একটু মহার্ঘ্য হয়ে পড়ে না কি?

চন্দ্রকেতু : আজ তারই পরীক্ষা হোক সম্রাট। আমি দেখতে চাই সত্যই আমি শক্তি হারিয়েছি কি না।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণা : আপনার আনন্দ-উৎসব চলুক সম্রাট, আমি কৃষ্ণা—আলোক-সভার অন্তরালেই আমার চিরকালের স্থান।

[প্রস্থান]

[সহসা আকাশ অন্ধকার করিয়া কাল-বৈশাখীর মেঘ দেখা দিল। ধুলায় শুকনো পাতায় প্রমোদ-উদ্যান ছাইয়া ফেলিল। মেঘের ঘন গর্জনে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল।]

রঙ্গনাথ : (সভয়ে চিৎকার করিয়া) সম্রাট ! আকাশে দেবতাদের উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। অপ-দেবতার আয়োজন পণ্ড করতেই ব্যাটাদের এই কুমন্ত্রণা। বাবা, 'যঃ পলায়তি সজীবতি।'

মীনকেতু : (হাসিয়া) ভয় নেই, রঙ্গনাথ ! ঐ ঝড়ই আমার না-আসা বন্ধুর পদধ্বনি। শুনছ না—বজ্রে বজ্রে তার জয়ধ্বনি, কালবৈশাখীর মেঘে তার বিজয়-পতাকা ? চলো, প্রাসাদের অলিন্দে বসে আজ মেঘ-বাদলেরই নৃত্যোৎসব দেখি গিয়ে।

[নৃত্য ও গান করিতে করিতে ঝোড়ো-হাওয়া ও ঘূর্ণির প্রবেশ]

[গান]

ঝোড়ো-হাওয়া :

ঝনঝার ঝাঁঝর বাজে ঝন ঝন।
বনানী-কুন্তল এলাইয়া ধরণী কাঁদিছে
পড়ি চরণে শন শন শন শন॥
দোলে ধুলি-গৈরিক নিশান গগনে,
ঝামর কেশে নাচে ধূর্জটি সঘনে,
হর-তপোভঙ্গের ভুজঙ্গ নয়নে,
সিন্ধুর মঞ্জীর চরণে বাজে রণ রণ রণ রণ॥

ঘূর্ণি :

লীলা-সাথী তব নেচে চলি ঘূর্ণি।
বালুকার ঘাগরি, ঝরা পাতা উড়নি॥
আলুথালু শতদলে খোঁপা ফেলি টানি ;
দিকে দিকে ঝর্নার কুলুকুচু হানি।
সলিলে নুড়িতে নুড়ি পঁইচি বাজে
রিনিঝিনি রনঝন॥

[গান করিতে করিতে ঝড় ও ঘূর্ণির প্রস্থান]

[মৃদঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে নটরাজের প্রবেশ]

[গান]

নটরাজ : নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল
লুটাইয়া পড়ে দিবারাত্রির বাঘ-ছাল,
আলো-ছায়ার বাঘ-ছাল,
ফেনাইয়া ওঠে নীল কণ্ঠের হলাহল
ছিঁড়ে পড়ে দামিনী অগ্নি-নাগিনী দল।
দোলে ঈশান-মেঘে ধূর্জটি-জটাজাল॥

বিষম ছন্দে বোলে ডমরু নৃত্য-বেগে
ললাট-বহ্নি দোলে প্রলয়ানন্দে জেগে।
চরণ-আঘাত লেগে জাগে শ্মশানে কঙ্কাল॥

সে নৃত্য-ভঙ্গে গঙ্গা-তরঙ্গে
সঙ্গীত দুলে ওঠে অপরূপ রঙ্গে,
নৃত্য-উছল জলে বাজে জলদ তাল॥

সে নৃত্য-ঘোরে ধ্যান-নিমীলিত ত্রি-নয়ন
ধ্বংসের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন,
জ্যোৎস্না-আশিস ঝরে উছলিয়া শশী-থাল॥

[নৃত্য ও গান করিতে করিতে বৃষ্টিধারার প্রবেশ]

[গান]

বৃষ্টিধারা :

নামিল বাদল
রুমু রুমু ঝুমু নূপুর চরণে
চলো লো বাদল-পরী আকাশ-আঙিনা ভরি
নৃত্য-উছল॥

চামেলি কদম যূথি মুঠি মুঠি ছড়ায়ে
উতল পবনে দে অঞ্চল উড়ায়ে
তৃষিত চাতক-তৃষ্ণারে জুড়ায়ে
চল ধরাতলে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেনাপতি উগ্রাদিত্যের প্রবেশ। চোখে মুখে অস্বাভাবিক ভীষণতা। কণ্ঠে, চলাফেরায়, ব্যবহারে বর্বর বন্য পশুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, বুকের তলা হইতে 'বাঘনখ' অস্ত্র বাহির করিয়া সে এক মনে দেখিতে লাগিল। দূরে চন্দ্রিকার গান শুনিতেই চমকিয়া উঠিল।]

[গান করিতে করিতে চন্দ্রিকার প্রবেশ]

চন্দ্রিকা :

এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখিজলে টলমল॥
কোমল মৃণাল দেহ ভরেছে কণ্টক-ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল॥
ডুবেছি অতল জলে কত যে জ্বালা সয়ে
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল॥
আমার বুকের কাঁদন, তুমি বলো ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস,
দখিনা বায়ু চপল॥

চন্দ্রিকা : এ কি, সেনাপতি! লুকিয়ে আমার গান শুনছিলে বুঝি?

উগ্রাদিত্য : (কর্কশ কণ্ঠে মুখ বিকৃত করিয়া) গান আমি কারুরই শুনিনে চন্দ্রিকা। আমি গাধার চিৎকার দশ ঘণ্টা ধরে শুনতে পারি, কিন্তু মানুষের চিৎকার—হ্যাঁ, চিৎকার বই কি, তা তোমরা তাকে হয়তো গান বলে থাকো—এ মুহূর্তও শুনতে পারিনে।

চন্দ্রিকা : বলো কি উগ্রাদিত্য! গান হলো চিৎকার? আর গাধার ডাক হলো তোমার কাছে মানুষের—মানে আমার গানের চেয়েও সুন্দর? হলেই বা ওরা তোমার আত্মীয়, তাই বলে কি এতটা পক্ষপাত করতে হয়?

উগ্রাদিত্য : দেখো চন্দ্রিকা, তুমি যে কি সব কথা বলো প্যাঁচ দিয়ে, আমি তার মানে বুঝি না, অবশ্য বুঝবার দরকারও নেই আমার। তোমার চলন বাঁকা, তোমার চোখের চাউনি বাঁকা, তোমার কথা বাঁকা!

চন্দ্রিকা : অর্থাৎ আমি অষ্টাবক্র মুনি, এই তো! (গান করিয়া) "বাঁকা, শ্যাম হে, বাঁকা তুমি, বাঁকা তোমার মন!'

উগ্রাদিত্য : উঃ, মানুষের কত বেশি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটলে এমন সুর করে চ্যাঁচাতে পারে। একরোখা চ্যাঁচানোর মানে বুঝি, তা সওয়া যায়, কিন্তু এই একবার জোরে, একবার আস্তে একবার নাকি সুরে চ্যাঁচানো শুনে এমন রাগ ধরে!

চন্দ্রিকা : এও আবার লোকে আদর করে শোনে! এত পাগলও আছে পৃথিবীতে! ভাগ্যিস তোমার মতো আরো দু'চারটি পাথুরে মস্তিষ্কের লোক নেই পৃথিবীতে, নইলে পৃথিবীটা এতদিন চিড়িয়াখানা হয়ে উঠ্‌ত উগ্রাদিত্য!— (চমকিয়া) ওকি! তুমি অমন করে বাঘ-নখ ধরেছ কেন? তোমার চোখে হিংস্র বাঘের মতো এমন দৃষ্টি কেন? সাপ যেমন করে শিকারের দিকে তাকায়,—না আমার কেমন ভয় করছে। আমি পালাই!

[ছুটিয়া পলায়ন]

[চন্দ্রিকার হাত ধরিয়া জয়ন্তীর প্রবেশ]

জয়ন্তী : কিরে, তুই অমন করে ছুটছিলি কেন? ভূত দেখ্‌লি নাকি?

চন্দ্রিকা : (ভয়-জড়িত কণ্ঠে) হাঁ! না দিদি, ভূত নয়, বাঘ! নেকড়ে বাঘ!

জয়ন্তী : বাঘ? কোথায় দেখলি?

চন্দ্রিকা : (উগ্রাদিত্যকে দেখাইয়া) ঐ দাঁড়িয়ে! হালুম! ঐ দেখ, হাতে বাঘ-নখ! বাঘের মতো গোঁফ, চোখ, মুখ, শুধু ল্যাজটা হলেই ও পুরোপুরি বাঘ হয়ে যেত!

জয়ন্তী : তুই বড় দুষ্ট চন্দ্রিকা! ওর পেছনে দিনরাত অমন করে ফেউলাগা হয়ে লেগে থাকলে ও তাড়া করবে না?

চন্দ্রিকা : ফেউ কি সাধে লাগে দিদি? ফেউ ডাকে বলেই তো দেশের শিকারগুলো এখনও বেঁচে আছে। নইলে তোমার বাঘ এতদিন দেশ সাবাড় করে ফেল্‌ত।

জয়ন্তী : কিন্তু, ও তো আমার কাছে দিব্যি শান্ত হয়ে থাকে। ঐ দেখ না ওর বাঘ-নখ ওর বুকের ভিতর নিয়ে লুকিয়েছে!

চন্দ্রিকা : কি জানি দিদি, ঘোড়ার লাথি ঘোড়াই সইতে পারে! ও তোমার পোষা বাঘ কি না!

জয়ন্তী : উগ্রাদিত্য!

উগ্রাদিত্য : (তরবারি-মুষ্টি ললাটে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

জয়ন্তী : (চন্দ্রিকার দিকে তাকাইয়া) দেখলি চন্দ্রিকা, ও আজ আমার কাছে মাথা হেঁট করে অভিবাদন করলে না। ললাটে তরবারি ছুঁইয়ে সম্মান

দেখালে। ও বলে, ওর শির ভূমিস্পর্শ করতে পারে শুধু তারির খড়্গে যে ওকে পরাজিত করবে।

চন্দ্রিকা : সে মহাষ্টমী কখন আসবে দিদি ! আমার বড্ডো সাধ, মহিষ-মর্দিনীর পায়ে মহিষ-বলি দেখব !

জয়ন্তী : ছি চন্দ্রিকা ! তুই বড্ডো প্রগল্‌ভা হয়েছিস। উগ্রাদিত্য, তুমি এখন যাও, আমি দরকার হলে ডাকব। আর দেখো, চন্দ্রিকার উপর রাগ করো না। মনে রেখো, ও আমারই ছোট বোন।

উগ্রাদিত্য : জানি রানি ! (আবার ললাটে তরবারি ছোঁয়াইয়া অভিবাদন করিয়া চন্দ্রিকার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলিয়া গেল।)

জয়ন্তী : আচ্ছা চন্দ্রিকা ! এই যে ওকে রাতদিন অমন করে খেপাস, ধর ওরই সাথে যদি তোর বিয়ে হয় !

চন্দ্রিকা : বাঃ, দিদির চমৎকার পছন্দ তো ! এ মুক্তোর মালা অমনি জীবের গলাই তো ঠিক ঠিক মানাবে। ... আচ্ছা দিদি, ও অত নিষ্ঠুর কেন ? যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি, ও আহত সৈনিককেও হত্যা করতে ছাড়ে না ! ও যেন বনের পশু। আদিম কালের বর্বর !

জয়ন্তী : ও সত্যই মৃত্যুর মতো মমতাহীন। তাই ও জ্যান্ত আহত কারুর প্রতি কোনো মমতা দেখায় না। ওকে মারতে হবে—এইটাই ওর কাছে সত্য। ঐ হচ্ছে পরিপূর্ণ পুরুষ, চন্দ্রিকা। ওর মাঝে একবিন্দু মায়া নেই, করুণা নেই। ওর এক তিলও নারী নয় !—পশু, বর্বর, নির্মম পুরুষ !

চন্দ্রিকা : (হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গান করিতে লাগিল)

[গান]

বেসুর বীণার ব্যথার সুরে বাঁধব গো।
পাষাণ বুকে নির্ঝর হয়ে কাঁদব গো॥
কূলের কাঁটায় স্বর্ণলতার দুলব হার,
ফণির ডেরায়, কেয়ার কানন ফাঁদব গো॥
ব্যাধের হাতে শুনব সাধের বংশী-সুর,
আসলে মরণ চরণ ধরে সাধব গো॥
বাদল-ঝড়ে জ্বালব দীপ বিদ্যুৎলতার,
প্রলয়-জটায় চাঁদের বাঁধন ছাঁদব গো॥

জয়ন্তী : আচ্ছা চন্দ্রিকা, সত্যি করে বলো দেখি, ওর ওপর তোর এত আক্রোশ কেন ? ওকে দেখতেও পারিসনে আবার ভুলতেও পারিসনে। ঘৃণা করার ছলে যে ওকে নিয়েই তোর মন ভরে উঠল।

চন্দ্রিকা : (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যিই তো দিদি, এমনি করেই বুঝি সাপের ছোবলে সাপুড়ের, বাঘের হাতে শিকারীর মৃত্যু হয়। (একটু ভাবিয়া) তা ও-সাপ যদি নাচাতেই হয় আমাকে, ওর বিষ-দাঁতগুলো আগে ভেঙে দেবো!

জয়ন্তী : ছি, ছি, শেষে ঢোঁড়া নিয়ে ঘর করবি?

চন্দ্রিকা : বিষ গেলে ওর কুলোপনা চক্র থাকবে তো। ফোঁস্-ফোঁসানি থাকলেই হলো, লোকে মনে করবে জাত-গোখরো। (চলিয়া যাইতে যাইতে) সত্যি দিদি, আমার দিনরাত কেবলি মনে হয় ও কেন অমন বন্য পশু হয়ে থাকবে? ওকে কি লোকালয়ের মানুষ করে তোলার কেউ নেই? বড় দয়া হয় ওকে দেখলে। ও যেন সব চেয়ে নিরাশ্রয়, একা! ওর বন্ধু সাথী কেউ নেই! ঐ পাথুরে পৌরুষকে নারীত্বের ছোঁওয়া দিয়ে মুক্তি দিলে হয়তো মহাপুরুষ হয়ে উঠবে।

জয়ন্তী : হ্যাঁ, দস্যু রত্নাকর হঠাৎ বাল্মীকি মুনি হয়ে উঠবেন!

চন্দ্রিকা : বিচিত্র কি দিদি! সত্যি, বলো তো, কেন এমন হয়? ও কেন এমন বর্বর হলো শুধু এই চিন্তাটাই আমাকে এমন পীড়া দেয়। ওকে কেন এমন করে পীড়ন করি? বেচারা বুনো! (হাসিয়া উঠিয়া) এক একবার এমন হাসি পায়! মনে হয় আমার সমস্ত শরীরটা দাঁত বের করে হাসছে।

[গান]

তাহারে দেখলে হাসি, সে যে আমার দেখন-হাসি,
(ওগো) আমি কচি, সে যে ঝুনো, আমি উনিশ
সে উন-আশি॥

সে যে চিল আমি ফিঙে, আমি বাঁট সে যে ঝিঙে।
আমি খুশি সে যে খাসি, সে যে বাঁশ আমি বাঁশি।
ও সে যত রাগে, অনুরাগে পরাই গলে তত ফাঁসি॥

জয়ন্তী : তুই তোর বাঁদরের চিন্তা কর! আমি চললুম, আমার অনেক কাজ আছে। (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রিকা : আচ্ছা দিদি, আমি কি তোমার কোনো কিছু জানবার অধিকারী নই? তোমার অনেক কাজ আছে বললে, কিন্তু ঐ অনেক কাজের একটা কাজেও তো সাহায্য করতে ডাকলে না আমায়!

জয়ন্তী : (চন্দ্রিকার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) পাগল! সবাই কি সব কাজের উপযুক্ত হয়! তোর প্রতি পরমাণুটি নারী, তাই শুধু হৃদয়ের ব্যাপার নিয়েই মেতে আছিস। আমার মধ্যে নারীত্ব যেমন,

পৌরুষও তেমনি। তাই আমি এখন হাতে যেমন তরবারি ধরেছি, তেমনি সময় এলে চোখে বাণও হয়তো মারব। তুই আগাগোড়া নারী বলেই এই পা থেকে মাথা পর্যন্ত পশু উগ্রাদিত্যের এত চিন্তা করিস। আর আমি অর্ধ-নারী বলে পুরুষালি রাজ্যের চিন্তা নিয়ে মরি। তাই তুই হয়েছিস নারী, আর আমি হয়েছি রানি।

চন্দ্রিকা : (রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) তুমি যা না তাই বলছ দিদি আমায়! আমার মরণ নেই তাই গেলুম ঐ বুনো জানোয়ারটাকে ভালবাসতে। আমি চললুম ফের তোমার বাঘকে খোঁচাতে।

[প্রস্থান]

জয়ন্তী : ওরে যাসনে। আঁচড়ে-কামড়ে দেবে হয়তো। ... (ঐ পথে চাহিয়া থাকিয়া) পাগল! বদ্ধ পাগল!

[উগ্রাদিত্যের প্রবেশ]

উগ্রাদিত্য : আমার মনে ছিল না সম্রাজ্ঞী, আজ আমাদের অগ্নি-উৎসবের রাত্রি।

জয়ন্তী : আমার মনে আছে সেনাপতি। কিন্তু এবার এ নৃত্যে যোগদান করব শুধু আমি আর আমার যোগিনীদল। তুমি আমার সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঐ পার্বত্য-গিরিপথ রক্ষা করবে। আমাদের এই উৎসবের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা যেন আমাদের আক্রমণ করতে না পারে।

[উগ্রাদিত্যের পূর্বরূপ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

জয়ন্তী : কোথায় লো যোগিনীদল! আয়, আজ যে আমাদের অগ্নিবাসর।

[গান করিতে করিতে অগ্নিশিখা রঙের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যোগিনীদলের প্রবেশ]

[গান]

যোগিনী দল :

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা॥
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা॥
দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী
বিশ্ব-দাহন-তেজে জাগো দাহিকা॥
ধূ ধূ জ্বলে ওঠো ধূমায়িত অগ্নি!
জাগো মাতা কন্যা বধূ জায়া ভগ্নি!

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ–স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ–দলিতা।
চির–বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥

জয়ন্তী : আমি আগুন, তোরা সব আমার শিখা! আজ ফাল্গুন–পূর্ণিমা—আমার জন্মদিন। আগুনের জন্মদিন। এমনি ফাল্গুন–পূর্ণিমায় প্রথম–নারীর বুকে প্রথম আগুন জ্বলেছিল। সে আগুন আজও নিবল না! কত ঘরবাড়ি বনকান্তার মরুভূমি হয়ে সে অগ্নিক্ষুধার ইন্ধন হলে, তবু তার ক্ষুধা আর মিটল না। ও যেন পুরুষের বিরুদ্ধে প্রকৃতির যুদ্ধ–ঘোষণার রক্ত–পতাকা। নরের বিরুদ্ধে নারীর নিদারুণ অভিমান–জ্বালা।

[গান]

যোগিনী দল : জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত–টীকা॥

জয়ন্তী : হাঁ, মীনকেতু গর্ব করে ঘোষণা করেছিল, সে নিখিল পুরুষের প্রতীক। যৌবন–সাম্রাজ্যের সম্রাট। ফুল আর হৃদয় দলে চলাই নাকি ওর ধর্ম। ওকে আমি জানাতে চাই যে, যৌবন শুধু পুরুষেরই নাই। ওদের যৌবন আসে ঝড়ের মতো, তুফানের মতো বেগে; নারীর যৌবন আসে অগ্নিশিখার মতো রক্তদীপ্তি নিয়ে। আমি জানাতে চাই, পুরুষের পৌরুষ দুর্দান্ত যৌবনকে যুগে যুগে নারীর যৌবনই নিয়ন্ত্রিত করেছে। নারীর হাতের লাঞ্ছনা–তিলকই ওদের নিরাভরণ রূপকে সুন্দর করে অপরূপ করে তুলেছে। মীনকেতু যদি হয় নিখিল পুরুষের প্রতীক, আমিও তাহলে নিখিল নারীর বিদ্রোহ ঘোষণা—তার বিরুদ্ধে—নিখিল পুরুষের বিরুদ্ধে।

[যোগিনীগণের অগ্নিনৃত্য]

[গান]

যোগিনীদল : জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা—

[দূরে তূর্য–নিনাদ, সৈনিকদলের পদধ্বনি, জয়ধ্বনি ও গান]

জয়ন্তী : ঐ উগ্রাদিত্য চলেছে আমার অজেয় মরুসেনা নিয়ে। চল আমরা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের জয়–যাত্রার ঐ অপরূপ শোভা দেখি গিয়ে। বিরাট–

সুন্দরকে দেখতে হলে দূর থেকেই দেখতে হয়, নইলে ওর পরিপূর্ণ রূপ চোখে পড়ে না।

[জয়ন্তী ও যোগিনীদলের প্রস্থান]

[গান ও মার্চ করিতে করিতে যশলক্ষ্মীর-সেনাদলের প্রবেশ]

টলমল টলমল পদভরে—
বীরদল চলে সমরে॥
খর-ধার তরবার কটিতে দোলে,

রণন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে।
ঘন তূর্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে॥
চলে শ্রান্ত দূর পথে
মরু দুর্গম পর্বতে
চলে বন্ধু-বিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা!

কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান,
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যাজিয়া শ্মশান!
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে।

তৃতীয় অঙ্ক

[গান্ধার রাজ্যের প্রমোদ-প্রাসাদ। মধুশ্রবা, তরুণী কিশোরীর দল, রঙ্গনাথ, কাকলি প্রভৃতি আসীন। মীনকেতু তখনো আসেনি ; বৈতালিকের গান।]

[গান]

বৈতালিক :

আসিলে কে অতিথি সাঁঝে।
পূজার ফুল ঝরে বন-মাঝে॥
দেউল মুখরিত বন্দনা-গানে
আকাশ-আঁখি চাহে মুখপানে,
দোলে ধরাতল দীপ-ঝলমল
নৌবতে ভূপালি বাজে॥

[হাসিতে হাসিতে মীনকেতুর প্রবেশ। তরুণী ও কিশোরীদলের নৃত্য ও গান]

[গান]

তরুণী ও কিশোরীরা :

মাধবী-তলে চল মাধবিকা দল
আইল সুখ-মধুমাস
পিককুল কলকল অবিরল ভাষে,
মধুপ মদালস পুষ্প-বিলাসে,
বেণু বনে ব্যাকুল উচ্ছাস॥
তরুণ নয়ন সম আকাশ আ-নীল
তট-তরু-ছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে দীরঘ নিশাস॥

[গীত-শেষে কাকলি পরিপূর্ণ সুরার পাত্র আগাইয়া দিল]

মীনকেতু : (সুরার পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া) শুধু সুরা নয় কাকলি, সুরার সঙ্গে সুর চাই। তোমার বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠের সুর। আজ যে আমার তাকেই দেখার দিন, যাকে কখনো দেখিনি।

[গান]

কাকলি :

গহীন রাতে—
ঘুম কে এলে ভাঙাতে
ফুলহার পরায়ে গলে,
দিলে জল নয়ন-পাতে॥

যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপনে
ছুঁইলে সে বেদনাতে॥

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি
নিশি আর নাহি বাকি
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে॥

[সাধারণ নাগরিকের শ্বেত বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তরবারি শূন্য খাপ হস্তে সেনাপতি চন্দ্রকেতুর প্রবেশ]

মীনকেতু : (উঠিয়া পড়িয়া) একি ! সেনাপতি ? শ্বেত পতাকা জড়িয়ে এসেছ বন্ধু !

চন্দ্রকেতু : (মীনকেতুর পদতলে তরবারির খাপ রাখিয়া) সম্রাট ! আমি আর সেনাপতি নই। আজ হতে আমার নাম শুধু চন্দ্রকেতু। আমার আর সেনাপতিত্ব করবার অধিকার নেই। আমি পরাজিত হয়েছি। পরাজিতের গ্লানি ভুলবার একমাত্র উপায় যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তাই স্বেচ্ছায় আমি নিজকে চির-নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি। আজ আর আমার মনে কোনো গ্লানি নাই, মৃত্যু-লোকের পথ রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি অমৃতলোকের পথের দিশা পেয়েছি।

মীনকেতু : জিজ্ঞাসা করতে পারি কি বন্ধু, তোমার এই অমৃত-লোকের পথের দিশারীটি কে ?

চন্দ্রকেতু : আমার, না—একা আমার কেন—সর্বলোকের বিজয়িনী এক নারী। তার নাম আমি করব না। আজ আমি সত্যই বুঝতে পেরেছি সম্রাট, হৃদয়ের জয় করতে না পারার বেদনা আমার বাহুকে যে এমন শক্তিহীন করে তুলবে, এ আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

মীনকেতু : (চন্দ্রকেতুর পিঠ চাপড়াইয়া) দুঃখ কোরো না বন্ধু, ও পরাজয়ের মধুর আস্বাদ একদিন তোমাদের মীনকেতুকে—এই যৌবনের সম্রাটকেও পেতে হবে! সুন্দর হাতের পরাজয় কি পরাজয়? কিন্তু সেই বিজয়িনীর কাছে তুমি পরাজিত হলে অস্ত্রের যুদ্ধে, না বিনাঅস্ত্রের যুদ্ধে?

চন্দ্রকেতু : (ম্লান হাসি হাসিয়া) দুই যুদ্ধেই সম্রাট, যদিও ওখানে বিনা-অস্ত্রের যুদ্ধ করতে যাইনি। আমার সৈন্য নিয়ে গৈরিকস্রাবের মতো যশল্মীর-সৈন্যের উপর গিয়ে পড়লুম। প্রায় পরাজিতও করে এনেছিলুম, এমন সময় আষাঢ়ের মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো দীপ্তি নিয়ে এল জয়ন্তী—যশল্মীরের অধীশ্বরী। এত রূপ আমি আর দেখিনি। এইটুকু দেহের আধারে এত রূপ কি করে ধরল, সকল রূপের স্রষ্টাই বলতে পারেন। ও যেন বিশ্বর বিস্ময়। কিন্তু রূপের চেয়েও সুন্দর তার চোখ। ও চোখে যেন সূর্য-চন্দ্র লুকোচুরি খেলছে।

মীনকেতু : বড় বাড়িয়ে বলছ চন্দ্রকেতু। তারপর কি হলো বলো।

চন্দ্রকেতু : আমি তখনও সেনাপতি উগ্রাদিত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত। জয়ন্তী যেমন অপরূপ সুন্দর, উগ্রাদিত্য তেমনি ভীষণ কুৎসিত। ওর শরীরে যেন সকল পশুর সকল দানবের শক্তি। ও যেন নিখিল অসুরের প্রতীক। বুঝলাম, দেবী-শক্তির সঙ্গে দানব-শক্তি মিশেছে এসে। এ শক্তি অপরাজেয়।

মীনকেতু : (অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে করিতে) হ্যাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি ও শক্তির উৎস কোথায়?

চন্দ্রকেতু : হয়তো—বা উগ্রাদিত্যের হাতেই পরাজিত হতুম, কিন্তু সে লজ্জা থেকে বাঁচালে এস জয়ন্তী। সে উগ্রাদিত্যকে সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তুমি তো এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না সেনাপতি ; তুমি ফিরে যাও।' আমি বললুম, 'আমি যুদ্ধস্থল থেকে কখনো পরাজয় নিয়ে ফিরিনি।' সে হেসে বললে, 'তুমি হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত। আহত সেনানীকে আমার সেনানীর আঘাত করতে বাধে না, কিন্তু আমার বাধে! তোমার চোখ তো সৈনিকের চোখ নয়, ও চোখে মৃত্যু-ক্ষুধা কই, ও যে প্রেমিকের চোখ হতাশার বেদনায় ম্লান!' আমি যেন এক মুহূর্তে ঐ নারীর মনের আর্শিতে আমার সত্যকার আহত মূর্তি দেখতে পেলাম। আমার হাত হতে তরবারি পড়ে গেল।

মীনকেতু : (অভিভূতের মতো) হ্যাঁ, এই সেই! এই সেই বিজয়িনী। আমার যেন মনে পড়ছে স্বর্গে আমি ছিলুম পঞ্চশর, শিবের অভিশাপে

এসেছি মর্তলোকে। ঐ বিজয়িনী ও জয়ন্তী নয়, ও রতি! (হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া) তা নয়, তা নয়। হ্যাঁ, তারপর চন্দ্রকেতু, তুমি ফিরে এলে? ভ্রষ্ট তরবারি আবার কুড়িয়ে নিলে না?

চন্দ্রকেতু: ভ্রষ্টা শক্তিকে আর গ্রহণ করিনি। ওকে চিরকালের জন্য ঐ রণক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে এসেছি।

মীনকেতু: (হাসিয়া উঠিয়া) ভুল করেছ বন্ধু! রামের মতোই রামভুল করে বসেছ! ও-শক্তি ভ্রষ্টা নয়, ও সীতার মতোই সতী।

চন্দ্রকেতু: এইবার তারই অগ্নি-পরীক্ষা হবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও লোকলজ্জায় ওকে গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের মাঝে চির-নির্বাসনের যবনিকা পড়ে গেছে।

[সহসা দশদিক আলোময় হইয়া উঠিল। যশল্মীর-রাজ্যেশ্বরী জয়ন্তী ও সেনাপতি উগ্রাদিত্যের প্রবেশ ও শঙ্খ তূর্য-ধ্বনি।]

জয়ন্তী: (চন্দ্রকেতুর পানে তরবারি আগাইয়া দিয়া) না, সেনাপতি। ওকে নির্বাসন দিলে রামের মতো তোমারও চরম দুর্গতি হবে। এই ধরো তোমার পরিত্যক্তা শক্তি। আমি অগ্নিশিখা। ওর অগ্নি-শুদ্ধি হয়ে গেছে।

চন্দ্রকেতু: (বিস্ময়-অভিভূত কণ্ঠে চমকিত হইয়া) সম্রাট! সম্রাট! এই—এই সেই মহীয়সী নারী! এই জয়ন্তী!

[মীনকেতু তরবারি মোচন করিয়া জয়ন্তীর দিকে এবং জয়ন্তীও মীনকেতুর দিকে অভিভূতের মতো বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। দূরে মধুর সুরে বংশী বাজিয়া উঠিল। সহসা মীনকেতুর হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। উগ্রাদিত্যের চক্ষু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো জ্বলিতে লাগিল।]

উগ্রাদিত্য: রানি, আমি কি এদের বন্দী করতে পারি?

জয়ন্তী: উগ্রাদিত্য, পরাজিত হলেও ইনি সম্রাট। ওঁর সম্মান রেখে কথা বলো।

উগ্রাদিত্য: মার্জনা কর রানি, যে পরাজিত হয় তার বন্দী ছাড়া আর কোনো সংজ্ঞা নেই। সম্রাট হলেও সে বন্দী।

জয়ন্তী: বন্দী করতে হয়, আমি নিজ হাতে বন্দী করব।

মীনকেতু: তুমি কোন পথ দিয়ে এলে রানি?

জয়ন্তী: তোমার পরাজয়ের পথ দিয়ে, সম্রাট! এখন তুমি কি স্বেচ্ছায় বন্দী হবে, না যুদ্ধ করবে?

মীনকেতু: যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ রানি! যেদিন তুমি আমার রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করেছ, সেদিনই তো আমার পরাজয় হয়ে গেছে।

জয়ন্তী : শুধু ঐটুকুতেই শেষ হবে না, সম্রাট। তোমাকে চরম পরাজয়ের লজ্জা স্বীকার করতে হবে আমার কাছে—নারীর শক্তির কাছে। তোমাকে শিকল পরতে হবে এবং সে শিকল সোনার নয় !

মীনকেতু : সুন্দর হাতের সোনার ছোঁয়ায় লোহার শিকলই সোনা হয়ে উঠবে। (হাত আগাইয়া) বন্দী কর, রানি !

জয়ন্তী : কিন্তু বিনা যুদ্ধে তুমি হার মানবে ? আমার কাছে না-হয় হার মানলে কিন্তু ঐ উগ্রাদিত্য, আমার সেনাপতি—ওর কাছেও কি পরাজয় স্বীকার করবে।

মীনকেতু : (উগ্রাদিত্যকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া) ও কে ? ওকে তো দেখিনি ! ও তো এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

উগ্রাদিত্য : (হিংস্র হাসি হাসিয়া) আমি পাতাল-তলের দৈত্য, সম্রাট ! আজ তোমাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে। আজ আমাদের শক্তি পরীক্ষার দিন।

মীনকেতু : (জ্বলন্ত চোখে হাসিয়া) আমি পাতাল-তলের দৈত্য, সম্রাট ! আজ তোমাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে। আজ আমাদের শক্তি পরীক্ষার দিন।

মীনকেতু : (জ্বলন্ত চোখে উগ্রাদিত্যের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ। ওর সাথে যুদ্ধ করা যায় ! ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত অপরাজেয় পৌরুষের গঠনে মোড়া ! হাঁ, সত্যকার পুরুষ দেখলুম ! আমরা সমস্ত মাংস-পেশী ওকে দেখে লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠছে। শিরায় শিরায় চঞ্চল রক্তের উন্মাদনা জেগে উঠছে। নিশ্চয়ই ! তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব সেনাপতি ! কিন্তু কি পণ রেখে যুদ্ধ করবে তুমি ?

উগ্রাদিত্য : (হিংস্র আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। জয়ন্তীকে দেখাইয়া) আমার পণ এই অমৃত-লক্ষ্মী সম্রাট। যার লোভে আমি পাতাল ফুঁড়ে ঐ অমৃতলোকে উঠে গেছি শক্তির ছদ্মবেশে। তাকে যদি আজ জয় করতে না পারি তাহলে আমার তোমার হাতে মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি।

জয়ন্তী : (দৃপ্তকণ্ঠে) উগ্রাদিত্য ! তুমি তাহলে ছদ্মবেশী লোভী, শক্তিধর নও।

উগ্রাদিত্য : আজ আমি সত্য বলব, রানি। আমি অসুর-শক্তি নই, আমি লোভ-দানব। আমরা বাহুতে যে অমিত শক্তি, তা আমার ঐ অপরিমাণ ক্ষুধারই কল্যাণে। আজ আমার সত্য প্রকাশের চরম মুহূর্ত উপস্থিত।

জয়ন্তী : মিথ্যাচারী ! (মীনকেতুর পতিত তরবারি তুলিয়া মীনকেতুর হাতে দিয়া) আর আমার ভয় নেই সম্রাট, তুমি জয়ী হবে। ও শক্তির প্রতীক নয়, ও লোভীর ক্ষুধাজীর্ণ মূর্তি, তোমার এক আঘাতেই ও চূর্ণীকৃত হয়ে যাবে।

উগ্রাদিত্য : কি সম্রাট, তুমি কি ঐ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রই গ্রহণ করবে, না রিক্তহস্তে আত্মরক্ষা করবে?

মীনকেতু : (হাসিয়া) আমি চন্দ্রকেতু নই, উগ্রাদিত্য। আমারি শিথিল মুষ্টির জন্য যে শক্তি পতিত হয়, তাকে আবার হাতে তুলে নিতে আমার লজ্জা নেই। তুমি লোভ-দানব, তোমার উদরে দশ মুখের ক্ষুধা, হস্তে বিশ হস্তের লুণ্ঠন আর প্রহরশক্তি। তোমার সঙ্গে অহিংসযুদ্ধ করা চলে না। আমি অস্ত্র গ্রহণ করলুম।

উগ্রাদিত্য : তোমার পণ?

মীনকেতু : আমারও পণ ঐ অমৃত-লক্ষ্মী। (মীনকেতু চতুর্থবার তরবারি আঘাত করিতেই উগ্রাদিত্য পড়িয়া গেল)

জয়ন্তী : (সহসা কাঁপিয়া উঠিয়া) সম্রাট! মীনকেতু! ও কি করলে তুমি, তোমায় দিয়ে একি করালুম আমি? ও যে আমার শক্তি, লোভ, ক্ষুধা, সব—ঐ লোভ, ঐ ক্ষুধার শক্তি নিয়েই যে তোমায় জয় করতে বেরিয়েছিলুম। উঃ! মীনকেতু! আজ আমার প্রথম মনে হচ্ছে, আমি রাজ্য শাসনের রানি নই, অশ্রুজলের নারী।

[চন্দ্রিকার প্রবেশ]

চন্দ্রিকা : একি! এ কোথায় এলুম! এই কি অন্ধপতির প্রেমে-অন্ধ গান্ধারীর দেশ। এই কি হৃদয়ের সেই চিররহস্যময় পুরী? ওরা কারা দাঁড়িয়ে? মূক, মৌন, ম্লান। ঐ কি আলেয়ার পিছনে ঘুরে-মরা চির-পথিকের দল? ওরা সব যেন চেনা! ওদের কোথায় কোন লোকে যেন দেখেছি। (পতিত উগ্রাদিত্যকে দেখিয়া) ও কে? —দিদি? আর এ কে? —অ্যাঁ! উগ্রাদিত্য? এখানে এত রক্ত কেন! (আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া) উগ্রাদিত্য! একি! কে তোমায় হত্যা করলে? দিদি! দিদি!

মীনকেতু : (শান্ত স্বরে) দেবী! উগ্রাদিত্যকে আমিই হত্যা করেছি! ও দৈত্য, অমৃত পান করতে এসেছিল! ওই ওর নিয়তি!

জয়ন্তী : চন্দ্রিকা! উগ্রাদিত্য চলে গেছে আমার সকল শক্তি অপহরণ করে। তুই পারবি চন্দ্রিকা ওকে বাঁচাতে তোর তপস্যা দিয়ে? নইলে আমি বাঁচব না! ওকে বাঁচাতেই হবে।

চন্দ্রিকা : দিদি! ওকে নিয়ে তোমার চেয়ে আমার প্রয়োজনই যে বেশি। ওকে না বাঁচালে আমাদের পৃথিবীর যে চির-সন্ন্যাসিনী হয়ে উঠবে। এর জন্য যদি মৃত্যু-রাজার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাও দাঁড়াব গিয়ে! সাবিত্রীর মতো আমার এই শবের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার তপস্যা আজ হতে শুরু হলো! আজ হতে আমার নাম হবে কল্যাণী!

জয়ন্তী : (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আশীর্বাদ করি, তুই রক্ষকুলবধূ প্রমীলার মতো স্বামীসোহাগিনী হয়ে সহমরণ নয়, সহজীবন লাভ কর ! (মীনকেতুকে নমস্কার করিয়া) বন্ধু ! নমস্কার ! আমি তোমায় বন্দী করতে এসেছিলুম, হয়তো–বা বন্ধন নিতেও এসেছিলুম। কিন্তু সে বন্ধন আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ছিন্ন হয়ে গেল ! উগ্রাদিত্যের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার হৃদয়ের সকল ক্ষুধা, সকল লোভের অবসান হয়ে গেল। আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী ! (একটু থামিয়া) আমি এই সুদূর পৃথিবীতে সন্ন্যাসিনী হতে আসিনি। বধূ হবার, জননী হবার তীব্র ক্ষুধার আগুন জ্বেলে তোমাকে জয় করতে এসেছিলুম। তোমাকেও পেলুম কিন্তু বুকের সে আগুন আমার নিভিয়ে দিয়ে গেল উগ্রাদিত্য !

মীনকেতু : জয়ন্তী ! তুমিও কি তবে ওকে ভালোবাসতে ? তাহলে জয় করেও কি আমার পরাজয় হলো ? উগ্রাদিত্য মরে হলো জয়ী ! যাকে পণ রেখে জয় করলুম—সে কি আপন হলো না ?

জয়ন্তী : কায়াহীন ভালোবাসা নিয়ে যারা তৃপ্ত হয়, তুমি তো তাদের দলের নও মীনকেতু। তুমি চাও জয়ন্তীকে, এই মুহূর্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না। যে তেজ যে দীপ্তির জোরে তোমায় জয় করলুম—সেই তো ছিল উগ্রাদিত্য। তোমার হাতে তার পতন হয়ে গেছে ! বন্ধু ! বিদায় !

মীনকেতু : (আর্তকণ্ঠে) জয়ন্তী ! আর কি তবে আমাদের দেখা হবে না ?

জয়ন্তী : হয়তো হবে, হয়তো–বা হবে না ! যদি আমার মনে আবার সেই ক্ষুধা জাগে, যদি ঐ উগ্রাদিত্য প্রাণ পায়, কল্যাণীর সিঁথিতে সিঁদুর ওঠে, আমি আবার আসব। সেনাপতি, নমস্কার !

[প্রস্থান]

মীনকেতু : (উন্মাদের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল) জয়ন্তী ! জয়ন্তী !

[দূর হইতে জয়ন্তীর স্বর ভাসিয়া আসিল 'মীনকেতু।']

যবনিকা

শিউলিমালা

পদ্ম-গোখরো

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদিনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য; কিন্তু সে জমিদারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল' অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইল। এমনকি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোনো খান্দানি জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ির মেয়ের সহিত বিবাহ হইল; সে বাড়ির বংশ-মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম তো নয়ই, বরং অনেক বেশি।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অত রূপ, অমন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ি হইবে—ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে দরিদ্র মক্তব-শিক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপখ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা।

পিতার মন খুঁত খুঁত করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিল।

আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ-দৃষ্টির সময় উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন 'বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভরে উঠবে।'

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের 'পয়' বলিয়া কোনো জিনিস আছে কিনা জানি না, কিন্তু জোহরার মীর-বাড়িতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয় রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীর-বাড়ির এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহল-বশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়তো বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া সেই ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মতো একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলাবাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ি পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশি দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ও সাপটাকে মারিতেই হইবে, নৈলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!' বলিয়া বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধ-ধবল গোখরে সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দুর বর্ণ চক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'মারিস নে মারিস নে, ও বাস্তু সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্ম গোখরে।'

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখরোরূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক রকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোন কিছু আছে।' আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলাতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, 'কই রে, সে রকম কোনো শব্দ তো শুনি নি।'

আরিফ বলিল, 'আমরা তো সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়তো শুনতে পাইনি।'

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের দুই চারটি ইঁট সরাতেই দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কি চকচক করিতেছে।

পিতা-পুত্র তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসি বাদশাহি আশরফিতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসি উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসি উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখরো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে। সাপটা আবার এসেছে ঐখানে।'

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চলে গেছে, আমি দেখেছি।'

কিন্তু এ সাপটা প্রথমই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসি ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখরো মারিতেও নাই।

কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখরো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসির একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসি ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসি তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। এক মনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্ম-গোখরো আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, 'ওই আগের সাপটা ! এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে। আহা, দেখেছ কীরকম নীল হয়ে গেছে !'

আরিফ ও তাহার পিতামাতা অবাক বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে পারে ! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিলেন।

কলসিতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবে, কোথায় রাখিবেন—ভাবিয়া পাইলেন না।

শ্বশুর-শাশুড়ি অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যিই মা, তোর সাথে মীর বাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এলো।!'

কিন্তু এই সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেউ জানিতে পারিল না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মীর পরিবারের সহজ জীবনযাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্তু বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধ হয়—আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায়ে আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মীর বাড়ির পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণ রূপে সংস্কার হইল। বাড়ি-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টরি হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোনো কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

২

এই অর্থ-প্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখরো-যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধকলার লোভেই তাহারা জোহরার পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প—মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীরভাবে বাড়ির সর্বত্র চলা-ফেরা করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ তো! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও এক প্রকার অসম্ভব। তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইলেন না।

জোহরা হয়তো রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ি দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ শাশুড়ি খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটিতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে

বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায় !

ভয়ে শাশুড়ির পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখরোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চিৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির বাটিতে শয়ন করে।

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মতো তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনিদের মতো নির্বিকার নিঃশকচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুটি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতি-পটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃচিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে ! তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবু তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সমস্ত হৃদয়-মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মতো সে ঐ সর্প-শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহ তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ও নাই ! তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত-ফণা ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ—তাহার উপর রাগও করিতে পারে না ! রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার তো কোনো অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবসে বলিয়াছিল, 'জোহরা তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য ! মেরে ফেলি ও দুটোকে ! এরচেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশি শান্তিময় ছিল !'

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রু-ভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে ! বলে, 'ওরা আমার ছেলে ! ওরা তো কোনো ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না তো ওরা !'

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, 'তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম ! আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না ! এরচেয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশি সুখের হত !'

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে। ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা, পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছুদিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়তো সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে।

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা বহুদিন বাপের বাড়ি যাও নি, তোমার বাবাকে দু-তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এসো।'

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতামাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণ-কান্তি স্বর্ণ-ভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতামাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু একদিন যাইতে না যাইতে পিতা-মাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'হাঁরে আরিফকে চিঠি লিখব আসতে?'

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, 'না মা, উনি তো শনিবারেই আসবেন!'

জামাই আসিল, তবু কন্যার চোখেমুখে পূর্বের মতো সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, 'সত্যি বলতো জোহরা, তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে!'

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'না মা! উনি তো আগের মতই আমায় ভালোবাসেন! বাড়িতে আমার দুটি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।'

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ির প্রথা মতো সেই সন্তান দুটিকে বাড়িরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া একথা বলিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কেহ কোনো কথা বলে না। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশি ক্রুদ্ধ হইল। কি তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবার আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, 'বাবা! জোহরা তো এক রকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে! ওর কি কোনো রোগ বেরামই হল, তাও তো বুঝতে পারছি নে—দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!'

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্পতত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়তো সেই সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে!

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দুটিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই এক দিনই তাহারা কি উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ির কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

উদ্যত-ফণা আশী-বিষ! তবু সে কী তাহাদের কাতর মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা—একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়!

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনোরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, 'বাবা, জান তো আমরা কত গরিব! মেয়ে তো শয্যা নিয়েছে! দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা তো দূরের কথা! মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছু দিনের জন্য ওকে কলকাতায় বা বাড়িতে নিয়ে যাও। তারপর ভালো হলে ওকে আবার রেখে যেয়ো!' বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

৩

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক বোধ হয় স্ত্রীলোক জোহরার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে। ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল ; তাহার চিৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত। সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল, যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বে আর একটি কামরা—স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা স্টিলের ট্রাঙ্কে জোহরার গহনাপত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা!

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনাপত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, 'তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার ও কয়টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক, তোমাকে তো চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস তোমার কাছে থাক! আর তাছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না!'

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল, ঐ মেয়ে ডাকাত আর কেহ নয় সে তাহার শাশুড়ি—জোহরার মাতা।

দুদিন আগের ঝড়ে ঘরের কতগুলো খড় উঠিয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র-কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ি সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী।

সে আর উচ্চবাচ্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল, তাহার শাশুড়ির পিছু পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইল ঐ ডাকাতও আর কেউ নয়—তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটি বাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ি তখন চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে।

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ়তার মতো চাহিয়া রহিল।

আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, 'আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার যে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।'

বলাবাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ির ক্রন্দন থামিয়া গেল। শ্বশুর–শাশুড়ি দুইজন পরস্পরের মুখ চাওয়া–চাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, 'কে বাবা সে চোর? দেখেছ? সত্যিই দেখেছ তাকে?'

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, 'জি হাঁ দেখেছি! কলিকাল কিনা, তাই সব কিছু উল্টে গেছে! যার চুরি গেছে, তারি চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!'

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল ও ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে হয়তো এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহার মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর আরিফ বলিল, 'সে এখনি এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! এ নরকপুরীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না।'

শ্বশুর–শাশুড়ি যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমনকি জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙ্গাইল, পিতা–মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, 'আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনো অপরাধ করি নি।'

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজি হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে।

স্বামীর নির্দেশ মতো জোহরা পিতা–মাতাকে আর কিছুই প্রশ্ন করিল না।

৪

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা–মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা–জামাতার হাতে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্তত সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়!

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ির বায়ুতেও যেন কিসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজি হইল, সে আজ দেখিবে—মানুষের ভণ্ডামির সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ করিতে লাগিল, সে এ বাড়িতে আর জল স্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ ধরিল, না, সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িল! সে মুর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিল—'রাক্ষুসী!'

আরিফের বুঝিতে বাকি রহিল না সে কি খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না! এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতা-মাতাকে বলিয়া যাইবে। সে উর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

স্টেশনে পৌঁছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিল। রক্ত-বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন মাস্টার চিৎকার করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবি পোশাক-পরা বাঙালি চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'এটা ফার্স্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও।'

আরিফ কোনো কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত-বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙালি সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিল, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র বলিল, 'আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার—'

বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফঃস্বলে এক বড় জমিদার বাড়ির 'কলে' গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেন্ট' কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া, তাহার সাহায্যে আরিফকে ভালো করিয়া শোয়াইয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া ইন্‌জেকশন দিলেন। দুই তিনটা ইনজেকশন দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ি থামান নাই। কারণ গাড়ি কলিকাতা পঁহুছিতে দেরি হইলে হয়তো এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পৌঁছুলে, ডাক্তার সাহেব এ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মতো ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হোক।

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতা-মাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

৫

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পাল্কি করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতা হাসপাতাল হইতে মোটরযোগে বাড়ি ফিরিয়াছে!

আশ্চর্য! সে বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু পিতা-মাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা তো মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে!

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত! সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরেও না!

সে তখনও জানে না যে, সে আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে! আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারি প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া উঠিয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, 'একি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একি চেহারা হয়েছে তোর?'

আরিফ শান্ত স্বরে বলিল, 'কলেরা হয়েছিল, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।'

পিতা-মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান-খয়রাৎ করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মৌলুদ শরিফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ির দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কি থামিল।

জোহরা পাল্কি হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'তুমি এসেছ—বেঁচে ফিরে এসেছ?'

বলিতে বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙ্গিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তোরা দুজনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি?'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, 'আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে!'

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'না, না, তুমি শাস্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মার!'

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, 'এই নাও শাস্তি!'

৬

দুঃখ বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখরোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে! কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে! সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগ-রাজেশ্বরী!

বাড়িতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখরোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শাশুড়ি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্নে দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, 'মাগো, বড় ক্ষিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি। আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে! একটু দুধ! মা! একটু দুধ! বড় ক্ষিদে!' 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী। সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী। তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মতো সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখেই মীর পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট্ট কবর, যেন দুটি যমজ ভাই—গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'খোকা! খোকা! কে তোদের এত ফুল দিয়াছে বাবা! খোকা!'

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাঁহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখরো-যুগল।

জোহরা উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল, 'খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়লো?' জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মত তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল পদ্ম-গোখরোদ্বয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বারে বারে জিভ বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—মা গো বড় ক্ষিদে! তুমি তো ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ!

বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে!

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া-ভরা দুগ্ধ।

বাটিতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মতো বাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা!

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ি উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মুক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'ও মা, কি হবে, এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনি তুমি এসেছ, আর অমনি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!'

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!'

শাশুড়ি বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, 'সত্যিই ওরা তোমার খোকা বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা, শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না! চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কত কি দেখব!'

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপানবশতই নির্জীবের মতো বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল।

৭

সেইদিন সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মা গো, ভূতে ধরলো গো! জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!'

বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়িময় ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, 'হাঁ রে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা তো বলিস নি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।'

আরিফ বলিতেছিল, 'কিন্তু এখন তো ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে তো সাত মাস।'

এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল, 'ভূত ! ভূত ! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত।'

বাড়ির চাকর-চাকরানি সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে—জ্যান্ত ভূত ! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে ! বাড়ির মধ্যে আমগাছ-তলায় দাঁড়াইয়া আছে !

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই তো কে যেন গাছতলায় প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া !

তাঁহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে !'

জোহরা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা তুমি !' আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল, 'য়্যাঁ বেয়াই ?'

জোহরা তখন চিৎকার করিতেছে, 'ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত ! ওকে মার ! মেরে বের করে দাও !'

হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টিদ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিতেছে—'ওরে বাপরে সাপে খেয়ে ফেলল ! আমায় সাপে খেয়ে ফেলল !'

জোহরা উন্মাদিনীর মতো তাহার শাশুড়ির হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল—'ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেললে ! ওকে ধর ! ওকে ধর !'

জোহরার সাথে সাথে সকলে আমগাছ-তলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরার পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখরোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার 'খোকা' এবং একবার 'বাবা' বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেলে, সে জিজ্ঞাসা করিল—'আমার খোকারা কই ? আমার পদ্ম-গোখরো ? আমার বাবা ?'

আরিফ কাঁদিয়া বলিল, 'জোহরা ! জোহরা ! কেউ নেই ! সব গেছে ! সকলে গেছে ! তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম-গোখরোর কামড়ে !'

তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়তো তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরানি দেখতে

পেয়ে ভূত বলে চিৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখরো তাঁকে তাড়া করে!'

জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক। আমার পদ্ম-গোখরো—আমার খোকারা কোথায় বলো?'

আরিফ বলিল, 'তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!'

জোহরা, 'এঁ্যা খোকারা নাই?' বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের গোলার নীচে এক জোরা মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

জিনের বাদশা

ফরিদপুর জেলায় আরিয়ল খাঁ নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম। নাম মোহনপুর। অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী মুসলমান। গ্রামের একটেরে ঘরকতক কায়স্থ। যেন ছোঁয়াচের ভয়েই ওরা একটেরে গিয়ে ঘর তুলেছে।

তুর্কি ফেজের উপরের কালো ঝাণ্ডিটা যেমন হিন্দুত্বের টিকির সাথে আপোস করতে চায়, অথচ হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনি গ্রামের মুসলমানেরা কায়স্থপাড়ার সঙ্গে ভাব করতে গেলেও কায়স্থ–পাড়া কিন্তু ওটাকে ভূতের বন্ধুত্বের মতোই ভয় করে।

গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে চুন্নু ব্যাপারি মাতব্বর লোক। কিন্তু মাতব্বর হলেও সে নিজে হাতে চাষ করে। সাহায্য করে তার সাতটি ছেলে এবং তিনটি বউ। কেন যে সে আর একটি বউ এনে সুন্নত আদায় করে নি, তা সে–ই জানে। লোকে কিন্তু বলে, তার তৃতীয় পক্ষটি একেবারে 'খরে–দজ্জাল' মেয়ে। এরই শতমুখী অস্ত্রের ভয়ে চতুর্থ পক্ষ নাকি ও–বাড়ি মুখো হতে পারেনি। এর জন্য চুন্নু ব্যাপারির আফসোসের আর অন্ত ছিল না। সে প্রায়ই লোকের কাছে দুঃখ করে বলত, 'আরে, এরেই কয়—খোদায় দেয় তো জোলায় দেয় না ! আল্লা মিয়া তো হুকুমই দিছেন চারড্যা বিবি আনবার, তা কপালে নাই, ওইবো কোহান থ্যা !' বলেই একটু ঢোক গিলে আবার বলে, 'ওই বিজাত্যার বেডিরে আন্যাই না এমনডা ওইলো !' বলেই আবার কিন্তু সাবধান করে দেয়, 'দেহিও বাপু, বারিত গিয়া কইয়্যা দিয়ো না। হে বেডি হুনল্যা এক্কেরে দুপুর্‌্যা মাতম লাগাইয়া দিবো !'

এই তৃতীয় পক্ষেরই তৃতীয় সন্তান 'আল্লা–রাখা' আমাদের গল্পের নায়ক। গল্পের নায়কের মতোই দুঃশীল, দুঃসাহসী, দুঁদে ছেলে সে ! গ্রামে কিন্তু এর নাম 'কেশরঞ্জন বাবু'। এ নাম এরে প্রথম দেয় ঐ গ্রামেরই একটি মেয়ে। নাম তার 'চান ভানু' অর্থাৎ চাঁদ বানু। সে কথা পরে বলছি।

চুন্নু ব্যাপারির তৃতীয় পক্ষের দুই–দুইবার মেয়ে হবার পর তৃতীয় দফায় যখন পুত্র এল, তখন সাবধানী মা তার নাম রাখলে আল্লা–রাখা। আল্লাকে রাখতে দেওয়া হল যে ছেলে, অন্তত তার অকালমৃত্যু সম্বন্ধে—আর কেউ না হোক মা তার নিচিন্ত হয়ে রইল ! আল্লা হয়তো সেদিন প্রাণ ভরে হেসেছিলেন ! অমন বহু 'আল্লা–রাখা'কে আল্লা 'গোরস্থান–রাখা' করেছেন, কিন্তু এর বেলায় যেন রসিকতা করেই একে সত্যি সত্যিই জ্যান্ত রাখলেন ! মনে মনে বললেন, 'দাঁড়া, ওকে বাঁচিয়ে রাখব, কিন্তু তোদের জ্বালিয়ে মেরে ছাড়ব !' সে পরে মরবে কি–না জানি না, কিন্তু এই বিশটে বছর যে সে

বেঁচে আছে, তার প্রমাণ গাঁয়ের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছে ! তার বেঁচে থাকাটা প্রমাণ করার বহর দেখে গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, ও গুয়োটা আল্লা-রাখা না হয়ে যদি মামদোভূত হত, তা হলেও বরং ছিল ভালো। ভূতেও বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারে না !

ওকে মুসলমানরা বলত, 'ইবলিশের পোলা,' কায়েতেরা বলত, 'অমাবস্যার জস্মিৎ !' বাপ বলত, 'হালার পো', মা আদর করে বলত—'আফলাতুন !'

এইবার যে মেয়েটির কল্যাণে ওর নাম কেশরঞ্জন বাবু হয়, সেই চান ভানুর একটু পরিচয় দিই।

মেয়েটি ঐ গাঁয়েরই নারদ আলি শেখের। নারদ আলি নামটা হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাখা নয়। নারদ আলি অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগের মানুষ। অসহযোগ আন্দোলন যদ্দিনের, তা ওর হাঁটুর বয়েস ! বাম পায়ের হাঁটু আর বললাম না, ওটা অতিরঞ্জন হবে !

নারদ আলি, শেখ রামচন্দ্র, সীতা বিবি প্রভৃতির নাম এখনো গাঁয়ে দশ-বিশটে পাওয়া যায় ! অবশ্য, হনুমানুল্লা, বিষ্ণু হোসেন প্রভৃতি নামও আছে কি-না জানিনে।

নারদ আলি গায়ের মাতব্বর না হলে অবস্থা ওর মন্দ নয়। যা জমি-জায়গাটা আছে তার, তারি উৎপন্ন ফসলে দিব্যি বছর কেটে যায়। ও কারুর ধারও ধারে না, কাউকে ধার দেয়ও না।

দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষটি ! কিন্তু ওর বউটি ঝগড়া-কাজিয়া না করলেও কাজিয়া ভান করে যে মজা করে, তা অন্তত নারদ আলির কাছে একটু অশান্তিকর বলেই মনে হয়। লোক ক্ষ্যাপানো বউটার স্বভাব। কিন্তু সে রসিকতা বুঝতে না পেরে অপর পক্ষ যখন ক্ষেপে ওঠে তখন সে বসে কিছুক্ষণ কোঁদল করার ভান করে হঠাৎ মাঝ উঠানে ধামাচাপা দিয়ে বলে ওঠে, 'আজ রইল কাজিয়া ধামাচাপা, খাইয়া লইয়া আই, তারপর তোরে দেখাইবো মজাডা ! এই ধামারে যে খুলবো, তার লল্লাটে আল্লা ভাসুরের সাথে নিকা লিখছে !' বলেই এমন ভঙ্গির সাথে সে ধামাটা চাপা দেয় এবং কথাগুলো বলে যে, অন্য লোকের সাথে সাথে- যে ঝগড়া করছিল সেও হেসে ফেলে ! অবশ্য, রাগ তাতে তার কমে না।

এদেরি একটি মাত্র সন্তান—চান ভানু। পুঁথির কেসসা শুনে মায়ের আদর করে রাখা নাম !

চান ভানু যেন তার মায়েরই ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ! চোখে মুখে কথা কয়, ঘাটে মাঠে ছুটোছুটি করে, আরিয়ল খাঁর জল ওর ভয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চায় !

চৌদ্দ বছর বয়স হয়ে গেল, অথচ বাপে বললেও মায়ে বিয়ের নাম করতে দেয় না। বলে, চান চলে গেলে থাকব কি করে আঁধার পুরীতে। নারদ আলি বেশি কিছু বললে বউ তার তাড়া দিয়ে বলে ওঠে, 'তোমার খ্যাচ-খ্যাচাইবার ওইবো না, আমার মাইয়্যা বিয়া বসব না—জৈগুন বিবির লাহান উয়ার হানিপ যদ্দিন না আয়ে !'

মোহনপুরের জৈগুন বিবি—চান ভানুর 'হানিফ' বীরের কিন্তু আসতে দেরি হল না এবং সে হানিফ আমাদের আল্লা-রাখা।

একদিন হঠাৎ আল্লা-রাখার সোনাভানের পুথি পড়তে পড়তে মনে হল, চান ভানুই সে সোনাভানবিবি এবং সে গাজি হানিফা। তার কারণ, চানের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ে ছিল না। সে সোনাভান বিজয়ের জন্য জয়যাত্রার চিন্তা করতে করতে পড়ে যেতে লাগল—

'হানিফার আওয়াজ বিবি শুনিল যখন,
নাশতা করিয়া নিল থোড়া আশি মণ।
লক্ষ মণের গোর্জ বিবির হাজার মণের ঢাল,
বারো ঘোড়ায় চড়ে বলে তুলবো পিঠের খাল!'

বাপ্‌ রে! এ যেন হানিফার বাবা! এ আবার আশি মণ নাশতা করে, বারোটা ঘোড়ার এক সাথে চড়ে! চান ভানুও ঐ রকম কিছু করবে নাকি? আল্লা-রাখা রীতিমতো হকচকিয়ে গেল। কিন্তু হেরে হেরেও তো হানিফাই শেষে কেল্লা-ফতে করেছিলেন! যা থাকে কপালে! আল্লা-রাখা তার বাবরি চুলের মাঝে একটা এবং দুদিকে দুটো—এই তিন তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, যায় জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে, গালে বেশ করে পান ঠুসে সোনাভান ওর্ফে চান ভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

এইখানে বলে রাখি, আমাদের আল্লা-রাখা পুঁথি পড়ে যতদূর আধুনিক হবার—তা হয়ে উঠেছিল। সে ঠিক চাষার ছেলের মতো থাকত না, পরিষ্কার ধুতি-জামা-জুতো পরে লম্বা চুলে তেড়ি কেটে, পান সিগারেট খেতে খেতে গাঁয়ের রাস্তায় টহল দিত এবং কার কি অনিষ্ট করবে তারি মতলব আঁটত। কিন্তু বয়স তার যৌবনের 'ফ্রন্টিয়ার' ক্রস করলেও মেয়েদের ওপর কোনো অত্যাচার কোনোদিন করেনি। তার টার্গেট ছিল বেশির ভাগ বুড়ো-বুড়ির দল; বাড়ির, মাঠের ফল-ফসল; গাছের আগা, ঘরের মটকা এবং রাত্রে বাঁশঝাড়, তেঁতুলগাছ, তালগাছ ইত্যাদি।

অকারণে বলদ ঠ্যাঙানো বা তাদের দড়ি খুলে দিয়ে বাবাকে লোকের গাল খাওয়ানো ছাড়া বাবার চাষবাসে অন্য বিশেষ সহায়তা সে করেনি। দুবার সে মাঠ তদারক করতে গেছিল, তাতে একবার মাঠের পাকাধানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, আর একবার সমস্ত ধান কেটে অন্যের ক্ষেতে রেখে এসেছিল। এরপর তার বাবা আর তাকে সাহায্য করতে ডাকেনি।

তার বিলাসিতার টাকা যখন তার মা একদিন বন্ধ করলে এবং বাবার কাছে চেয়েও তার বাবা যখন ওরই বদলে গড়পড়তা হিসেব করে তার পৃষ্ঠে বেশ কিছু কষে দিলে পাঁচনি দিয়ে, তখন সে বাড়ি থেকে পালিয়েও গেল না, কাঁদলেও না, কারুর কাছে কোনো অনুযোগও করলে না। সেইদিন রাত্রে চুনু ব্যাপারির বাড়িতে আগুন লেগে গেল। আল্লা-রাখা সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধূম্র উদ্‌গীরণ করতে করতে যা বলে উঠল, তার মানে—আজ দিয়াশলাই কিনবার পয়সা ছিল না, ভাগ্যিস ঘরে তাদের আগুন লেগেছিল তাই সিগারেটটা ধরানো গেল।

তার বাবা যখন আল্লা-রাখাকে ধরে দুর্মুশ-পেটা করে পিটাতে লাগল, সে তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে খেতে বলতে লাগল যে, সকালে মার খেয়ে বড্ডো পিঠ ব্যথা করতেই তো সে পিঠে সেঁক দেবার জন্য ঘরে আগুন লাগিয়েছে! আজ আবার যদি পিঠ বেশি ব্যথা করে, পাড়ার কারুর ঘরে আগুন লাগিয়ে ও ব্যথায় সেঁক দিতে হবে।

এই কবুল জবাব শুনে ওর বাবার যেটুকু মারবার হাত ছিল, তাও গেল ফুরিয়ে! সে ছেলের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলতে লাগল, 'তোর পায়ে পড়ি পোড়াকপাল্যা, হালার পো, ও-কম্মডা আর করিস না, হক্কলেরে জেলে যাইবার অইবো যে!' যাক, সেদিন গ্রামের লোকের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয়ে গেল যে, অন্তত গ্রামের কল্যাণের জন্য ওর বাবা ওর বাবুয়ানার খরচটা চালাবে! আল্লা-রাখা গম্ভীর হয়ে সেদিন বলেছিল, 'আমি বাপকা বেটা, যা কইবাম, তা না কইর‍্যা ছারতাম না!' সকলে হেসে উঠল, এবং যে বাপের বেটা সে, সেই বাপ তখন ক্রোধে দুঃখে কেঁদে ফেলে ছেলেকে এক লাথিতে ভূমিস্যাৎ করে চিৎকার করে উঠল—'হুনছ নি হালার পোর কতা! হালার পো কয়, বাপকা বেডা! তোর বাপের মুহে মুতি!' এবার আল্লা-রাখাও হেসে ফেললে!

যাক—যা বলছিলাম। ধোপ-দোরস্ত হয়ে আল্লা-রাখা অবলীলাক্রমে নারদ আলির উঠোনে গিয়ে ঠেলে উঠে ডাকতে লাগল—'নারদ ফুফা, বারিত আছনি গো'—এই চির-পরিচিত গলার আওয়াজে বাড়ির তিনটি প্রাণী এক সাথে চমকে উঠল। চানের মা বলে উঠল, 'উই শয়তানের বাচ্চাডা আইছে!'

চান ভানু তখন দাওয়ায় বসে একরাশ পাকা করমচা নিয়ে বেশ করে নুন আর কাঁচা লঙ্কা ডলে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে টাকরায় ঠোকর দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার করছিল। সে তার টানা টানা চোক দুটো বার দুয়েক পাকিয়ে আল্লা-রাখার তিন তেরিকাটা চুলের দিকে কটাক্ষ করে বলে উঠল, 'কেশরঞ্জন বাবু আইছেন গো, খাডুলিডা লইয়া আইও!' বলেই সুর করে বলে উঠল—

'এসো-কুড়ম বইয়ো খাটে,
পা ধোও গয়া নদীর ঘাটে,
পিঠ ভাঙবাম চেলা কাঠে!'

বলেই হি হি করে হেসে দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল!

আল্লা-রাখা এ অভিনয় অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে রণে ভঙ্গ দিল। মোহনপুরের হানিফার এই প্রথম পরাজয়!

এ কথাটা চান ভানুর মায়ের মুখ হতে মুখান্তরে ফিরে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। এর পর থেকেই আল্লা-রাখাকে দেখলে, সকলে, বিশেষ করে মেয়েরা বলে উঠত—'উই কেশরঞ্জন বাবু আইত্যাছেন!'

অপমান করলে চান ভানু এবং আল্লা-রাখা তার শোধ তুললে সারা গাঁয়ের লোকের ওপর। আল্লা-রাখা পান-সিগারেট খাইয়ে গাঁয়ের কয়েকটি ছেলেকে তালিম দিয়ে দিয়ে প্রায় তৈরি করে এনেছিল! তাদেরি সাহায্যে সে রাত্রে সে গ্রামের প্রায় সকল ঘরের

দোরের সামনে যে সামগ্রী পরিবেশন করে এল, তা দেখলেই বমি আসে—শুঁকলে তো কথাই নেই!

গ্রামের লোক বহু গবেষণাতেও স্থির করতে পারলে না, অত কলেরার রুগী কোত্থেকে সে রাত্রে গ্রামে এসেছিল! তাছাড়া তেঁতুল-পাতা খেয়ে যে মানুষের বদহজম হয়, এও তাদের জানা ছিল না। গো-বর, 'নর-বর' ও পচানি ঘাঁটার সাথে গাঁদাল পাতার সংমিশ্রণের হেতু না হয় বোঝা গেল; কিন্তু ও মিকশচারের সাথে তেঁতুল-পাতার সম্পর্ক কি? কিন্তু এ রহস্য ভেদ করতে তাদের দেরি হল না, যখন তারা দেখলে—আর সব দ্রব্য অল্প আয়াসে উঠে গেলেও তেঁতুল-পাতা কিছুতেই দোর ছেড়ে উঠতে চাইল না! বহু সাধ্য-সাধনায় বিফলকাম হয়ে দোরের মাটি শুদ্ধ কুপিয়ে তুলে যখন তিন্তিড়ি-পত্রের হাত এড়ানো গেল, তখন সকলে একবাক্যে বললে—না; ছেলের বুদ্ধি আছে বটে! তেঁতুল-পাতার যে এত মাধ্যকর্ষণ শক্তি, তা সেদিন প্রথম গ্রামের লোক অবগত হল!

সারাগ্রামে মাত্র একটি বাড়ি সেদিন এই অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেল। সে চান ভানুদের বাড়ি। নিজের বাড়িকেও যে রেহাই দেয় নি, সে-যে কেন বিশেষ করে চানভানুরই বাড়িকে—যার ওপর আক্রোশে ওর এই অপকর্ম-উপেক্ষা করলে, এর অর্থ বুঝতে অন্তত চান ভানুর আর তার মা-র বাকি রইল না!

সে যেন বলতে চায়—দেখলে তো আমার প্রতাপ! ইচ্ছে করলেই তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারতাম, কিন্তু নিলাম না! তোমাকে ক্ষমা করলাম।

এই কথা ভাবতে ভাবতে পরদিন সকালে চান ভানু হঠাৎ কেঁদে ফেললে! ক্রোধে অপমানে তার শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো মুখ—কৃষ্ণপক্ষের উদয়-মুহূর্তের চাঁদের মতো রক্তাভ হয়ে উঠল। তার মা মেয়েকে কাঁদতে দেখে অস্থির হয়ে বলে উঠল, 'চান, কাঁদছিস কিয়ের ল্যাইগ্যা রে! তোর বাপে বকছে?' চান ভানু বাপ-মায়ের একটি মাত্র সন্তান বলে যেমন আদুরে, তেমনি অভিমানী। তার মা মনে করলে ওর বাবা বুঝি মাঠে যাবার আগে মেয়েকে কোনো কারণে বকে গেছে।

চান আরো কেঁদে উঠে যা বলে উঠলো তার মানে-কেন আল্লা-রাখা তাদের এ অপমান করবে। সকলের বাড়িতে অপকর্মের কীর্তি রেখে ওদের বাদ দিয়েও গ্রামবাসীকে জানাতে চায় সে ওদের উপেক্ষা করে—ক্ষমার্হ ওরা! এর চেয়ে ওর অপমান যে ঢের ভালো ছিল।

মা মেয়েকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝালো। কাল অমন করে ওকে অভ্যর্থনা করার দরুনই যে সে এসব করেছে তাও বললে। চান ভানুর মন কিন্তু কিছুতেই আর প্রসন্ন হয়ে উঠল না। আল্লারাখা কাঁটার মতো তার মনে এসে বিঁধতে লাগল।

আল্লা-রাখা হানিফার মতোই তীরন্দাজ। তার প্রথম তীর ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে।

সেদিন দুপুরে যখন চান ভানু আরিয়ল খাঁতে স্নান করতে যাচ্ছিল, তখন তার ম্লান মুখ দেখে আল্লা-রাখা যেমন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠল, তেমনি তার বুকে কাঁটার

মতো কি একটা ব্যথা যেন খচ করে উঠল। আহা ! ওর মুখ মলিন ! না, চান ভানুও সোনাভানের মতোই তীর ছুঁড়তে জানে। তারও অলক্ষ্য লক্ষ্য ঠিক জায়গায় এসে বিঁধল।

আল্লা–রাখার চোখে চোখ পড়তেই ম্লানমুখী চান ভানুর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। এ হাসির জন্য সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না ! এত বড় শয়তানের এমন চুনিবিল্লির মতো মুখ। এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায় !

কিন্তু হেসেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এ হাসির যদি আল্লা–রাখা অন্য মানে করে বসে ! ছি ছি ছি ছি !

কিন্তু চান ভানুকে এ লজ্জার দায় বেশিক্ষণ পোহাতে হল না। ওর হাসির ছুরি একটু চিক চিকিয়ে উঠতেই আল্লা–রাখা রণে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। সে মনে করল, এ হাসির বিজলির পরেই বুঝি ভীষণ বজ্রপাত হবে। চান দেখতে পেল, অদূরে একটা বিরাট বহুকালের পুরানো অশ্বত্থ গাছে আল্লা–রাখা তর তর করে উঠে একেবারে আগডালে গিয়ে বসল। কি ভীষণ ছেলে বাবা ! ও গাছে যে সাপ আছে সবাই বলে ! যদি সাপে কামড়ে দেয়, যদি ডাল ভেঙে পড়ে যায় ! চান ভানু খানিক দাঁড়িয়ে ওর কীর্তি–কলাপ দেখে এই ভাবতে ভাবতে নদীর জলে স্নান করতে নামল।

নদীতে নেমেই তার মনে হল, ছি ছি, সে করেছে কি ! কেন সে ঐ বাঁদরটাকে অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে ! ও যে আস্কারা পেয়ে মাথায় চড়ে বসবে ! না জানি সে এতক্ষণ কি মনে করছে !

তার আর সেদিন সাঁতার কাটা হল না। আরিয়ল খাঁর জল আজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ! চান ভানু চুপ করে গলা–জলে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আজ তার এই প্রশ্নই মনে বারে বারে উদয় হয়েছে—কেন আল্লা–রাখা ওদের বাড়ি কাল অমন করে গিয়েছিল ! ও ত কারুর বাড়ির ভিতর সহজে যায় না। কেন সে ওকে দেখে অমন করে তাকিয়ে ছিল। তারপর সারা গাঁয়ের লোকের উপর অত্যাচার করে কেনই বা তার অপমানের প্রতিশোধ নিলে, ওকেই বা কিছু বললে না কেন ! ও শুধু বাঁদর নয়, ও বুঝি পাগলও !

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হল, সে বুঝি অশ্বত্থ গাছ থেকে তাকে দেখছে। অনেকটা দূরে অশ্বত্থ গাছটা। তবু সে স্পষ্ট দেখতে পেল, অশ্বত্থ গাছটার ওধারের ডাল থেকে কখন সে এ ধারের ডালে এসে ওরির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কি বালাই ! চান ভানুর মনে হতে লাগল, ও বুঝি আর কিছুতেই জল ছেড়ে উঠতে পারবে না ! ওকে তো আরও কতবার দেখেছে, ওরই সামনে সাঁতরেওছে এই নদীতে ; কিন্তু এ লজ্জা—এ সঙ্কোচ তো ছিল না ওর। কি কুক্ষণে কাল–সন্ধ্যায় সে ওদের বাড়িতে পা দিয়েছিল !

এ যেন কালবোশেখির মেঘের মতো, যত ভয় করে, তত দেখতেও ইচ্ছে করে !

এবারেও তাকে আল্লা–রাখা মুক্তি দিল। চান ভানু দেখলে, আল্লা–রাখা গাছ থেকে নেমে যাচ্ছে।

এইবার তার ভীষণ রাগ হল ঐ হতচ্ছাড়ার উপর। সে মনে করে কি! সে কি মনে করে, সে গাছে বসে থাকলে ও স্নান করে উঠে যেতে পারে না? তাই সে দয়া করে নেমে গেল! ও কি মনে করেছিল, পথে দাঁড়িয়ে থাকলে চান ভানু আর নদীতে যেতেই পারবে না, ভয়ে লজ্জায়? তাই সে পথ ছেড়ে চলে গেছিল? চান নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগল। আজ সে দেখিয়ে দেবে যে, যত বড় শয়তান হোক সে, তাকে চান ভানু থোড়াই কেয়ার করে! জলের মধ্যেও তার শরীর যেন জ্বলতে লাগল। তাড়াতাড়ি স্নান করে উঠে সে জোরে জোরে পথ চলতে লাগল। এবার যদি পথে দেখা পায় তার, তা হলে দেখিয়ে দেবে কেমন করে ওর নাকের তলা দিয়ে চান হনহনিয়ে চলে যেতে পারে! ওকে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না!

কিন্তু কোথাও কেশরঞ্জন বাবুর কেশাগ্রও সে দেখতে পেল না! এবারেও সেই অপমান, সেই দয়া? ওকে চান ঘৃণা করে—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে! কিন্তু এ কি, ওকে একটু অপমান করতে পারল না বলেই কি মনটা এমন হঠাৎ মলিন হয়ে উঠল? ওকে পথে দেখতে পেল না বলে মনটা ক্রমে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল কেন? যে জোরে সে নদী থেকে আসছিল, পায়ের সে জোর গেল কোথায়? এ কি হল চানের? ওর ঘাড়ে কি তবে ভূত চাপল?

পঞ্চশরের ঠাকুরটির শরে কেউটে সাপের মতোই হয়তো তীব্র বিষ মাখানো থাকে। শর বিঁধবা মাত্র ও বিষ সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর ছেয়ে মাথায় গিয়ে ওঠে! নৈলে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চানের অবস্থা এমন সঙিন হয়ে উঠত না! ওকে ভুলতেও পারে না, মনে করতেও শরীর রাগের জ্বালায় তপ্ত হয়ে ওঠে।

আজ প্রথম চান ভানুর আহারে অরুচি হল। মা প্রমাদ গুণলে। আইবুড়ো মেয়ে বেশি বড় হলে কেন যে ভূতগ্রস্ত হয়—মা যেন আজ তা বুঝতে পারল। গোপনে চোখ মুছে মনে মনে বললে, ভূতে নজর দিয়েছে মা!—আর তোকে রাখা যাবে না, এইবার তোর মায়া কাটাতে হবে!

নারদ আলি আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন তার বউ মেয়ের পাত্র-সন্ধানের জন্য বলল তাকে। কোনো কথা হল না, দুই জনারই চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

২

চান ভানুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। আর মাসখানেক মাত্র বাকি। পাশের গাঁয়ের ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে বিয়ে।

মোহনপুরের হানিফা, আমাদের আল্লা-রাখা চান ভানুর কেশরঞ্জন বাবু—এ সংবাদে একেবারে 'মরিয়া হইয়া' উঠল। ইসপার কি উসপার। তার চান ভানুকে চাই-ই-চাই। সে জানত, চান ভানুর বাপ-মা কিছুতেই তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কাজেই বিয়ের প্রস্তাব করা নিরর্থক। তার মাথায় তখন জৈগুন সোনাভানের কাহিনী হর্দম

ঘুরপাক খাচ্ছে। সে চান ভানুকে হরণ করে দেশান্তরী হয়ে যাবে ! কিন্তু ওপথের একটা মুশকিল এই যে, ওতে চান ভানুর সম্মতি থাকা দরকার। কি করে ওর সম্মতি নেওয়া যায় ?

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটল না। এগার দিনের দিন আল্লা আল্লা–রাখার পানে যেন মুখ তুলে চাইলেন।

এর মধ্যে কতদিন দেখা হয়েছে চান ভানুর সাথে তার, কিন্তু কিছুতেই একবারের বেশি দুবার ওর চোখের দিকে সে তাকাতে পারেনি। যার ভয়ে সারাগ্রাম থরহরি কম্পমান, তার কেন এত ভয় করে এইটুকু মেয়েকে—আল্লা–রাখা ভেবে তার কূল–কিনারা পায় না। কিন্তু আর তো সময় নাই, আর তো লজ্জা করলে চলে না। কত মতলবই সে ঠাউরালে। কিন্তু কিছুতেই কোনোটা কাজে লাগাবার সুযোগ পেলে না।

আজ বুঝি আল্লা মুখ তুলে চাইলেন। সেদিন সন্ধ্যায় চান ভানু যখন জল নিতে গেল নদীতে, তখন নদীর ঘাট জনমানবশূন্য।

চান ভানু নদীর জলে যেই ঘড়া ডুবিয়েছে—অমনি একটু দূরে ভুস করে একটা জলদানোর মুখ মালসার মত ভেসে উঠল এবং সেই মুখ থেকে আনুনাসিক স্বরে শব্দ বেরিয়ে এল—'তুই যদি আল্লা–রাখারে ছ্যাইর‍্যা আর কারেও সাদি করিস, হেই রাত্রেই তোদের ঘাড় মটকাইয়া আমি রক্ত খাইয়া আসমু !' চান ভানু ঐ স্বর এবং ঐ ভীষণ মুখ দেখে একবার মাত্র 'মা গো' বলে জলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল ! এই শুভ অবসর মনে করে জল দোনো নদী হতে উঠে এল এবং তার মাথা থেকে নানা রঙের বিচিত্র মালসাটা খুলে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে চান ভানুকে কোলে করে ডাঙায় তুলে আনলে। এ জল–দানো আর কেউ নয়, এ আমাদের সেই বিচিত্রবুদ্ধি আল্লা–রাখা ওর্ফে কেশরঞ্জন বাবু !

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চান ভানুর চৈতন্য হতেই সে নিজেকে আল্লা–রাখার কোলে দেখে—লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'তুমি কোহান থ্যা আইলে।' ঝরবার সময় বাঁশপাতা যেমন করে কাঁপে, তেমনই করে সে কাঁপতে লাগল। আল্লা–রাখা বলল, 'এই দিক দিয়া যাইতেছিলাম, দেহি কেডা ভাসতে আছে, দেইহ্যা ছুড্যা জলে ফাল দিয়া পরলাম, তুইল্যা দেহি তুমি ! আল্লারে আল্লা, খোয়ায় আনছিল আমারে এই পথে, নইলে কি অইত ! কি অইছিল তোমার ?'

দুচোখ ভরা কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিয়ে চান ভানু আল্লা–রাখার মুখের দিকে চেয়ে রইল ! তারপর জল–দানোর বাণীগুলি বাদ দিয়ে বাকি সব ঘটনার বললে...।

আল্লা–রাখা যখন চান ভানুকে নিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সব কথা বললে—তখন তাদের বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেল। চান ভানুর বাপ–মা কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ ভরে আল্লা–রাখাকে আশীর্বাদ করল। আল্লা–রাখা তার উত্তরে শুধু চান ভানুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'কেমন ! তোমার কেশরঞ্জন বাবুর পিঠ ভাঙবা নি চেলা কাঠ দিয়া ?'

আজ হঠাৎ যেন খুশির তুফান উথলে উঠেছিল চান ভানুর মনে। এই খুশির মুখে হঠাৎ তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'খোদায় যদি হেই দিন দেয়, ভাঙবাম পিঠ !' বলেই কিন্তু লজ্জায় তার মাটির ভিতরে মুখ লুকিয়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগল। ও

কথার অর্থ তো আল্লা-রাখার কাছে অবোধ্য নয়। কিন্তু সে দিন তো খোদা দেবেন না। কুড়ি দিন পরে যে সে হালদার বাড়ির বৌ হয়ে চলে যাচ্ছে। এ কি করল সে! সে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল! তার কেবলি ডুকরে ডুকরে কান্না পেতে লাগল।

আল্লা-রাখাও সেই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। চান ভানুর বাপ-মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ কি হল! কী এর মানে?

আল্লা-রাখা আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে নদীর ধারে ছুটে গেল। তখন চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশের সীমানা আলো করে। আল্লা-রাখার মনে হল ও চাঁদ নয়, ও চান ভানু--ওরই মনের আকাশ আলো করে উঠেছে আজ সে!

রাত্রি দশটা পর্যন্ত নদীর ধারে বসে বসে তারস্বরে চিৎকার করে সে গান করলে। তারপ বাড়ি ফিরে সে ভাবতে লাগল—শুধু জল-দানোর কথা নয়, জল-দানো যা যা বলেছে, সে কথাগুলো চান নিশ্চয় তার বাপ-মাকে বলেছে। কালই হয়তো ও সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে ওর বাম-মা আমাদের বাড়িতে এসে বিয়ে কথা পাড়বে। আর তা যদি না করে, নদীতে যদি আর না যায়, ডাঙায় ভূত তো বেঁচে আছে।

কিন্তু আরও দুটো দিন পেরিয়ে গেলেও যখন সেরকম কোনো কিছু ঘটল না, তখন আল্লা-রাখার বুঝতে বাকি রইল না যে, চান ভানু লজ্জায় বা কোনো কারণে জল-দানোর উপদেশগুলো তার বাপ-মাকে জানায়নি। তা হলে ওর বাপ-মা অমন নিশ্চিত হয়ে উঠোনে বিয়ে ছানলা তুলতে পারত না। বিফলতার আক্রোশ ক্রোধে সে পাগলের মতো হয়ে উঠল। আর দেরি করলে সব হারাবে সে, এইবার ভূতদের মুখ দিয়ে সোজা ওর বাপ-মাকেই সব কথা জানাতে হবে! সেদিন গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত রকম কান্নার শব্দে নারদ আলিদের ঘুম ভেঙে গেল! মনে হলো—ওদেরি উঠোনে বসে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। নারদ আলি মনে করলে আজও বুঝি পাশের বাড়ির সোভন তার বৌকে ধরে ঠেঙিয়েছে। সেই বৌটা ওদের বাড়ি এসে কাঁদছে। তবু সে একবার জিজ্ঞাসা করলে—'কেডা কাঁদে গো, বদনার মা নাকি?' কোনো উত্তর এল না। তেমনি কান্না।

কেরোসিনের ডিবাটা হাতে নিয়ে নারদ আলি বাইরে বেরিয়েই 'আল্লাগো' বলে, চিৎকার করে, ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিল! চানের মা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'কি গো, কি অইলো! কেডা?' নারদ আলি আর উত্তর না দিয়ে ১০৫ ডিগ্রি জ্বরের ম্যালেরিয়া রুগির মতো ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কেবলি 'কুলহুয়াল্লাহ' পড়ে বুকে ফুঁ দিতে লাগল। তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত তখন ভয়ে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে! যত হি-হি-হি-হি করে, তত 'তৌবা আস্তাগফার' পড়ে, তত সে আল্লার নাম নিতে যায়—কিন্তু আল্লার 'ল' পর্যন্ত এসে ভয়ে জিভে জড়িয়ে যায়।

চান ভানুর ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু ভূতের নাম শুনে সে বিছানা কামড়ে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে!

অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নারদ আলি বলতে লাগল, 'আল্লারে আল্লা! (নাকে কানে হাত দিয়ে) তৌবা আস্তগ ফারুল্লা! তৌবা তৌবা! আউজবিল্লা

(নাউজবিল্লা নয়!) বিসমিল্লা! আরে আমি বারাইয়া দেহি তাল গাছের লাহান একডা বুইর‍্যা মাথায় পগগ বাঁইন্দ্যা খারাইয়া আছে! দশ হাত-লম্বা তার দারি! আল্লারে আল্লা! ও জিনের বাদশা আইছিল আমাগো বারিত!'

শুনে চান এবং তার মা দুই জনেরই ভির্মি লাগাবার মতো হল। উক্ত তালগাছ-প্রমাণ লম্বা বৃদ্ধ জিনের বাদশা তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে কিনা, তা দেখবারও সাহস হল না কারুর। পাড়ার কাউকে চিৎকার করে ডাকবার মতো স্বরও কণ্ঠে অবশিষ্ট ছিল না! গলা যেন কে চেপে ধরেছে ওদের! তার ওপরে লোক ডাকলে যদি জিনের বাদশা চটে যায়! ওরে বাপরে, তা হলে আর রক্ষে আছে! তিনজনে বাতি জ্বালিয়ে বসে বসে কাঁপতে কাঁপতে আল্লার নাম জপতে লাগল!

জিনের বাদশা সে-রাতে আর কোনো উপদ্রব করলে না। আস্তে আস্তে জিনের বাদশা সামনের আম বাগানে ঢুকে ইশারা করতেই তিন চারটি বিচিত্র আকৃতির ভূত বেরিয়ে এল। তারা জিনের বাদশার বেশ বাস খুলে নিতে লাগল।

সে বেশ এইরূপ ছিল!—

প্রকাণ্ড দীর্ঘ একটা বাঁশের সাথে স্বল্প দীর্ঘ আর একটা বাঁশ আড়াআড়ি করে বাঁধা, দীর্ঘ বাঁশটার আগায় একটা মালসা বসিয়ে দেওয়া; সে মালসায় নানারকম কালি দিয়ে বীভৎস রকম একটা মুখ আঁকা, সেই মালসার ওপর একটা বিরাট পাগড়ি বাঁধা। মালসার মুখে পাট দিয়ে তৈরি য়্যা লম্বা দাড়ি ঝুলানো, আড়াআড়ি বাঁশটা যেন ওর হাত, সেই হাতে দুটো কাপড় পিরানের ঝোলা হাতার মতো করে বেঁধে দেওয়া; লম্বা বাঁশটার দুই দিকে দুটো সাদা ধুতি ঝুলয়ে দেওয়া; সেই ধুতি দুটোর মাঝে দাঁড়িয়ে সেই বাঁশটা ধরে চলা। অত বড় লম্বা একটা লোককে রাত্রি বেলায় ঐ রকমভাবে চলে যেতে দেখলে ভূতেরাই ভয় পায়, মানুষের তো কথাই নাই!

জিনের বাদশার পোশাক খুলে নেবার পর দেখা গেল—সে আমাদের আল্লা-রাখা!

ভূতের সর্দার আল্লা-রাখা তার চেলাচামুণ্ডা আসবাবপত্র নিয়ে সরে পড়ল। যেতে যেতে বলল, 'আজ আর না, আজ জিন দেখলো, কাল গায়েবি খবর হুনবো!'

সকালে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল—কাল রাত্রে চান ভানুদের বাড়ি জিনের বাদশা এসেছিলেন। নারদ আলি বলেছিল, তালগাছের মতো লম্বা, কিন্তু গাঁয়ের লোক সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আসমান-ঠোকা করে ছাড়লে। মেয়েরা বলতে লাগল, 'আইবো না, অত বড় মাইয়া বিয়া না দিয়া থুইলে জিন আইবো না?'

কেউ কেউ বলল চান ভানুর এত রূপ দেকে ওর ওপর জিনের আশক হয়েছে, ওর ওপর জিনের নিজের নজর আছে। আহা, যে বেচারার বিয়ে হবে ওর সাথে, তাকে হয়তো বাসর ঘরেই ঘাড় মটকে মারবে!

সেদিন সারাদিন মোল্লাজি এসে চান ভানুর বাড়িতে কোরান পড়লেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ হল। বলাবাহুল্য, ভূতেরাও এসে মৌলুদ শরিফে শরিক হয়ে সিন্নি খেয়ে গেল। সেদিন রাত্রে সোভান এবং আরো দু একজন ওদের বাড়িতে এসে শুয়ে থাকল।

গভীর রাত্রে বাড়ির পেছনের তালগাছটায় একটা বাঁশি বেজে উঠল। ঘুম কারুরই হয়নি ভয়ে। সকলে জানলা দিয়ে দেখতে পেল। তালগাছের ওপর থেকে প্রায় বিশ হাত লম্বা কালো কুচকুচে একটা পা নিচের দিকে নামছে। খড়খড় খড়খড় করে তালগাছের পাতাগুলো নড়ে উঠল। সাথে সাথে ঝরঝর ঝরঝর করে এক রাশ ধুলোবালি অলগাছ থেকে নারদ আলির টিনের চালের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছয়-সাতটা সুপারিগাছ একসঙ্গে ভীষণভাবে দুলতে লাগল। যেন ভেঙে পড়বে। অথচ গাছে কিছু নেই! এর পরে কি হয়েছিল, তার পরদিন সকালে আর কেউ বলতে পারল না, তার কারণ ঐটুকু পর্যন্ত দেখার পর ওরা ভয়ে বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়ে গেছিল।

এরপরেও যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, তা লোপ পেয়ে গেল—যখন একটা কৃষ্ণকায় বেড়াল তালগাছের ওপর থেকে তাদের জানালার কাছে এসে পড়ল।

সেইদিন রাত্রে ভূতেদের কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, আর ওদের ভয় দেখানো হবে না দুচারদিন, তাহলে ওরা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। তালগাছ থেকে আনা ভূতের পা বা কালো কাপড় মোড়া বংশদণ্ডটা নাড়তে নাড়তে ভূতেদের সর্দার আল্লা-রাখা বললে 'আমি এক বুদ্ধি ঠাওরাইছি।' ভূতের দল উদগ্রীব হয়ে উঠল শুনবার জন্য।

আল্লা-রাখা যা বলল তার মানে—সে ঠিক করেছে কলকাতা থেকে একটা চিঠি ছাপিয়ে আনবে। আর সেই চিঠিটা আর একদিন স্বয়ং জিনের বাদশা নারদ আলির বাড়িতে দিয়ে আসবে। বাস তাহলেই কেল্লা ফতে।

এইসব ব্যাপারে চান ভানুর বিয়ের দিন গেল আরও মাসখানিক পিছিয়ে। নানান গ্রামের পিশাচ-সিদ্ধ মন্ত্র-সিদ্ধ গুণীরা এসে নারদ আলির বাড়ির ভূতের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে লে! চারপাশের গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল!

সাত আট দিন ধরে যখন আর কোনো উপদ্রব হল না, তখন সবাই বললে, এইসব তন্ত্রমন্ত্রের চোটেই ভূতের পোলারা ল্যাজ তুলে পালিয়েছে! যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

এদিকে—দ্বিতীয় দিনের ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরদিন সকালে, আল্লা-রাখা কলকাতার পুঁথি-ছাপা এক প্রেসের ঠিকানা সংগ্রহ করে সেখানে বহু মুসাবিদার পর নিম্ন-লিখিত চিঠি ও তার যা ছাপা হবে তার কপি পাঠিয়ে দিল। প্রেসের ম্যানেজারকে লিকিত চিঠিটা এই :

শ্রীশ্রীহক্‌নামা ভরসা

মহাশয়,

আমার ছালাম জানিবেন। আমার এই লেখাখানা ভালো ও উত্তমরূপে ছাপাইয়া দিবেন। আর যদি গরিবের পত্রখানা পাইয়া ৩/৪ দিনের মধ্যে ছাপাইয়া না দিবেন আর যদি গবিলতি করেন তবে ঈশ্বরের কাছে ঠেকা থাকিবেন। আর ছাপিবার কত খরচ হয় তাহা লিখিয়া দিবেন। হুজুর ও মহাশয় গফিলতি করিবেন না। আর এমন করিয়া ছাপিয়া দিবেন চারিদিক দিয়া ফেসেং ও অতি উত্তম কাগজে ছাপিবেন। ইতি। সন ১৩৩৭ সাল ১০ই বৈশাখ।

আমাদের ঠিকানা
আল্লা-রাখা ব্যাপারি
উর্ফে কেশরঞ্জন বাবু। তাহার হাতে পঁহচে।
সাং মহনপুর,
পোং ড্যামুড্যা
জিং ফরিদপুর। (যেখানে আরিয়লখা নদী সেইখানে পঁহচে।)

চিঠির সাথে জিনের বাদশার যে দৈবী বাণী ছাপতে দিল, তা এই :

বিসমিল্লা আল্লাহো আকবর
লা এলাহা এল্লেল্লা
গায়েব

হে নারদ আলি শেখ
তোরে ও তোর বিবিরে বলিতেছি।
তোর ম্যায়্যা চান ভানুরে,

চুন্নু ব্যাপারির পোলা আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দে। তারপর তোরা যদি না দেছ তবে বহুৎ ফেরেরে পরিবি। তোরা যদি আমার এই পত্রখানা পড়িয়া চুন্নু ব্যাপারির কাছে তোরা যদি প্রথম রুছ তবে সে বলিবে কিএরে এইখানে বিবাহ দিবি। তোরা তবু ছারিছ না। তোরা একদিন আল্লা-রাখারে ডাকিয়া আনিয়া আর একজন মুন্সি আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।

খবরদার খবরদার

মাজগাঁয়ের ছেরাজ হালদার ইচ্ছা করিয়াছে তার পোলার জন্যে চান ভানুরে নিব। ইহা এখনও মনে মনে ভাবে। খবরদার। খবরদার। খোদাতাল্লার হুকুম হইয়াছে আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দিতে। আর যদি খোদাতাল্লার হুকুম অমান্য করছ তবে শেষে তোর ম্যাইয়্যা ছেমরি দুস্কু ও জ্বালার মধ্যে পরিবে।

খবরদার—হুঁশিয়ার—সাবধান আমার এই পত্রের উপর ইমান না আনিলে কাফের হইয়া যাইবি।

তোরা আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দেছ বিবাহের শেষে স্বপনে আমার দেখা পাইবি। চান ভানু আমার ভইনের লাহান। আমি উহারে মালমাত্তা দিব। দেখ তোরে আমি বারবার বলিতেছি—তোর ম্যায়্যার আল্লা-রাখা ছেমরার কাছে শাদি বহিবার একান্ত ইচ্ছা। তবে যদি এ বিবাহ না দেছ, তবে শেষে আলামত দেখিবি। ইতি

জিনের বাদশা
গায়েবুল্লা।

এই কপির কোণাতেও বিশেষ করে সে অনুরোধ করে দিল যেন ছাপার চারি কিনারায় ফেসে হয়।...

কলকাতা শহর, টাকা দিলে নাকি বাঘের দুধ পাওয়া যায় ! এই দৈবী বাণীও আট-দশ দিনের মধ্যে প্রেস থেকে হয়ে এল। আল্লা-রাখার আর আনন্দ ধরে না।

আবার ভূতের কমিটি বসল। ঠিক হল সেই রাতেই ছাপানো দৈবী বাণী নারদ আলির বাড়িতে রেখে আসতে হবে। জিনের বাদশার সেই পোশাক পরে আল্লা-রাখা যাবে ওদের বাড়িতে। যদি কেউ জেগে উঠে, ঐ চেহারা দেখে, তার দাঁতে দাঁত লাগতে দেরি হবে না।

সেদিন রাত্রে জিনের বাদশার গৈবী বাণী বিনা বাধায় চালের মটকা ভেদ করে চান ভানুর বাড়ির ভিতরে গিয়ে পড়ল। সকাল হতে না হতেই আবার গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল।

নারদ আলি ভীষণ ফাঁপরে পড়লে। জিনের বাদশার হুকুম মতে বিয়ে না দিলেই নয় আল্লা-রাখার সাথে, ওদিকে কিন্তু ছেরাজ হালদারও ছাড়বার পাত্র নয়। ভূত, জিন, পরি এত রটনা সত্ত্বেও ছেরাজ তার ছেলেকে এই মেয়ের সাথেই বিয়ে দেবে দৃঢ় পণ করে বসেছিল। মাজগাঁ এবং মোহনপুরের কোনো লোকই তাকে টলাতে পারেনি। সে বলে, 'খোদায় যদি হায়াত দেয়, আমার পোলারে কোনো হালার ভূতের পো মারবার পারব না। একদিন তো ওরে মরবারই অইবো, অর কপালে যদি ভূতের হাতেই মরণ লেহা থায়ে তারে খণ্ডাইব কেডা ?'

আসল কথা ছেরাজ অতি মাত্রায় ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। সে বুঝেছিল, চান ভানু বাপ-মার একমাত্র সন্তান, তার ওপর সুন্দরী বলে কোনো বদমায়েস লোক সম্পত্তি আর মেয়ের লোভে এই কীর্তি করছে। অবশ্য, ভূত যে ছেরাজ বিশ্বাস করত না, বা তাকে ভয় করত না—এমন নয়, তবে সে মনে করছিল, যে লোকটা এই কীর্তি করছে—সে নিশ্চয় টাকা দিয়ে কোনো পিশাচ-সিদ্ধ লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কাজেই বিয়ে হয়ে গেলে অন্য একজন পিশাচ-সিদ্ধ গুণীকে দিয়ে এ সব ভূত তাড়ানো বিশেষ কষ্টকর হবে না ! এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোনো মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে !

ছেরাজের পুত্রও পিতার মতোই সাহসী, চতুর এবং শেয়ানা। সে মনে করেছিল, বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর ভূতটুতগুলো ভালো করে গুণী দিয়ে ছাড়িয়ে পরে বৌ-এর কাছ ঘেঁষবে।

তারা বাপ-বেটায় পরামর্শ করে ঠিক করলে—শুধু বিয়েটা হবে ওখানে গিয়ে। রুয়ৎ বা শুভ-দৃষ্টিটা কিছুদিন পরে হবে এবং শুভ-দৃষ্টির পরে ওরা বউ বাড়িতে আনবে। 'রুয়ৎ' না হওয়া পর্যন্ত চান ভানু বাপের বাড়িতেই থাকবে।

নারদ আলি ছেরাজ হালদারকে একবার ডেকে পাঠাল তার কাছে। পাশেই গ্রাম। খবর শুনে তখনি ছেরাজ হালদার এসে হাসির হল। ছাপানো 'গৈবী বাণী' পড়ে সে অনেকক্ষণ চিন্তা করলে। তারপর স্থির কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'তুমি যাই ভাব বেয়াই আমি কইতাছি—এ গায়েবের খবর না, এ ঐ হালার পোলা আল্লা-রাখার কাজ। হালায় কোন ছাপাখানা থেইয়া ছাপাইয়া আনছে। জিনের বাদশা তোমারে ছাপাইয়া চিঠি দিব

ক্যান? জিনের বাদশারে আমি সালাম করি। কিন্তু বেয়াই, এ জিনের বাদশার কাম না। ঐ হালার পো হালার কাম যদি না অয়, আমি পঞ্চাশ জুতা খাইমু!'

সত্যই তো এ দিকটা ভেবে দেখেনি ওরা। কিন্তু জিনের বাদশাকে যে সে নিজে চোখে দেখেছে। ওরে বাপরে ঘর সমান উঁচু মাথা, এক কোমর দাড়ি, মাথায় পাগড়ি! সে অনেক অনুরোধ করল ছেরাজ হালদারকে—হাতে পায়ে পর্যন্ত পড়ল তার, তবু তাকে নিরস্ত করতে পারল না। ছেরাজ বলল, মরে যদি তারি ছেলে মরবে, এতে নারদ আলির ক্ষতিটা কি!

শেষে যখন ছেরাজ ক্ষতিপূরণের দাবি করে চুক্তিভঙ্গের নালিশ করবে বলে ভয় দেখালো, তখন নারদ আলি হাল ছেড়ে দিলে।

চান ভানুর মা এতদিন কোনো কথা বলেনি। তার মুখে আর পূর্বের হাসি রসিকতা ছিল না। কি যেন অজানা আশঙ্কায় এবং এই সব উৎপাতে সে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। মা-মেয়ে ঘর ছেড়ে আর কোথাও বেরোত না। জল-দানো দেখার পর থেকে মেয়েকে জল তুলে এনে দিত মা, তাতেই চান ভানু নাইত। আর সে নদীমুখো হয়নি। তাবিজে-কবচে চানের হাতে কোমরে গলায় আর জায়গা ছিল না। সোলা বেঁধে যেন ডুবন্ত জাহাজকে ধরে রাখার চেষ্টা।

চানও দিন দিন শুকিয়ে ম্লান হয়ে উঠছিল। সকলের কাছে শুনে শুনে তারও বিশ্বাস হয়ে গেছিল, তার উপর জিন বা 'আসেবের' ভর হয়েছে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার চোখের ঘুম গেল উড়ে, মুখের হাসি গেল মুছে, খাওয়া-পরা কোনো কিছুতেই তার কোনো মন রইল না। কিন্তু এত বড় মজার ভূত! ভূতই যদি তার ওপর ভর করবে—তবে সে ভূত আল্লা-রাখার কথা বলে কেন? ভূতে তো এমনটি করে না কখনো! সে নিজেই আগলে থাকে তাকে—যার ওপর বর করে। তবে কি এ ভূত আল্লা-রাখার পোষা? না, সে নিজেই এই ভূত?

এত অশান্তি দুশ্চিন্তার মাঝেও সে আল্লা-রাখাকে কেন যেন ভুলতে পারে না। ওর অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি যেন সর্বদা জোর করে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যত মন্দই হোক, চানদের তো কোনো অনিষ্টই করেনি সে। অথচ কি দুর্ব্যবহারই না চান করেছে ওর সাথে! ওর মনে পড়ে গেল, এর মাঝে একদিন পাড়ার অন্য একটা বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি আসবার সময় আল্লা-রাখাকে সে পথে পড়ে ছটফট করতে দেখেছিল। রাস্তায় আর কেউ ছিল না তখন। সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লা-রাখা বলেছিল, অকে সাপে কামড়েছে। কোনখানে কামড়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লা-রাখা তার বক্ষস্থল দেখিয়ে দিয়েছিল। সত্যই তার বুকে রক্ত পড়ছিল। চান ভানুর তখন লজ্জার অবসর ছিল না। একদিন তো এই আল্লা-রাখাই তার প্রাণদান করেছিল নদী থেকে তুলে। সে আল্লা-রাখার বুকের ক্ষত-স্থান চুষে খানিকটা রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে, আবার ক্ষতস্থানে মুখ দেবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি সাপে কামড়েছে? আল্লা-রাখা নীরবে চান ভানুর চোখ দুটো দেখিয়ে দিয়েছিল। তারপর কেমন করে টলতে টলতে চান ভানু বাড়ি এসে মূর্ছিত হয়ে

পড়েছিল আজ আর চানের সে কথা মনে নাই। কিন্তু একথা চান ভানু আর আল্লা-রাখা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ জানে না।

চান ভানু বুঝেছিল—প্রতারণা করে আল্লা-রাখা তার বুকে চানের মুখের ছোঁওয়া পেতে ছুরি বা কিছু দিয়ে বুক কেটে রক্ত বের করেছিল, সাপের কথা একেবারেই মিথ্যা, তবু সে কিছুতেই আল্লা-রাখার উপর রাগ করতে পারল না। যে ওর একটু ছোঁওয়া পাবার জন্য—হোক তা মুখের ছোঁওয়া—অমন করে বুক চিরে রক্ত বহাতে পারে, তার চেয়ে ওকে কে বেশি ভালবাসে বা বাসবে ! হয়তো তার হবু শ্বশুর ছেরাজ যা বলে গেল—তার সবই সত্য, তবু ঐ গ্রামের লোকের চক্ষুশূল ছোঁড়াটার জন্য ওর কেন এমন করে মন কাঁদে ! কেন ওকে দিনে একবার দেখতে না পেলে ওর পৃথিবী শূন্য বলে মনে হয় !

সত্যিসত্যিই তাকে জিনে পেয়েছে, ভূতে পেয়েছে—হোক সে ভূত, হোক সে জিন, তবু তো সে তাকে ভালবাসে, তার জন্যই তো সে একবার হয় জিনের বাদশা, একবার হয় তালগাছের একানেড়ে ভূত ! চানের মনে হতে লাগল, সাপে আল্লা-রাখাকে কামড়ায়নি কামড়েছে তাকে, বিষে ওর মন জর্জরিত হয়ে উঠল।

মার মন অন্তর্যামী। সেই শুধু বুঝল মেয়ের যন্ত্রণা, তার এমন দিনে দিনে শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা। সেও এতদিনে সত্যকার ভূতকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও আর ফেরার উপায় নেই। মেয়েকে নিজে হাতে জবাই করতে হবে ! দুর্দান্ত লোক ছেরাজ হালদার, এ সম্বন্ধ ভাঙলে সে কেলেঙ্কারির আর শেষ রাখবে না।

বাপ, মা, মেয়ে তিনজনেই অসহায় হয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

৩

কিছুতেই কিছু হল না। জীবনে যে পরাজয় দেখেনি, সে আজ পরাজিত হল। জিনের বাদশা, তার দৈবী বাণী, যত রকম ভূত ছিল—একানোড়ে, মামদো, সতর চোখীর মা, বেহ্মদোত্তি, কন্ধকাটা—সব মিলেও তার পরাজয় নিবারণ করতে পারলে না ! তা ছাড়া আল্লা-রাখার আর পূর্বের মতো সে উৎসাহও ছিল না। যে দিন চান ভানু তার চাঁদমুখ দিয়ে ওর বুকের রক্ত স্পর্শ করেছিল সেই দিন থেকে তার রক্তের সমস্ত বিষ—সমস্ত হিংসা দ্বেষ লোভ ক্ষুধা—সব যেন অমৃত হয়ে উঠেছিল। পরশ-মণির ছোঁওয়া লেগে ওর অন্তরলোক সোনার রঙে রেঙে উঠেছিল। তার মনের ভূত সেই দিনই মরে গেল।

চান ভানুর বিয়ে হয়ে গেল। বর তার কেমন হল, তা সে দেখতে পেলে না। দেখবার তার ইচ্ছাও ছিল না। বরও কনেকে দেখলে না ভয়ে—যদি তার ঘাড়ের জিন এসে তার ঘাড় মটকে দেয় ! ভাল ভাল গুণীর সন্ধানে বর সেই দিনই বেরিয়ে পড়ল।

চান ভানুর যে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন সকালে আল্লা-রাখার বাপ মা ভাই সকলে আল্লা-রাখাকে দেখে চমকে উঠল। তার সে বাবরি চুল নেই, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পরনে একখানা গামছা, হাতে পাঁচনি, কাঁধে লাঙ্গল! তার মা সব বুঝলে। তার ছেলে আর চান ভানুকে নিয়ে গ্রামে যা সব রটেছে, সে তার সব জানে। মা নীরবে চোখ মুছে ঘরে চলে গেল। তার বাপ আর ভাইরা খোদার কাছে আল্লা-রাকার এই সুমতির জন্য হাজার শোকর ভেজল!...

দূরে মিজল গাছের তলায় আরো দুটি চোখ আল্লা-রাখার কৃষাণ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে সে-দিনকার প্রভাতের মেঘলা আকাশের মতোই বাষ্পকুল হয়ে উঠল—সে চোখ চান ভানুর। সে দৌড়ে গিয়ে আল্লা-রাখার পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমারে এমনডা করল?' আল্লা-রাখা শান্ত হাসি হেসে বলে উঠল—'জিনের বাদশা!'

অগ্নি-গিরি

বীররামপুর গ্রামের আলি নসিব মিঞার সকল দিক দিয়েই আলি নসিব। বাড়ি, গাড়ি ও দাড়ির সমান প্রাচুর্য! ত্রিশাল থানার সমস্ত পাটের পাটোয়ারি তিনি।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁঠাল-কোয়ার মতো টকটকে রং। আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।

তাকে একমাত্র দুঃখ দিয়াছে—নিমকহারাম দাঁত ও চুল। প্রথমটা গেছে পড়ে দ্বিতীয়টার কতক গেছে উঠে, আর কতক গেছে পেকে। এই বয়সে এই দুর্ভোগের জন্য তাঁর আফসোসের আর অন্ত নেই। মাথার চুলগুলির অধঃপতন রক্ষা করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি; কিন্তু কিছুতেই যখন তা রুখতে পারলেন না, তখন এই বলে সান্ত্বনা লাভ করলেন যে, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডেরও টাক ছিল। তাঁর টাকের কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন যে, টাক বড় লোকদের মাথাতেই পড়ে—কুলি-মজুরের মাথায় টাক পড়ে না! তা ছাড়া, হিসাব নিকেশ করবার জন্য নিকেশ মাথারই প্রয়োজন বেশি। কিন্তু টাকের এত সুপারিশ করলেও তিনি মাথা থেকে সহজে টুপি নামাতে চাইতেন না। এ নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি বলতেন—টাক আর টাকা দুটোকেই লুকিয়ে রাখতে হয়, নৈলে লোকে বড় নজর দেয়। টাক না হয় লুকোলেন, সাদা চুল দাড়িকে তো লুকোবার আর উপায় নেই। আর উপায় থাকলেও তিনি আর তাতে রাজি নন। একবার কলপ লাগিয়ে তাঁর মুখ এত ভীষণ ফুলে গেছিল, এবং তার সাথে ডাক্তাররা এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল যে, সেইদিন থেকে তিনি তৌবা করে কলপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু, সাদা চুল-দাড়িতে এতটুকু তাঁর সৌন্দর্য হানি হয়নি। তাঁর গায়ের রং-এর সঙ্গে মিশে তাতে বরং তাঁর চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে। এক বুক শ্বেত শ্মশ্রু—যেন শ্বেত বালুচরে শ্বেত মরালী ডানা বিছিয়ে আছে!

এঁরই বাড়িতে থেকে ত্রিশালের মাদ্রাসায় পড়ে—সবুর আখন্দ। নামেও সবুর, কাজেও সবুর। শান্তশিষ্ট গো-বেচারা মানুষটি। উনিশ-কুড়ি বেশি বয়স হবে না, গরিব শরিফ ঘরের ছেলে দেখে আলি নসিব মিঞা তাঁকে বাড়িতে রেখে তার পড়ার সমস্ত খরচ যোগান।

ছেলেটি অতি মাত্রায় বিনয়াবনত। যাকে বলে—সাত চড়ে রা বেড়োবে না। তার হাব-ভাব যে সর্বদাই বলছে—'আই হ্যাভ দি অনার টু বি সার ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট।'

আলি নসিব মিঞার পাড়ার ছেলেগুলি অতি মাত্রায় দুরন্ত। বেচারা সবুরকে নিয়ে দিনরাত তারা প্যাঁচা খ্যাঁচরা করে। পথে ঘাটে ঘরে বাইরে তারা সবুরকে সামনে হাসি ঠাট্টা

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জল ছিটে উত্যক্ত করে। ছেঁচা জল আর মিছে কথা নাকি গায়ে বড় লাগে—কিন্তু সবুর নীরবে এসব নির্যাতন সয়ে যায়, এক দিনের তরেও বে-সবুর হয়নি।

পাড়ার দুরন্ত ছেলের দলের সর্দার রুস্তম। সে-ই নিত্য নূতন ফন্দি বের করে সবুরকে ক্ষ্যাপানোর। ছেলে মহলে সবুরের নাম প্যাঁচা মিঞা। তার কারণ, সবুর স্বভাবতই ভীরু নিরীহ ছেলে ; ছেলেদের দলের এই অসহ্য জ্বালাতনের ভয়ে সে পারতপক্ষে তার এঁদো কুঠরি থেকে বাইরে আসে না। বেরুলেই প্যাঁচার পিছনে যেমন করে কাক লাগে, তেমনি করে ছেলেরা লেগে যায়।

সবুর রাগে না বলে ছেলেদের দল ছেড়েও দেয় না। তাদের এই ক্ষ্যাপানোর নিত্য নূতন ফন্দি আবিষ্কার দেখে পাড়ার সকলে যে হেসে লুটিয়ে পড়ে, তাতেই তারা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করে।

পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসা-পড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে। তাদের পাড়াতে কোনো মাদ্রাসার 'তালবিলিম' (তালেবে এলম বা ছাত্র) জায়গিরি থাকত না পাড়ার ছেলেগুলির ভয়ে। সবুরের অসীম ধৈর্য। সে এমনি করে তিনটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আর একটা বছর কাটিয়ে দিলেই তার মাদ্রাসার পড়া শেষ হয়ে যায়।

সবুর বেরোলেই ছেলেরা আরম্ভ করে—'প্যাঁচারে, তুমি ডাহ ! হুই প্যাঁচা মিঞাগো, একডিবার খ্যাচখ্যাচাও গো।' রুস্তম রুস্তমি কণ্ঠে গান ধরে—

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়—
যাইতে যাইতে খ্যাচ খ্যাচায়।
ক্যাওয়াবা সব লইল পাছ,
প্যাঁচা গিয়া উঠল গাছ।
প্যাঁচার ভাইশতা কোলা ব্যাং
কইল চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচা কয়, বাপ বারিত্ যাও।
পাছ লইছে সব হাপের ছাও
ইঁদুর জবাই কইর্যা খায়,
বোচা নাকে ফ্যাচফ্যাচায় !

ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। বেচারা সবুর তাড়াতাড়ি তার কুঠরিতে ঢুকে দোর লাগিয়ে দেয়। বাইরে থেকে বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে রুস্তম গায়—

প্যাঁচা, একবার খাচখ্যাচাও
গর্ত থাইক্যা ফুচকি দাও।
মুচকি হাইস্যা কও কথা
প্যাঁচারে মোর খাও মাথা !

সবুর কথা কয় না। নীরবে বই নিয়ে পড়তে বসে। যেন কিছুই হয়নি। রুস্তমি দলও নাছোড়বান্দা। আবার গায়—

মেকুরের ছাও মক্কা যায়,
প্যাচায় পড়ে, দেইখ্যা আয়।

হঠাৎ আলি নসিব মিঞাকে দেখে ছেলের দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আলি নসিব মিঞা শরিক লোক। তিনি ছেলেদের হাত থেকে সবুরকে বাঁচালেও না হেসে থাকতে পারলেন না। হাসতে হাসতে বাড়ি ঢুকে দেখেন তাঁর একমাত্র সন্তান নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে নালিশ করছে—কেন পাড়ার ছেলেরা রোজ রোজ সবুরকে অমন করে জ্বালিয়ে মারবে? তাদের কেউ তো সবুরকে খেতে দেয় না!

তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রুস্তমি দল গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল—

প্যাচা মিঞা কেতাব পড়ে
হাঁড়ি নড়ে দাড়ি নড়ে!

নূরজাহান রাগে তার বাবার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার যত রাগ পড়ল গিয়ে তার বাবার উপরে। তার বাবা তো ইচ্ছা করলেই ওদের ধমক দিতে পারেন। বেচারা সবুর গরিব, স্কুলে পড়ে না, মাদ্রাসায় পড়ে—এই তো তার অপরাধ! মাদ্রাসায় না পড়ে সে যদি খানায় পড়ত ডোবায় পড়ত—তাতেই বা কার কি ক্ষতি হত। কেন ওরা আদা-জল খেয়ে ওর পিছনে এমন করে লাগবে?

আলি নসিব মিঞা সব বুঝলেন। কিন্তু বুঝেও তিনি কিছুতেই হাসি চাপতে পারলেন না। হেসে ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি হইছে রে বেডি? ছেমরাডা প্যাচার লাহান বাড়িত বইয়্যা রইব, একডা কথা কইব না, তাইনাসেন উয়ারে প্যাচ কয়।' নূরজাহান রেগে উত্তর দিল, 'আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেডায় ঘরে বইয়া কাঁদে, আর আপনি হাসেন। আমি পোলা অইলে এইদুন একচটকনা দিতাম রুস্তম্যারে আর উই ইবলিশা পোলাপানেরে, যে, ঐ হ্যানে পইর‍্যা যাইত উৎক্যা মাইর‍্যা। উইঠ্যা আর দানা-পানি খাইবার অইত না।' বলেই কেঁদে ফেললে।

আলি নসিব মিঞা মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'চুপ দে বেডি, এইবারে ইবলিশের পোলারা আইলে দাবার পাইর‍্যা লইয়া যাইব! মুনশি বেডারে কইয়্যা দিবাম, হে ঐ রুস্তম্যারে ধইরা তার কান দুডা এক্কেরে মুত্যা কইর‍্যা কাইট্যা হালাইবো!'

নূরজাহান অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল।

সে তাড়তাড়ি উঠে বলল, 'আব্বজান, চা খাইবেন নি?'

আলি নসিব মিঞা হেসে ফেলে বললেন, 'বেডির বুঝি য়্যাহন চায়ের কথা মনে পরল।'

নূরজাহান আলি নসিব মিঞার একমাত্র সন্তান বলে অতি মাত্রায় আদুরে মেয়ে। বয়স পনের পেরিয়ে গেছে। অথচ মেয়ের বিয়ে দেবার নাম নেই বাপ-মায়ের। কথা উঠলে বলেন, মনের মত জামাই না পেলে বিয়ে দেওয়া যায় কি করে! মেয়েকে তো হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া যায় না! আসল কথা তা নয়। নূরজাহানের বাপ-মা ভাবতেই পারেন না, ওঁদের ঘরের আলো নূজাহান অন্য ঘরে চলে গেলে তাঁরা এই আঁধার

পুরীতে থাকবেন কি করে ! নৈলে এত ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিনীর বরের অভাব হয় না। সম্বন্ধও যে আসে না, এমনও নয় ; কিন্তু আলি নসিব মিঞা এমন উদাসীনভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেন যে, তারা আর বেশি দূর না এগিয়ে সরে পড়ে।

নূরজাহান বাড়িতে থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। এখন সবুরের কাছে উর্দু পড়ে। শরিফ ঘরের এত বড় মেয়েকে অনাত্মীয় যুবকের কাছে পড়তে দেওয়া দূরের কথা, কাছেই আসতে দেয় না বাপ মা ; কিন্তু এদিক দিয়ে সবুরের এতই সুনাম ছিল যে, সে নূরজাহানকে পড়ায় জেনেও কোনো লোক এতটুকু কথা উত্থাপন করে নি।

সবুর যতক্ষণ নূরজাহানকে পড়ায় ততক্ষণ একভাবে ঘাড় হেঁট করে বসে থাকে, একটিবারও নূজাহানের মুখের দিকে ফিরে তাকায় না। বাড়ি ঢোকে মাথা নিচু করে, বেরিয়ে যায় মাথা নিচু করে। নূরজাহান, তার বাবা মা সকলে প্রথম প্রথম হাসত—এখন সয়ে গেছে !

সত্যসত্যই, এই তিন বছর সবুর এই বাড়িতে আছে, এর মধ্যে সে একদিনের জন্যও নূরজাহানের হাত আর পা ছাড়া মুখ দেখেনি।

এ নূরজাহান জাহানের জ্যোতি না হলেও বীররামপুরের জ্যোতি—জোহরা সেতারা, এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈত নাই। নূরজাহানের নিজেরও যথেষ্ট গর্ব আছে, মনে মনে তার রূপের সম্বন্ধে।

আগে হত না—এখন কিন্তু নূরজাহানের সে অহঙ্কারে আঘাত লাগে—দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তার রূপের কি তা হলে কোনো আকর্ষণই নেই? আজ তিন বছর সে সবুরের কাছে পড়ছে—এত কাছে তবু সে একদিন মুখ তুলে তাকে দেখল না? সবুর তাকে ভালোবাসুক—এমন কথা সে ভাবতেই পারে না,—কিন্তু ভালো না বাসলেও যার রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে—যাকে একটু দেখতে পেলে অন্য যে কোনো যুবক জন্মের জন্য ধন্য হয়ে যায়—তাকে একটিবার একটুক্ষণের জন্যেও চেয়েও দেখল না ! তার সতীত্ব কি নারীর সতীত্বের চেয়েও ঠুনকো?

ভাবতে ভাবতে সবুরের উপর তার আক্রোশ বেড়ে ওঠে, মন বিষিয়ে যায়, ভাবে আর তার কাছে পড়বে না ! কিন্তু যখন দেখে—নির্দোষ নির্বিরোধ নিরীহ সবুরের উপর রুস্তমি দল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তখন আর থাকতে পারে না। আহা, বেচারার হয়ে কথা কইবার যে কেউ নেই। সে নিজেও যে একটিবার মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না। এ কি পুরুষ মানুষ বাবা ! মার, কাট, মুখ দিয়ে কথাটি নেই। এমন মানুষও থাকে দুনিয়াতে !

যত সে এইসব কথা ভাবতে থাকে, তত এই অসহায় মানুষটির ওপর করুণায় নূরজাহানের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে !

সবুর পুরুষ বলতে যে মর্দ-মিনসে বোঝায়—তা তো নয়ই, সুপুরুষও নয়। শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। রূপের মধ্যে তার চোখ দুটি। যেন দুটি ভীরু, পাখি। একবার চেয়েই অমনি নত হয়ে পড়ে। সে চোখ, তার চাউনি—যেমন ভীরু, তেমনি করুণ, তেমনি অপূর্ব সুন্দর ! পুরুষের অত বড় অত সুন্দর চোখ সহজে চোখে পড়ে না।

এই তিনি বছর সে এই বাড়িতে আছে, কিন্তু কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা না করলে—সে অন্য লোক তো দূরের কথা—এই বাড়িরই কারুর সাথে কথা কয়নি। নামাজ পড়ে, কোরান তেলাওত করে, মাদ্রাসা যায়, আসে, পড়ে কিংবা ঘুমোয়—এই তার কাজ। কোনো দিন যদি ভুলক্রমে ভিতরে থেকে খাবার না আসে, সে না খেয়েই মাদ্রাসা চলে যায়—চেয়ে খায় না। পেট না ভরলেও দ্বিতীয় বার খাবার চেয়ে নেয় না। তেষ্টা পেলে পুকুর-ঘাটে গিয়ে জল খেয়ে আসে, বাড়ির লোকের কাছে চায় না !...

সবুর এত অসহায় বলেই নূরজাহানের অন্তরের সমস্ত মমতা সমস্ত করুণা ওকে সদাসর্বদা ঘিরে থাকে। সে না থাকলে, বোধ হয় সবুরের খাওয়াই হত না সময়ে। কিন্তু নূরজাহানের এত যে যত্ন, এত যে মমতা এর বিনিময়ে সবুর এতটুকু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েও তাকে দেখেনি, কিছু বলা তো দূরের কথা। মারলে-কাটলেও অভিযোগ করে না, সোনা-দানা দিলেও কথা কয় না !

২

সেদিন আলি নসিব মিঞার বাড়িতে একজন জবরদস্ত পশ্চিমা মৌলবি সাহেব এসেছেন। রাত্রে মৌলুদ শরীফ ও ওয়াজ-নসিহৎ হবে। মৌলবি সাহেবের সেবা-যত্নের ভার পড়েছে সবুরের উপর। বেচারা জীবনে এত বেশি বিব্রত হয়নি। কি করে, সে তার সাধ্যমত মৌলবি সাহেবের খেদমত করতে লাগল।

সবুরকে বাইরে বেরুতে দেখে রুস্তমি দলের একটি দুটি করে ছেলে এসে জুটতে লাগল। তাদের দেখে সবুর বেচারার, ভাসুরকে দেখে ভাদ্র-বউর যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হল।

মৌলবি সাহেবের পাগড়ির ওজন কত, দাড়ির ওজন কত, শরীরটাই বা কয়টা বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারবে না, তাঁর গোঁফ উই-এ না ইঁদুরে খেয়েছে—এইসব গবেষণা নিয়েই রুস্তমি দল মত্ত ছিল ; রুস্তম তখনো এসে পৌঁছেনি বলে সবুরকে জ্বালাতন করা শুরু করেনি।

হঠাৎ মৌলবি সাহেব বিশুদ্ধ উর্দুতে সবুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি করে। সবুর বিনীতভাবে বললে সে তালেবে এলম বা ছাত্র। আর যায় কোথায় ! ইউসুফ বলে উঠলো, 'প্যাঁচা মিঞা কি কইল, রে ফজল্যা ?' ফজল হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, 'প্যাঁচা মিঞা কইল, মুই তালবিলিম।' প্যাঁচা মিঞা ?' ছেলেরা হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে রোলারের মতো গড়াতে লাগল ! 'হয় ! রুস্তম্যা জোর কইছে রে ! তালবিল্লি !— উরে বাপ্‌পুরে ! ইল্লারে বিল্লা ! তালবিল্লি—হি হি হি হা হা হা !' বলে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে। কস্তা-পেড়ে হাসি !

বেচারা সবুর ততক্ষণে মৌলবি সাহেবের সেবা-টেবা ফেলে তার কামরায় ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছে। রুস্তম সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে গাইতে লাগল—

পঁ্যাচা অইলো তালবিল্লি,
দেওবন্দ যাইয়া যাইবো দিল্লি।
আইয়া করবো চিল্লাচিল্লি—
কুত্তার ছাও আর ইল্লিবিল্লি !

মৌলবি সাহেব আর থাকতে পারলেন না। আস্তিন গুটিয়ে ছেলেদের তাড়া করে এলেন। ছেলেরা তাঁর বিশিষ্টরূপে শালের মতো বিশাল দেখ দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে গেয়ে গেল—

উল্লু আয়া লাহোর সে
আজ পড়েগা আলেফ বে !

মৌলবি সাহেব বিশুদ্ধ উর্দু ছেড়ে দিয়ে ঠেট্ হিন্দিতে ছেলেদের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগলেন।

আলি নসিব মিঞা সব শুনে ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। আজ মৌলবি সাহেবের সামনে তাদের বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেবেন। কিন্তু ছেলেদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছেলেরা ততক্ষণে তিন চার মাইল দূরে এক বিলের ধারে ব্যাঙ সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৌলবি সাহেব তাদের তাড়া করায়, তারা বেজায় চটে গিয়ে ঠিক করেছে— আজ মৌলিব সাহেবের ওয়াজ পণ্ড করতে হবে। স্থির হয়েছে, যখন বেশ জমে আসবে ওয়াজ, তখন একজন ছেলে একটা ব্যাঙের পেট এমন করে টিপবে যে ব্যাঙটা ঠিক সাপে ধরা ব্যাঙ-এর মতো করে চ্যাঁচাবে ; ততক্ষণ আর একজন একটা ব্যাঙ মজলিশের মাঝখানে ছেড়ে দেবে, সেটা যখন লাফাতে থাকবে—তখন অন্য একজন ছেলে চিৎকার করে উঠবে—সাপ ! সাপ !

বাস ! তাইলেই ওয়াজের দফা ঐখানেই ইতি !

বহু চেষ্টার পর গোটাকতক ব্যাঙ ধরে নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরল।

আলি নসিব মিঞার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বারি বলে উঠল, 'রুস্তম্যা রে, হালার তালবিল্লি পায়খানায় গিয়াছে। বদনাটা উডাইয়া লইয়া আইমু ?'

রুস্তম খুশি হয়ে তখনি হুকুম দিল। বারি আস্তে আস্তে বদনাটি উঠিয়ে এনে পুকুর-ঘাটে রেখে দিয়ে এল।

একঘণ্টা গেল, দুঘণ্টা গেল, সবুর যেমন অবস্থায় গিয়ে বসেছিল তেমনি অবস্থায় বসে রইল পায়খানায় ! বেরও হয় না, কাউকে দিয়ে বদনাও চায় না ! দূরে আলি নসিব মিঞাকে দেখে ছেলের দল যেদিকে পারল পালিয়ে গেল !

আলি নসিব মিঞা ভাবলেন, নিশ্চয় সবুরের কিছু একটা করছে পাজি ছেলের দল। কিন্তু এসে সবুরকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তারাও কিছু জানে না বললে। ছেলের দল হল্লা করছিল 'তালবিল্লি' বলে—এইটুকুই তারা জানে।

আরো দুই ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর সবুরের সন্ধান পাওয়া গেল। সবুর সব বললে। কিন্তু তাতে উলটো ফল হলো। আলি নসিব মিঞা তাকেই বকতে লাগলেন—সে কেন

বেরিয়ে এসে কারর কাছে বদনা চাইলে না—এ ব্যাপার শুনে নূরজাহান রাগ করার চেয়ে হাসলেই বেশি। এমনও সোজা মানুষ হয়।

আর একদিন সে হেসেছিল সবুরের দুর্দশায়। সবুর একদিন চুল কাটাচ্ছিল। রুস্তম তা দেখতে পেয়ে পিছন থেকে নাপিতকে ইশারায় একটা টাকার লোভ দেখিয়ে মাঝখানে টিকি রেখে দিতে বলে। সুশীল নাপিতও তা পালন করে। চুল কেটে স্নান করে সবুর যখন বাড়িতে খেতে গেছে, তখন নূরজাহানের চোখে পড়ে প্রথম সে দৃশ্য। নূরজাহানের হাসিতে যে ব্যথা পেয়েছিল সবুর, তা সেদিন নূরজাহানের চোখ এড়ায়নি।

আজ আবার হেসে ফেলেই নূরজাহানের মন ব্যথিত হয়ে উঠল সবুরের সেই দিনের মুখ স্মরণ করে। কি জানি কেন, তার চোখ জলে ভরে উঠল।...

সন্ধ্যায় যখন মৌলবি সাহেব ওয়াজ করছেন, এবং ভক্ত শ্রোতাবৃন্দ তাঁর কথা যত বুঝতে না পারছে, তত ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠছে—তখন সহসা মজলিশের এক কোণায় অসহায় ভেকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল! শ্রোতাবৃন্দ চকিত হয়ে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল, রক্তাক্ত কলেবর বুঝিবা সেই ভেক-প্রবরই উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মাথার উপর দিয়ে হাউন্ড রেস আরম্ভ করে দিল। সঙ্গে চিৎকার উঠল—'সাপ! সাপ!'

আর বলতে হল না। নিমেষে যে যেখানে পারল পালিয়ে গেল। মৌলবি সামেব তক্তাপোষে উঠে পড়ে তাঁর জাব্বা-জোব্বা ঝাড়তে লাগলেন। আর ওয়াজ হল না সেদিন।...

মৌলবি সাহেব যখন খেতে বসেছেন, তখন অদূরে গান শোনা গেল—

'উলু! বোলো' কহে সাপ
উলু বোলে—'বাপরে রে বাপ!'
'কাল নসিহত হোগা ফের?'
উলু বোলে—কের কের কের!
লে উঠা লোটা কম্বল
উলু! আপনা ওতন চল!

সহসা মৌলবি সাহেবের গলায় মুর্গির ঠ্যাং আটকে গেল। আলি নসিব মিঞা নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগলেন।

৩

সেদিন রাস্তা দিয়ে গফরগাঁও-এর জমিদারের হাতি যাচ্ছিল। নূরজাহান বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বেচারা সবুরও হাতি দেখার লোভ সংবরণ করতে না পেরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অদূরে সদলবলে রুস্তম দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাতিটার দিকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এরিও তালবিল্লি মিঞা গো! তুই তোমাগ বাছুরডা আইতেছে, ধইরা লইয়াও।' রাস্তার সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল। রাস্তার একটা মেয়ে

বলে উঠল, 'বিজাত্যার পোলাডা ! হাতিটা বাছুর না, বাছুর তুই !' ভাগ্যিস রুস্তম শুনতে পায়নি !

নূরজাহান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে যত না রাগল ছেলেগুলোর উপর, তার অধিক রেগে উঠল সবুরের উপর। সে প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে, আজ তাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেবে। এই কি পুরুষ ! মেয়েছেলেরও অধম যে !

সেদিন সন্ধ্যায় যখন পড়াতে গেল সবুর, তখন কোনো ভূমিকা না করে নূরজাহান বলে উঠল, 'আপনি বেডা না ? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইলা আইবেন ? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না ?'

সবুর আজ যেন ভুলেই তার ব্যথিত চোখ দুটি নূরজাহানের মুখের উপর তুলে ধরল ! কিন্তু চোখ তুলে যে রূপ সে দেখলে, তাতে আর ব্যথা লজ্জা অপমান সব ভুলে গেল সে। দুই চোখে তার অসীম বিস্ময় অন্য জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। এই তুমি ! সহসা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—'নূরজাহান !'

নূরজাহানও বিস্ময়-বিমূঢ়ার মতো তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। এ কোন বনের ভীরু হরিণ ? অমন হরিণ-চোখ যার, সে কি ভিরু না হয়ে পারে ? নুরজাহান কখনো সবুরকে চোখ তুলে চাইতে দেখে নি। সে রাস্তা চলত কথা কইত—সব সময় চোখ নিচু করে। মানুষের চোখ যে মানুষকে এত সুন্দর করে তুলতে পারে—তা আজ সে প্রথম দেখল।

সবুরের কণ্ঠে তার নাম শুনে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বর্ষারাতের চাঁদকে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ঘিরে ফেলল।

আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ঝড় উঠেছে। মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সে যেদিন কথা কয়, সেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নি-গিরি।

সবুরের চোখে মুখে পৌরুষের প্রখর দীপ্তি ফুটে উঠল। সে নূরজাহানের দিকে দীপ্ত চোখে চেয়ে বলে উঠল, 'ঐ পোলাপানের যদি জওয়াব দিই, তুমি খুশি হও ?' নূরজাহানও চকচকে চোখ তুলে বলে উঠল, 'কে জওয়াব দিবে ? আপনি ?'

এ মৃদু বিদ্রূপের উত্তর না দিয়ে সবুর তার দীর্ঘায়ত চোখ দুটির জ্বলন্ত ছাপ নূরজাহানের বুকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। নূরজাহান আত্মবিস্মৃতের মতো সেইখানে বসে রইল। তার দুটি সুন্দর চোখ তার তদধিক সুন্দর চাউনি ছাড়া আর কোনো কিছু মনে রইল না ! যে সবুরকে কেউ কখনো চোখ তুলে চাইতে দেখেনি, আজ সে উজ্জ্বল চোখে, দৃপ্তপদে রাস্তায় পায়চারি করছে দেখে সকলে অবাক হয়ে উঠল।

রুস্তমি দল গাঙের পার থেকে বেড়িয়ে সেই পথে ফিরছিল। হঠাৎ ফজল চিৎকার করে উঠল—'উইরে তালবিল্লি !'

সবুর ভাল করে আস্তিন গুটিয়ে নিল।

বারি পিছু দিক থেকে সবুরের মাথায় ঠোকর দিয়ে বলে উঠল, 'প্যাঁচারে, তুমি ডাহ।'

সবুর কিছু না বলে এমন জোরে বারির এক গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিলে যে, সে সামলাতে না পেরে মাথা ঘুড়িয়ে পড়ে গেল। সবুরের এ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে দলের সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সবুর কথাটি না বলে গম্ভীরভাবে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। বারি ততক্ষণে উঠে বসেছে! উঠেই সে চিৎকার করে উঠল—'সে হালায় গেল কোই?'

বলতেই সকলের যেন হুঁস ফিরে এল। মার মার করে সকলে গিয়ে সবুরকে আক্রমণ করলে। সবুরও অসম সাহসে তাদেরে প্রতি-আক্রমণ করলে। সবুরের গায়ে যে এত শক্তি, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সে রুস্তমি দলের এক এক জনের টুটি ধরে পাশের পুকুরের জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

আলি নসিব মিঞার এই পুকুরটা নতুন কাটানো হয়েছিল, আর তার মাটিও ছিল অত্যন্ত পিছল। কাজেই যারা পুকুর পড়তে লাগল গড়িয়ে—তারা বহু চেষ্টাতেও পুকুরের অত্যুচ্চ পাড় বেয়ে সহজে উঠতে পারল না। পা পিছলে বারে বারে জলে পড়তে লাগল গিয়ে। এইরূপে যখন দলের পাঁচ ছয় জন, মায় রুস্তম সর্দার জলে গিয়ে পড়েছে—তখন রুস্তমিদলের আমির তার পকেট থেকে দু-ফলা ছুরিটা বের করে সবুরকে আক্রমণ করল। ভাগ্যক্রমে প্রথম ছুরির আঘাত সবুরের বুকে না লেগে হাতে গিয়ে লাগল। সবুর প্রাণপণে আমিরের হাত মুচড়ে ধরতেই সে ছুরি সমেত উল্টে পড়ে গেল এবং আমিরের হাতের ছুরি আমিরেই বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল! আমির একবার মাত্র 'উঃ' বলেই অচৈতন্য হয়ে গেল। বাকি যারা যুদ্ধ করছিল—তারা পাড়ায় গিয়ে খবর দিতেই পাড়ার লোক ছুটে এল। আলি নসিব মিঞাও এলেন।

সবুর ততক্ষণে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত শরীর নিয়েই আমিরকে কোলে তুলে নিয়ে তার বুকের ছুরিটা তুলে ফেলে সেই ক্ষতমুখে হাত চেপে ধরেছে। আর তার হাত বেয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত-ধারা ছুটে চলেছে!

আলি নসিব মিঞা তাঁর চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দুই হাত দিয়ে তাঁর চক্ষু ঢেকে ফেললেন।

একটু পরে ডাক্তার এবং পুলিশ দু-ই এল। আমিরকে নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়, সবুরকে নিয়ে গেল থানায়।

সবুরকে থানায় নিয়ে যাবার আগে দারোগাবাবু আলি নসিব মিঞার অনুরোধে তাকে একবার তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সে দারোগাবাবুর কাছে একটুও অতিরঞ্জিত না করে সমস্ত কথা খুলে বললে। তার কথা অবিশ্বাস করতে কারুরই প্রবৃত্তি হল না। দারোগাবাবু বললেন, 'কেস খুব সিরিয়স নয়, ছেলেটা বেঁচে যাবে! এ কেস আপনারা আপোসে মিটিয়ে ফেলুন সাহেব।'

আলি নসিব মিঞা বললেন, 'আমার কোনো আপত্তি নাই দারোগা সাহেব, আমিরের বাপে কি কেস মিটাইব? তারে তো আপনি জানেন। যারে কয় একেরে বাঙাল!'

দারোগাবাবু বললেন, 'দেখা যাক, এখন তো ওকে থানায় নিয়ে যাই। কি করি, আমাদের কর্তব্য করতেই হবে।'

ততক্ষণে আলি নসিব মিঞার বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এই খবর শুনেই নূরজাহান মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিল। আলি নসিব মিঞা যখন সবুরকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন নূরজাহান একেবারে প্রায় সবুরের পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমারে এমনডা করবার কইছিল? কেন এমনডা করলে?'

নূরজাহানের মা সবুরকে তার গুণের জন্য ছেলের মতোই মনে করতেন। তা ছাড়া, তাঁর পুত্র না হওয়ায় পুত্রের প্রতি সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ গোপনে সবুরকে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি সবুরের মাথাটা বুকের উপর চেপে ধরে কেঁদে আলি নসিব মিঞাকে বললেন, 'আমার পোলা এ, আমি দশ হাজার ট্যাহা দিবাম, দারোগা ব্যাডারে কন, হে এরে ছ্যাইরা দিয়া যাক।'

সবুর তার রক্তমাখা হাত দিয়ে নূরজাহানকে তুলে বলে উঠল, আমি যাইতেছি ভাই। যাইবার আগে দেহাইয়া গেলাম—আমিও মানষের পোলা। এ যদি না দেহাইতাম, তুমি আমায় ঘৃণা করতা। খোদায় তোমায় সুখে রাখুন!' বলেই তার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললে 'আম্মাগো এই তিনডা বছরে আপনি আমায় আমার মায়ের শোক ভুলাইছিলেন।' আর সে বলতে পারল না—কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।'

আলি নসিব মিঞার পদধূলি নিয়ে সে নির্বিকারচিত্তে থানায় চলে গেল। দারোগাবাবু কিছুতেই জামিন দিতে রাজি হলেন না। দশ হাজার টাকার বিনিময়েও না, খুনি আসামিকে ছেড়ে দিলে তাঁর চাকরি যাবে।

নূরজাহানের কানে কেবল ধ্বনিত হতে লাগল, 'তুমি আমাকে ঘৃণা করতে।' তার ঘৃণায় সবুরের কি আসত যেত? কেন সে তাকে খুশি করবার জন্য এমন করে 'মরিয়া হইয়া' উঠল? সে যদি আজ এমন করে না বলত সবুরকে, তা হলে কখনই সে এমন কাজ করতনা। এমন নির্যাতন তো সে তিন বছর ধরে সয়ে আসছে। তারই জন্য আজ সে থানায় গেল! দুদিন পরে হয়ত তার জেল, দ্বীপান্তর—হয়তো বা তার চেয়ে বেশি—ফাঁসি হয়ে যাবে! 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

আলি নসিব মিঞা যেন আজ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। আজ সবুর তার দুঃখ দিয়ে তাঁর সুখের বাকি দিনগুলোকেও মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল। একবার মনে হল, বুঝি বা দুধ-কলা দিয়ে তিনি সাপ পুষেছিলেন! পরক্ষণেই মনে হল সে সাপ নয়, সাপ নয়! ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক! আর—যদি সাপই হয়—তা হলেও ওর মাথায় মণি আছে! ও জাত-সাপ।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, তাঁর অনুকম্পায় প্রতিপালিত হলেও বংশ-মর্যাদায় সবুর তাঁদের চেয়েও অনেক উচ্চে। আজ সে দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন, নিঃসহায়—কিন্তু একদিন এদেরি বাড়িতে আলি নসিব মিঞার পূর্বপুরুষেরা নওকরি করেছেন। তা ছাড়া এই তিন বছর তিনি সবুরকে যে অন্ন বস্ত্র দিয়েছেন তার বিনিময়ে সে তাঁর কন্যাকে উর্দু ও ফার্সিতে যে কোন মাদ্রাসার ছেলের চেয়েও পারদর্শিনী করে দিয়ে গেছে। আলি নসিব মিঞা নিজে মাদ্রাসা-পাশ হলেও মেয়ের কাছে তাঁর উর্দু ফার্সি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা

করতে ভয় হয়। সে তো এতটুকু ঋণ রাখিয়া যায় নাই। শ্রদ্ধায় প্রীতিতে পুত্রস্নেহে তাঁর বুক ভরে উঠল !... যেমন করে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে !

নিজের জন্য নয়, নিজের চেয়েও প্রিয় ঐ কন্যার জন্য ! আজ তো আর তাঁর মেয়ের মন বুঝতে আর বাকি নেই। অন্যের ঘরে পাঠাবার ভয়ে মেয়ের বিয়ের নামে শিউরে উঠেছেন এতদিন, আজ যদি এই ছেলের হাতে মেয়েকে দেওয়া যায়—মেয়ে সুখী হবে, তাকে পাঠাতেও হবে না অন্য ঘরে। সে-ই তো ঘরের ছেলে হয়ে থাকবে। উচ্চশিক্ষা ? মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা তো সে দিয়েইছে—পাসও করবে সে হয়তো সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তারপর কলেজে ভর্তি করে দিলেই হবে।

এই ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করে—আলি নসিব মিঞা অনেকটা শান্ত হলেন এবং মেয়েকেও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সে রাত্রে নূরজাহানের আর মূর্ছা হল না, সে ঘুমাতেও পারল না। সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল—সেই দুটি চোখ, দুটি তারার মতো ! প্রভাতী তারা আর সন্ধ্যাতারা।

৪

আমিরকে বাঁচানো গেল না মৃত্যুর হাত থেকে—সবুরকে বাঁচানো গেল না জেলের হাত থেকে।

ময়মনসিংহের হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথেই তার মৃত্যু হল। আমিরের পিতা কিছুতেই মিটমাট করতে রাজি হলেন না। তিনি এই বলে নালিশ করলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল নূরজাহানের সাথে আমিরের বিয়ে দেন, আর তা জানতে পেরেই সবুর তাকে হত্যা করেছে। তার কারণ, সবুরের সাথে নূরজাহানের গুপ্ত প্রণয় আছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বহু সাক্ষী নিয়ে এলেন—যারা ঐ দুর্ঘটনার দিন নূজাহানকে সবুরের পা ধরে কাঁদতে দেখেছে ! তা ছাড়া সবুর পড়াবার নাম করে নূরজাহানের সাথে মিলবার যথেষ্ট সুযোগ পেত !

নূরজাহান আর আলি নসিব মিঞা একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল। দেশময় ঢি ঢি পড়ে গেল। অধিকাংশ লোকেই একথা বিশ্বাস করল।

আলি নসিব মিঞা শত চেষ্টা করেও সবুরকে উকিল দেওয়ার জন্য রাজি করতে পারলেন না। সে কোর্টে বললে, সে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবে—উকিল বা সাক্ষী কিছুই দিতে চায় না সে। আলি নসিব মিঞা টাকার লোভে বহু উকিল সাধ্য-সাধনা করেও সবুরকে টলাতে পারল না। আলি নসিব মিঞা তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে তাকে জেলে দেখা করে শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও সফলকাম হয়নি। নূরজাহানের অনুরোধে সে বলেছিল, অনেক ক্ষতিই তোমাদের করে গেলাম—তার উপরে তোমাদের আরো আর্থিক ক্ষতি করে আমার বোঝা ভারি করে তুলতে চাইনে। আমায় ক্ষমা করো নূরজাহান, আমি তোমাদের আমার কথা ভুলতে দিতে চাইনে বলেই এই দয়াটুকু চাই !

সে সেশনে সমস্ত ঘটনা অনুপূর্বিক অকপটে বলে গেল। জজ সব কথা বিশ্বাস করলেন। জুরিরা বিশ্বাস করলেন না। সবুর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। আপিল করল না। সকলে বললে, আপিল করলে সে মুক্তি পাবেই। তার উত্তরে সবুর হেসে বলেছিল যে, সে মুক্তি চায় না—আমিরের যেটুকু রক্ত তার হাতে লেগেছিল—তা ধুয়ে ফেলতে সাতটা বছরেরও যদি সে পারে—সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

জজ তার রায়ে লিখেছিলেন, আর কাউকে দণ্ড দিতে এত ব্যথা তিনি পাননি জীবনে।

যেদিন বিচার শেষ হয়ে গেল, সেদিন সপরিবারে আলি নসিব মিঞা ময়মনসিংহে ছিলেন।

নূরজাহান তার বাবাকে সেই দিনই ধরে বসলে,—তারা সদলে মক্কা যাবে। আলি নসিব মিঞা বহুদিন থেকে হজ্ব করতে যাবেন বলে মনে করে রেখেছিলেন, মাঝে মাঝে বলতেনও সে কথা। নানান কাজে যাওয়া আর হয়ে উঠেনি, মেয়ের কথায় তিনি যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। অত্যন্ত খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক কইছস বেডি, চল আমরা মক্কায় গিয়াই এ সাতটা বছর কাটাইয়া দিই। এ পাপ-পুরীতে আর থাকতাম না! আর আল্লায় যদি বাঁচাইয়া রাহে, ব্যাডা তালবিল্লিরে কইয়া যাইবাম, হে যেন একডিবার আমাদের দেখা দিয়া আইয়ে।' 'বেডা তালবিল্লি' বলেই হো হো করে পাগলের মতো হেসে উঠেই আলি নসিব মিঞা পরক্ষণে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

নূরজাহানের মা প্রতিবাদ করলেন না। তিনি জানতেন, মেয়ের যা কলঙ্ক রটেছে, তাতে তার বিয়ে তার এ দেশে দেওয়া চলবে না। আর, এ মিথ্যা বদনামের ভাগী হয়ে এদেশে থাকাও চলে না।

ঠিক হল একেবারে সব ঠিকঠাক করে জমি-জয়াগা বিক্রি করে শুধু নগদ টাকা নিয়ে চলে যাবেন। আলি নসিব মিঞা সেই দিনই স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে দেখা করে সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এলেন। কথা হল ব্যাঙ্কই এখন টাকা দেবে, পরে তারা সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা তুলে নেবে।

তার পরদিন সকলে জেলে গিয়ে সবুরের সাথে দেখা করলেন। সবুর সব শুনল। তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। জেলের জামার হাতায় তা মুছে বললে, 'আব্বা, আম্মা, আমি সাত বছর পরে যাইবাম আপনাদের কাছে—কথা দিতাছি।'

তারপর নূরজাহানের দিকে ফিরে বললে, 'আল্লায় যদি এই দুনিয়ায় দেখবার না দেয়, যে দুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুঁইজ্যা লইবাম।' অশ্রুতে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়ে গেল, আর সে বলতে পারলে না। নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে সবুরের পায়ের ধুলা নিতে গিয়ে তার দু ফোঁটা অশ্রু সবুরের পায়ে গড়িয়ে পড়ল! বলল, 'আই দোওয়া কর।'

কারাগারের দুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল—সেই দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের মনে হল—তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝিবা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল!

শিউলিমালা

১

মিস্টার আজহার কলকাতায় নামকরা তরুণ ব্যারিস্টার।

বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান, মালি, চাকর-চাকরানিতে বাড়ি তার হর্দম সরগরম।

কিন্তু বাড়ির আসল শোভাই নাই। মিস্টার আজহার অবিবাহিত।

নামকরা ব্যারিস্টার হলেও আজহার সহজে বেশি কেস নিতে চায় না। হাজার পীড়াপীড়িতেও না। লোকে বলে, পসার জমাবার এও এক রকম চাল।

কিন্তু কলকাতার দাবাড়েরা জানে যে, মিস্টার আজহারের চাল যদি থাকে—তা সে দাবার চাল।

দাবা খেলায় তাকে আজো কেউ হারাতে পারেনি। তার দাবার আড্ডার বন্ধুরা জানে, এই দাবাতেই মিস্টার আজহারকে বড় ব্যারিস্টার হতে দেয় নি, কিন্তু বড় মানুষ করে রেখেছে।

বড় ব্যারিস্টার যখন 'উইকলি নোটস' পড়েন আজহার তখন অ্যালেখিন, ক্যাপাব্লাঙ্কা কিংবা রুবিনসস্টাইন, রেটি, মরফির খেলা নিয়ে ভাবে, কিংবা চেস-ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে, আর চোখ বুঁজে তাদের চালের কথা ভাবে।

সকালে আর হয় না, বিকেলের দিকে রোজ দাবার আড্ডা বসে। কলকাতার অধিকাংশ বিখ্যাত দাবাড়েই সেখানে এসে আড্ডা দেয়, খেলে, খো নিয়ে আলোচনা করে।

আজহারের সবচেয়ে দুঃখ, ক্যাপাব্লাঙ্কার মতো খেলোয়াড় কিনা অ্যালেখিনের কাছে হেরে গেল। অথচ এই অ্যালেখিনই বোগোল-জুবোর মতো খেলোয়াড়ের কাছে অন্তত পাঁচ পাঁচবার হেরে যায়!

মিস্টার মুখার্জি অ্যালেকিনের একরোখা ভক্ত। আজও মিস্টার আজহার নিত্যকার মতো একবার ঐ কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে, মিস্টার মুখার্জি বলে উঠলো—'কিন্তু তুমি যাই বল আজহার, অ্যালেখিনের ডিফেন্স—ওর বুঝি জগতে তুলনা নেই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যালেখিনের ডিফেন্স—ওর বুঝি জগতে তুলনা নেই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যালেখিনের কাছে তিন-পাঁচে পনের বার হেরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দুচার বাজি সমস্ত ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নই হেরে থাকেন। চব্বিশ দান খেলায় পাঁচ দান জিতেছে। তাছাড়া, বোগোল-জুবোও তো যে সে খেলোয়াড় নয়!'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'আরে রাখ তোমার অ্যালেখিন। এইবার ক্যাপাব্লাঙ্কার সাথে আবার খেলা হচ্ছে তার, তখন দেখো একবার অ্যালেখিনের দুর্দশা! আর বোগোল

জুবোকে তো সেদিনও ইটালিয়ান মন্টিসেলি বগলদাবা করে দিলে। হ্যাঁ, খেলে বটে গ্রানফেলড।'

বন্ধুদের মধ্যে একজন চটে গিয়ে বললে, 'তোমাদের কি ছাই আর কোনো কম্ম নেই? কোথাকার বগলঝুপো না ছাইমুণ্ড, অ্যালেখিন না ঘোড়ার ডিম—জ্বালালে বাবা।'

মুখার্জি হেসে বলল, 'তুমি তো বেশ গ্রাবু খেলতে পার অজিত, এমন মাহ ভাদর, চলে যাও না স্ত্রীর বোনেদের বাড়িতে! এ দাবার চাল তোমার মাথায় ঢুকবে না।'

তরুণ উকিল নাজিম হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলে উঠল, 'ও জিনিস মাথায় না ঢোকাতে বেঁচে গেছি বাবা! তার চেয়ে আজহার সাহেব দুটো গান শোনান, আমরা শুনে যে যার ঘরে চলে যাই। তারপর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বস।'

দাবাড়ে দলের আপত্তি টিকল না। আজহারকে গাইতে হল। আজহার চমৎকার ঠুংরি গায়। বিশুদ্ধ লক্ষ্ণৌ ঢং-এর অজস্র ঠুংরি গান তার জানা ছিল। এবং তা এমন দরদ দিয়ে গাইত সে, সে শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু সে কেবলি গজল গাইতে লাগল।

আজহার অন্য সময় সহজে গজল গাইতে চাইত না।

মুখার্জি হেসে বলে উঠল,—'আজ তোমার প্রাণে বিরহ উথলে উঠল নাকি হে? কেবল গজল গাচ্ছ, মানে কি ? রংটং ধরেছে নাকি কোথাও?'

আজহারও হেসে বলল, 'বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।'

এতক্ষণে যেন সকলের বাইরের দিকে নজর পড়ল। একটু আগের বর্ষা-ধোওয়া ছলছলে আকাশ। যেন একটি বিরাট নীল পদ্ম। তারি মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোক-ভ্রমর।

লেক-রোডের পাশে ছবির মতো বাড়িটি।

শিউলির সাথে রজনীগন্ধার গন্ধ-মেশা হাওয়া মাঝে মাঝে হলঘরটাকে উদাস-মদির করে তুলছিল!

সকলেরি চোখ মন দুই যেন জুড়িয়ে গেল!

নাজিম সোজা হয়ে যেন জুড়িয়ে গেল!

নাজিম সোজা হয়ে বসে বলল, 'ওই দাবার গুটি নিয়ে বসলে কি আর এসব চোখে পড়ত?'

আজহার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'সত্যিই তাই।'

মুখার্জি বলে উঠল, 'নাঃ, এ শালার শিউলির ফুল আজ দাবা খেলতে দেবে না দেখছি!'

আজহার বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'তোমারও শিউলি! ফুলের সঙ্গে কোনো কিছু জড়িত আছে নাকি হে?'

তারা কিছু বলবার আগেই অজিত বলে উঠল, 'আরে ছোঃ! দাবাড়ের আবার রোমান্স! বেচারার জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে! নিজের স্ত্রীর প্রেমে

পড়া ! রাম বল ! তাও—সে স্ত্রী চলে গেছেন বাপের বাড়ি—ঐ দাবার জ্বালায় ! ওর আবার শিউলি ফুল !'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। মুখার্জি চটে গিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম অজিত ! পাগলের মতো যা তা বকলেই তাকে রসিকতা বলে না !'

অজিত মুখ চুন করার ভান করে বলে উঠল, 'আমি তো রসিকতা করি নি দাদা। তুমি সত্যসত্যিই তোমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছ—দশজনে বদনাম দেয়, তাই আমিও বললাম। ওঁরা যদি তা শুনে হাসেন, তাতে আমার কি দোষ হল ?'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'এ কি তোমার অন্যায় অপবাদ অজিত ? স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দাবাড়ের কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না, এ তুমি কি করে জানলে ?'

অজিত বললে, 'প্রথম মিস্টার মুখার্জি তারপর তোমাকে দেখে !'

আজহার বলে উঠল, 'আরে, আমি যে বিয়েই করিনি।'

অজিত বলে উঠল, 'তার মানে, তোমার অবস্থা আরো শোচনীয়। ও বেচারা তবু অন্তত স্ত্রীর সঙ্গে লভে পড়ল, তোমার আবার স্ত্রীই জুটল না !'

নাজিম টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ব্রাভো ! বেঁচে থাকুন অজিত বাবু ! এইবার জোর বলেছেন !'

এমন সময় মালি শিউলিফুলের একজোড়া চমৎকার গোড়ে মালা টেবিলের উপরে রেখে চলে গেল। অজিত গম্ভীরভাবে মালা দুটি ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখতেই সকলে হেসে উঠল। অজিত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিনয় করার সুরে বলে উঠল, 'হে ব্র্যাকেট-সুন্দরী ! আজি এই শুক্লা শারদীয়া নিশিতে এই সেঁউতি মালার—'

আজহার ম্লান হাসি হেসে বাধা দিয়ে বলল 'দোহাই অজিত। ও মালা নিয়ে বিদ্রূপ করিসনে ভাই ! ও মালা আমার নয়।'

অজিত না-ছোড় বান্দা। তার বিস্ময়কে চাপা দিয়ে সে বলে উঠল, 'তবে এ মালা কার বন্ধু ? থুড়ি—কার উদ্দেশ্যে বন্ধ ?'

নাজিম বলে উঠল, 'দেখ, দাবাড়ের নাকি রোমান্স নেই ?'

আজহার বলে উঠল, 'আমি প্রতি বছর এমনি পয়লা আশ্বিন শিউলিফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দেই। এ-মালা জলের—অন্য কারুর নয়।' মুখে বিষাদমাখা হাসি।

মায় দাবাড়ের দল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠে বসল। অজিত বয়কে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলে ভালো করে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বসে আজহারের দিকে চেয়ারটা ফিরিয়ে বলে উঠল, 'তারপর, বলত বন্ধু, ব্যাপারটা কি ! সঙিন নিশ্চয়ই ! পয়লা আশ্বিন—প্রতি বছর শিউলি-মালা জলে ভাসিয়ে দেওয়া। চমৎকার গল্প হবে ! বলে ফেল। নৈলে, এইখানে সকলে মিলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দেবো !'

সকলে হেসে উঠল, কিন্তু সায় দিল সকলে অজিতের প্রস্তাবে।

অনেক পীড়াপীড়ির পর আজহার হেসে বলে উঠল, 'কিন্তু তারও আরম্ভ যে দাবা খেলা দিয়ে।'

অজিত লাফিয়ে বলে উঠল, 'তা হোক ! ও পলতার সুক্তো খেয়ে ফেলা যাবে কোনো রকমে, শেষের দিকে দই-সন্দেশ পাব।'

মুখার্জি বলে উঠল, 'এ দাবা-খেলায় নৌকোর কিস্তিই বেশি থাকবে হে ! গজ ঘোড়া কাটাকাটি হয়ে যাবে ! ভয় নেই !'

২

সকলের আর এক প্রস্থ চা খাওয়া হলে পর সিগার ধরিয়ে মিনিটখানিক ধুম্র উদ্‌গীরণ করে আজহার বলতে লাগল—

তখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারি পাস করে এসেই শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্র মাস। তখনো পূজার ছুটিওয়ালার দল এসে ভিড় জমায়নি। তবে আগে থেকেই দু-একজন করে আসতে শুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড্ডো বেশি ঝোঁক ছিল। ও ঝোঁক বিলেতে গিয়ে আরো বেশি করে চাপল। সেখানে ইয়েট্স্, মিচেল, উইন্টার, টমাস প্রভৃতি সকল নামকরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি এবং কেম্ব্রিজের হয়ে অনেকগুলো খেলা জিতেওছি। শিলং গিয়ে খুঁজতেই দু-একজন দাবা-খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে গেল। তবে তারা কেউ বড় খেলোয়াড় নয়। তারা আমার কাছে ক্রমাগত হারতো। একদিন ওরির মধ্যে একজন বলে উঠল, 'একজন বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর আছেন এখানে, তিনি মস্ত বড় দাবাড়ে, শোনা যায়—তাঁকে কেউ হারাতে পারে না—যাবেন খেলতে তাঁর সাথে?'

আমি তখনি উঠে পড়ে বললাম, 'এখনই যাব, চলুন। কোথায় তিনি?'

সে ভদ্রলোকটি বললেন, 'চলুন না, নিয়ে যাচ্ছি। আপনার মতো খেলোয়াড় পেলে তিনি বড় খুশি হবেন। তাঁরও আপনার মতোই দাবা-খেলার নেশা। অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই !'

আমি ইউরোপে অনেকেরই 'ব্লাইন্ড ফোল্ডেড' খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না। অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই !'

আমি ইউরোপে অনেকেরই 'ব্লাইন্ড ফোল্ডেড' খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ, বোধ হয় শুক্লাপঞ্চমীর। যেন নতুন আশার ইঙ্গিত। সারা আকাশ যেন সাদামেঘের তরণীর বাইচ খেলা শুরু হয়েছে। চাঁদ আর তারা তার মাঝে যেন হাবুডুবু খেয়ে একবার ভাসছে একবার উঠছে।

ইউকালিপটাস আর দেওদারু তরুঘেরা একটি রঙিন বাংলোয় গিয়ে আমরা উঠতেই দেখি, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস এক শান্ত সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি তরুণীর সঙ্গে দাবা খেলছেন।

আমাদের দেশের মেয়েরাও দাবা খেলেন, এই প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তরুণীর দিকে তাকাতেই তরুণীটি উঠে পড়ে বলল, 'বাবা, দেখ কারা এসেছেন !'

খেলাটা শেষ না হতেই মেয়ে উঠে পড়াতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হাসিমুখে উঠে বললেন, 'আরে, বিনয় বাবু যে ! এঁরা কারা ? এস, বস। এঁদের পরিচয়—'

বিনয় বাবু—যিনি আমায় নিয়ে গেছিলেন, আমার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ লাফিয়ে উঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি—এই তুমিই আজহার ? আরে, তোমার নাম যে চেস-ম্যাগাজিনে, কাগজে অনেক দেখেছি। তুমি যে মস্ত বড় খেলোয়াড় ! ইয়েটসের সঙ্গে বাজি চটিয়েছ, একি কম কথা ! এইতো তোমার বয়েস !—বড় খুশি হলুম—বড় খুশি হলুম !...ওমা শিউলি, একজন মস্ত দাবাড়ে এসেছেন ! দেখে যাও ! বাঃ, বড় আনন্দে কাটবে তা হলে। এই বয়সেও আমার বড্ডো দাবা-খেলার ঝোঁক, কি করি, কাউকে না পেয়ে মেয়ের সাথেই খেলছিলুম !' বলেই হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে শান্ত সন্ধ্যাকে মুখরিত করে তুললেন।

শিউলি নমস্কার করে নীরবে তার বাবার পাশে এসে বসল। তাকে দেখে আমার মনে হল এ যেন সত্যিই শরতের শিউলি।

গায়ে গোধুলি রং-এর শাড়ির মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখখানি—হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলিফুলের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়তো একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙল।

বৃদ্ধ যেন খেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলেন। চাকর চায়ের সরঞ্জাম এনে দিতেই শিউলি চা তৈরি করতে করতে হেসে বলে উঠল, 'বাবার বুঝি আর দেরি সইছে না ?' বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না ! বাবা বড্ডো দাবা খেলতে ভালবাসেন ! দাবা খেলতে না পেলেই ওঁর অসুখ হয় !' বলেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইবার চা খেতে খেতে খেলা আরম্ভ করুন, আমরা দেখি।'

বিনয় হেসে বললে, 'হাঁ, এইবার সামনে সামনে লড়াই। বুঝলে মিস চৌধুরী, আমাদের রোজ উনি হারিয়ে ভূত করে দেন।'

খেলা আরম্ভ হল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল, কেউ কেউ উপরচালও দিতে লাগল। মিস চৌধুরী ওর্ফে শিউলি তার বাবার যা দুএকটি ত্রুটি ধরিয়ে দিলে, তাতে বুঝলাম—এও এর বাবার মতোই ভালো খেলোয়াড়।

কিছুক্ষণ খেলার পর বুঝলাম, আমি ইউরোপে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি—তাঁদের অনেকের চেয়েই বড় খেলোয়াড় প্রফেসর চৌধুরী। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে জানতাম বড় কেমিস্ট বলে, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত ভালো দাবা খেলতে পারেন, এ আমি জানতাম না।

আমি একটা বেশি বল কেটে নিতেই বৃদ্ধ আমার পিঠে চাপড়ে তারিফ করে ডিফেন্সিভ খেলা খেলতে লাগলেন। তিনি আমার গজের খেলার যথেষ্ট প্রশংসা

করলেন। শিউলি বিস্ময়ে ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু একটা বল কম নিয়েও বৃদ্ধ বারংবার আমার প্রশংসা করতে করতে বললেন, 'দেখলি মা শিউলি, আমাদের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস, গজ ঘোড়ার মতো খেলে না। দেখলি জোড়া গজে কি খেললে! বড় ভালো খেল বাবা তুমি! আমি হারি কিংবা হারাই, ড্র সহজে হয় না!'

শিউলি হেসে বললে, 'কিন্তু তুমি হার নি কত বৎসর বল তো বাবা!'

প্রফেসর চৌধুরী হেসে বললেন, 'না মা, হেরেছি। সে আজ প্রায় পনরো বছর হল, একজন পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক—আধুনিক শিক্ষিত নন—আমায় হারিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ওঃ, ওরকম খেলোয়াড় আর দেখিনি!'

আবার খেলা আরম্ভ হতেই বিনয় হেসে বলে উঠল, 'এইবার মিস্ চৌধুরী খেলুন না মিস্টার আজহারের সাথে!'

বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তো! তুই-ই খেল মা, আমি একবার দেখি।'

শিউলি লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, 'আমি কি ওঁর সঙ্গে খেলতে পারি?'

কিন্তু সকলের অনুরোধে সে খেলতে বসল। মাঝে চেস-বোর্ড একধারে চেয়ারে শিউলি—একধারে আমি! তার কেশের গন্ধ আমার মস্তিষ্ককে মদির করে তুলছিল। আমার দেখে মনে যেন নেশা ধরে আসছিল। আমি দু-একটা ভুল চাল দিতেই শিউলি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নত করে ফেললে। মনে হল, তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে হাসি যেন অর্থপূর্ণ।

আবার ভুল করতেই আমি চাপায় পড়ে আমার একটা নৌকা হারালাম। বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনয় বাবুর দল হেসে বলে উঠলেন—'এইবার মিস্টার আজহার মাত হবেন।' মনে হল, এ হাসিতে বিদ্রূপ লুকানো আছে।

আমি এইবার সংযত হয়ে মন দিয়ে খেলতে লাগলাম। দুই গজ ও মন্ত্রী দিয়ে এবং নিজের কোটের বোড়ে এগিয়ে এমন অফেন্সিভ খেলা খেলতে শুরু করে দিলাম যে, প্রফেসর চৌধুরীও আর এ-খেলা বাঁচাতে পারলেন না। শিউলি হেরে গেল! সে হেরে গেলেও এত ভালো খেলেছিল যে, আমি তার প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আমি বললাম—'দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ন মিস্ মেনচিকের সাথেও খেলেছি, কিন্তু এত বেশি বেগ পেতে হয়নি আমাকে আমি তো প্রায় হেরেই গেছিলাম।'

দেখলাম, আনন্দে লজ্জায় শিউলি কমলফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি বেঁচে গেলাম। সে যে হেরে গিয়ে আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়নি—এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করলাম!

প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে আবার খেলা হল, এবারও ড্র হয়ে গেল।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে! বললেন, 'হাঁ, এতদিন পরে একজন খেলোয়াড় পেলুম, যার সঙ্গে খেলতে হলে অন্তত আট চাল ভেবে খেলতে হয়!'

কথা হল, এরপর রোজ প্রফেসর চৌধুরীর বাসায় দাবার আড্ডা বসবে।

উঠবার সময় হঠাৎ বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'মা শিউলি, এতক্ষণ খেলে মিস্টার আজহারের নিশ্চয়ই বড্ডো কষ্ট হয়েছে, ওঁকে একটু গান শোনাও না!' আমি ততক্ষণে বসে পড়ে বললাম, 'বাঃ এ খবর তো জানতাম না।'

শিউলি কুণ্ঠিতস্বরে বলে উঠল, 'এই শিখছি কিছুদিন থেকে, এখনো ভালো গাইতে জানিনে!'

শিউলির আপত্তি আমাদের প্রতিবাদে টিকল না। সে গান করতে লাগল।

সে গান যারই লেখা হোক—আমার মনে হতে লাগল—এর ভাষা যেন শিউলিরই প্রাণের ভাষা—তার বেদনা নিবেদন।

এক একজনের কণ্ঠ আছে—যা শুনে এ কণ্ঠ ভালো কি মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ করে দেয়। সে কণ্ঠ এমন দরদে ভরা—এমন অকৃত্রিম যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। সে কণ্ঠ এমন দরদে ভরা—এমন অকৃত্রিম যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। ভালোমন্দ বিচারে বহু উর্দ্ধে সে কণ্ঠ, কোনো কর্তব নেই, সুর নিয়ে কোনো কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, অথচ হৃদয়কে স্পর্শ করে। এ প্রশংসাবাণী উথলে উঠে মুখে নয়—চোখে!

এ সেই কণ্ঠ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরের একবার মাত্র বলতে গেলাম, 'অপূর্ব!' গলার স্বর বেরুল না। শিউলির চোখে পড়ল—আমার চোখের জল। সে তার দীর্ঘায়ত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল।

হায়, সে যদি জানত—কালির লেখা মুছে যায়, জলের লেখা মোছে না!

সেদিন আমায় নিয়ে কে কি ভেবেছিল—তা নিয়ে সেদিনও ভাবিনি, আজও ভাবি না। ভাবি—শিউলিফুল যদি গান গাইতে পারত, সে বুঝি এমনি করেই গান গাইত। গলায় তার দরদ, সুরে তার এমনি আবেগ!

সুরের যেটুকু কাজ সে দেখাল, তা ঠুংরি ও টপ্পা মেশানো। কিন্তু বুঝলাম, এ তার ঠিক শেখা নয়—গলার ও কাজটুকু স্বতঃস্ফূর্ত! কমল যেমন না জেনেই তার গন্ধ-পরাগ ঘিরে শতদলের সুচারু সমাবেশ করে—এও যেন তেমনি।

গানের শেষে বলে উঠলাম, 'আপনি যদি ঠুংরি শেখেন, আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পী হতে পারেন! কি অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর।'

শিউলিফুলের শাখায় চাঁদের আলো পড়লে তা যেমন শোভা ধারণ করে, আনন্দ ও লজ্জা মিশে শিউলিকে তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শিউলি তার লজ্জাকে অতিক্রম করে বলে উঠল, 'না না, আমার গলা একটু ভাঙা। সে যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনি গান জানেন। জানেন যদি, গান না একটা গান।'

আমি একটু মুশকিলে পড়লাম। ভাবলাম, 'না' বলি। আবার গান শুনে গলাটাও গাইবার জন্য সুড়সুড় করছে! বললাম, 'আমি ঠিক গাইয়ে নই, সমঝদার মাত্র! আর, যা গান জানি, তাও হিন্দি।'

প্রফেসর চৌধুরী খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'আহা হা হা ! বলতে হয় আগে থেকে ! তা হলে যে গানটাই আগে শুনতাম তোমার। আর গান হিন্দি ভাষায় না হলে জমেই না ছাই। ও ভাষাটাই যেন গানের ভাষা। দেখ, ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না। কীর্তন, বাউল আর রামপ্রসাদী ছাড়া এ ভাষায় অন্য ঢং-এর গান চলে না।' আমি বললাম, 'আমি যদিও বাংলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না।'

গান করলাম। প্রফেসর চৌধুরী তো ধরে বসলেন, তাঁকে গান শেখাতে হবে কাল থেকে। শিউলির দুই চোখে প্রশংসার দীপ্তি ঝলমল করছিল।

বিনয় বাবুর দলও ওস্তাদি গানেরই পক্ষপাতী দেখলাম। তাদের অনুরোধে দুচারখানা খেয়াল ও টপ্পা গাইলাম। প্রফেসর চৌধুরীর সাধুবাদের আতিশয্যে আমার গানের অর্ধেক শোনাই গেল না। শেষের দিকে ঠুংরিই গাইলাম বেশি।

গানের শেষে দেখি আমাদের পিছন দিকে আরো কয়েকটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। শিউলি পরিচয় করে দিল—'ইনি আমার মা—ইনি মামিমা—এরা আমার ছোট বোন।'

তার পরের দিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলাম। ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ। চোখ জ্বালা করে উঠল। মনে হল, চোখে এক কণা বালি পড়লেই যদি চোখ এত জ্বালা করে—চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে।

৩

দেড় মাস ছিলাম শিলং-এ। হপ্তাখানেকের পরেই আমাকে হোটেল ছেড়ে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়ি থাকতে হয়েছিল গিয়ে। সেখানে আমার দিন-রাত্রি নদীর জলের মতো বয়ে যেতে লাগলো। কাজের মধ্যে দাবা-খেলা আর গান।

মুশকিলে পড়লাম—প্রফেসর চৌধুরীকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দাবা-খেলা তো আছেই—তাঁকে গান শেখানোই হয়ে উঠল আমার পক্ষে সবচেয়ে দুষ্কর কার্য।

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার তান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল।

মনে হল আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিময় হল না—হবেও না এ জীবনে কোনোদিন—কিন্তু কণ্ঠ বদল হয়ে গেল। আর মনের কথা—সে শুধু মনই জানে !

অজিত বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কণ্ঠ না কণ্ঠী বদল বাবা ? শেষটা নেড়ানেড়ীর প্রেম ? ছোঃ !'

আজহার কিছু না বলে আবার সিগার ধরিয়ে বলে যেতে লাগল—

একদিন ভোরে শিউলির কণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেল। সে গাচ্ছিল—

'এখন আমার সময় হল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।'

গান শুনতে শুনতে মনে হল—আমার বুকের সকল পাঁজর জুড়ে ব্যথা। চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। চোখে জল ভরে এল।

আশাবরী সুরের কোমল গান্ধারে আর ধৈবতে যেন তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা গড়িয়ে পড়েছিল। আজ প্রথম শিউলির কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আভাস পেলাম।

ঠং করে কিসের শব্দ হতেই ফিরে দেখি, শিউলি তার দুটি কর-পল্লব ভরে শিউলি ফুলের অঞ্জলি নিয়ে পূজারিণীর মতো আমার টেবিলের উপর রাখছে। চোখে তার জল।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার অশ্রু লুকাবার কোনো ছলনা না করে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি কালই যাচ্ছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে হৃদয়াবেগ সংযত করে আস্তে বললাম—'হাঁ ভাই!' আরো যেন কি বলতে চাইলাম। কিন্তু কি বলতে চাই ভুলে গেলাম।

শিউলি, শিউলি ফুলগুলিকে মুঠোয় তুলে অন্যমনস্কভাবে অধরে কপোলে ছুঁইয়ে বললে, 'আবার কবে আসবেন।'

আমি ম্লান হাসি হেসে বললাম, 'তা-ও জানিনে ভাই! হয়তো আসব!'

শিউলি ফুলগুলি রেখে চলে গেল। আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না।

আমার সমস্ত মন যেন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল—ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এই এক মুহূর্তের জন্যই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি, জীবনে তোর দ্বিতীয়বার এ শুভ মুহূর্ত আর আসবে না, আসবে না।

এক মাস ওদের বাড়িতে ছিলাম। কত স্নেহ কত যত্ন, কত আদর। অবাধ মেলামেশা—সেখানে কোনো নিষেধ, কোনো গ্লানি, কোনো বাধাবিঘ্ন কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এসব ছিল না বলেই বুঝি এতদিন ধরে এত কাছে থেকেও কারুর করে কর-স্পর্শটুকুও লাগেনি কোনোদিন। এই মুক্তিই ছিল বুঝি আমাদের সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কেউ কারুর মন যাচাই করিনি। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথাও উদয় হয়নি মনে। একজন অসীম আকাশ—একজন অতল সাগর। কোনো কথা নেই—প্রশ্ন নেই, শুধু এ ওর চোখে, ও এর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে।

কেউ নিষেধ করলে না, কেউ এসে পথ আগলে দাঁড়াল না! সেও যেন জানে—আমাকে চলে আসতেই হবে, আমিও যেন জানি—আমাকে যেতেই হবে।

নদীর স্রোতই যেন সত্য—অসহায় দুই কূল এ ওর পানে তাকিয়ে আছে। অভিলাষ নাই—আছে শুধু অসহায় অশ্রু-চোখে চেয়ে থাকা।

সে চলে গেলে টেবিলের শিউলি ফুলের অঞ্জলি দুই হাতে তুলে মুখে ঠেকাতে গেলাম। বুঝি বা আমারও অজানিতে আমি সে ফুল ললাটে ঠেকিয়ে আবার টেবিলে

রাখলাম। মনে হল, এ ফুল পূজারিণীর—প্রিয়ার নয়! ভাবতেই বুক যেন অব্যক্ত বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল।

চোখ তুলেই দেখি, নিত্যকার মতোই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শিউলি বলছে,—'আজ আর গান শেখাবেন না?'

আমি বললাম—'চল, আজই তো শেষ নয়!'

শিউলি তার হরিণ-চোখ তুলে আমার পানে চেয়ে রইল। ভয় হল বলে তার মানে বুঝবার চেষ্টা করলাম না।

ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া—যত ভালোবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধূলায় ঝরে পড়বে।

এ যেন পরির দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে!

এ যেন মায়া-মৃগ—ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে!

গান শেখালাম—বিদায়ের গান নয়। বিদায়ের ছাড়া আর সব কিছুর গান। বিদায় বেলা তো আসবেই—তবে ওর কথা বলে ওর সব বেদনা সব মাধুর্যটুকু নষ্ট করি কেন?

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল নিষ্কলঙ্ক—নির্মেঘ—নিরাভরণ। আমি প্রফেসর চৌধুরীকে বললাম—আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য ভালোমানুষ সেজেছে তো! কোনো বেশভূষা নেই।

বলতেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরী বলে উঠলেন,—'সন্ধ্যা আজ বিধবা হয়েছে!'

এই একটি কথায় ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম। এই শান্ত সৌম্য মানুষটির বুকেও কি ঝড় উঠছে বুঝলাম। মনে মনে বললাম—তুমি অটল পাহাড়, তোমার পায়ের তলায় বসে শুধু ধ্যান করতে হয়। তোমাকে তো ঝড় স্পর্শ করতে পারে না!

বৃদ্ধ মন দিয়ে আমার মনের কথা শুনেছিলেন। ম্লান হাসি হেসে বললেন—'আমি অতি ক্ষুদ্র বাবা! পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ! তবু তোমাদের শ্রদ্ধা দেখে গিরিরাজ হতেই ইচ্ছা করে।'

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই শিউলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—'এই যে সন্ধ্যা দেবী!' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল সেদিন টকটকে লাল রং-এর শাড়ি। ওকে লাল শাড়ি পরতে আর কোনদিন দেখিনি। মনে হল, সারা আকাশকে বঞ্চিত করে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে রক্ত-ধারা রং-এর শাড়ি, তার মনে রক্ত-ধারা,—মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া! চোখ যেমন পুড়িয়ে গেল, তেমনি মনে পূরবীর বাঁশী বেজে উঠল।

শিউলির কাছে দু-একটা বাংলা গান শিখেছিলাম। আমি বললাম—'একটা গান গাইব?' শিউলি আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল—'গান!'

আমি গাইলাম—

'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এলো
সোনার গগন রে !'

প্রফেসর চৌধুরী উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'বাবাজি, আজ একবার শেষবার দাবা খেলতে হবে !'

চৌধুরী সাহেব উঠে যেতে আমি বললাম—'আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন এমনি আশ্বিন মাস—এমনি সন্ধ্যা আসবে—তখন কি করব বলতে পার ?'

শিউলি তার দু চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় করে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল,—'শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও !'

আমি নীরবে সায় দিলাম—তাই হবে ! জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কি করবে।' সে হেসে বললে, 'আশ্বিনের শেষে তো শিউলি ঝরেই পড়ে !'

আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকচিক করে উঠল।

রাত্রে দাবা-খেলার আড্ডা বসল। প্রফেসর চৌধুরী আমার কাছে হেরে গেলেন। আমি শিউলির কাছে হেরে গেলাম। জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ হার ! আর সেই হারাই আমার গলার হার হয়ে রইল।

সকালে যখন বিদায় নিলাম—তখন তাদের বাংলোর চারপাশে উইলো-তরু তুষারে ঢাকা পড়েছে !

আর তার সাথে দেখা হয়নি—হবেও না। একটু হাত বাড়ালেই হয়তো তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলি ফুল—বড় মৃদু, বড় ভিরু, গলায় পরলে দু দণ্ডে আঁউরে যায় ! তাই শিউলি-ফুলের আশ্বিন যখন আসে—তখন নিরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই !

গ্রন্থ-পরিচয়

[নজরুল-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশ-কাল ও কতকগুলি রচনা-সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হইল।]

[পুনশ্চ শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত।]
'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হলো।

চক্রবাক

'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শ্রী গোপালদাস মজুমদার ; ডি.এম. লাইব্রেরি, ৬১, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রবাসী প্রেস, ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০।

'চক্রবাক' কাব্যে 'উৎসর্গ' ও গোড়ার শিরোনামহীন কবিতাটি ছাড়া এই ২১টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল : (১) তোমারে পড়িছে মনে, (২) বাদল-রাতের পাখি, (৩) স্তব্ধরাতে, (৪) বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি, (৫) কর্ণফুলী, (৬) শীতের সিন্ধু, (৭) পথচারী, (৮) মিলন-মোহনায়, (৯) গানের আড়াল, (১০) ভীরু, (১১) এ মোর অহঙ্কার, (১২) তুমি মোরে ভুলিয়াছ, (১৩) হিংসাতুর, (১৪) বর্ষা-বিদায়, (১৫) সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে, (১৬) অপরাধ শুধু মনে থাক, (১৭) আড়াল, (১৮) নদীপারের মেয়ে, (১৯) ১৪০০ সাল, (২০) চক্রবাক ও (২১) কুহেলিকা। 'ভীরু' ও 'এ মোর অহঙ্কার' পূর্ববর্তী 'জিঞ্জীর' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; অতএব এখানে পরিত্যক্ত হইল। 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতাটিতে ১৩টি স্তবক ; কিন্তু 'চক্রবাক' কাব্যে উহার ৬ষ্ঠ স্তবক বর্জ্জিত হইয়াছিল।

'তোমারে পড়িছে মনে' ১৩৩৫ ভাদ্রের ও 'স্তব্ধরাতে' ১৩৩৫ মাঘের 'ধূপছায়া'য় প্রকাশিত হয়।

'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' ১৩৩৫ চৈত্রের কালিকলমে প্রকাশিত হয়। উহার রচনার স্থান ও তারিখে : 'চট্টগ্রাম, ২৪-১-২৯।'

'কর্ণফুলী' সাপ্তাহিক আত্মশক্তিতে, 'পথচারী' ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠের উপাসনায় এবং 'গানের আড়াল' ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ-পৌষের ধূপছায়ায় প্রকাশিত হয়।

'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' ১৩৩৫ বৈশাখের সওগাতে 'রহস্যময়ী' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ-সম্পর্কে কবি কলিকাতা হইতে ৩১-৩-১৯২৮ তারিখের এক পত্রে ঢাকায় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবকে লিখেন :

> "আমি আবার বিষ্যুৎবার কলকাতা ফিরে আসব। সেদিন সন্ধ্যায় Broadcusting-এ আমার গান গাইতে হবে। ... আমি বিষুৎবারে দুটো গান ও আমার নতুন কবিতা 'রহস্যময়ী' আবৃত্তি করব। 'রহস্যময়ী' চৈত্রের সওগাতে বেরুবে। ওর 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নামটা বদলে 'রহস্যময়ী' করেছি।
>
> —[নজরুল-জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়, ৬৩ পৃঃ]

'হিংসাতুর' ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের সওগাতে প্রকাশিত হয়। উহার রচনার স্থান ও তারিখ : 'কলিকাতা, ২৯-৩-২৮।' এই কবিতাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই কবি তাঁহার প্রথমা (পরিত্যক্তা) পত্নীকে কলিকাতা হইতে ১-৭-৩৭ ইং তারিখে এক পত্রের শেষে P.S. (পুনশ্চ) দিয়া লিখেন :

> "আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোনো পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কুটক্তি ছিল।"
>
> —[নজরুল-রচনা-সম্ভার, প্রথম সংস্করণ, ২৩৮ পৃঃ]

'বর্ষা-বিদায়' ১৩৩৫ ভাদ্রের সওগাতে, "সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' ১৩৩৫ বৈশাখের প্রগতিতে, 'আড়াল' ১৩৩৬ আষাঢ়ের কল্লোলে এবং 'নদীপারের মেয়ে' ১৩৩৫ বৈশাখের কালিকলমে প্রকাশিত হয়।

'১৪০০ সাল' ১৩৩৪ আষাঢ়ের কল্লোলে 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। কল্লোল হইতে উহা ১৩৩৪ আষাঢ়ের নওরোজে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'কুহেলিকা' ১৩৩৫ মাঘের মোয়াজ্জিনে বাহির হয়।

পুনশ্চ

চক্রবাক ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ৪+৭৮ ; মূল্য দেড় টাকা। *নজরুল-রচনাবলী*র নতুন সংস্করণের প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

১৯২৯ সালের জানুয়ারিতে নজরুল ইসলাম আবার চট্টগ্রামে আসেন এবং তামাকুমণ্ডিতে অবস্থান করেন। এ-সময়ে *চক্রবাকের* সূচনা-কবিতা ("ওগো ও চক্রবাকী") 'বাদল-রাতের পাখি', 'স্তব্ধ-রাতে', 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি', 'কর্ণফুলী', 'শীতের সিন্ধু' এবং অন্যান্য গ্রন্থভুক্ত আরো কবিতা ও গান রচিত হয়। অধ্যাপিকা সেলিনা বাহার জামানের কাছে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়। 'শীতের

সিন্ধু' কবিতাটি 'সিন্ধু—চতুর্থ তরঙ্গ' রূপে রচিত হয়। মনে হয়, ছন্দের পার্থক্যের কারণে পরে কবি এর ভিন্ন নাম দেন।

'ভীরু' এবং 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতা দুটি 'ঝিঞ্জীর'-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'চক্রবাক' থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

সন্ধ্যা

'সন্ধ্যা' ১৩৩৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার ; ডি. এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রবাসী প্রেস, ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ১।০।

'সন্ধ্যা' কবিতাটি ১৩৩৫ আষাঢ়ের, 'তরুণ তাপস' ১৩৩৬ শ্রাবণের এবং 'আমি গাই তারি গান' ১৩৩৫ আশ্বিন-কার্তিকের 'ছাত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'ভোরের পাখী' ১৩৩৫ পৌষের সওগাতে প্রকাশিত হয়। উহার রচনার স্থান ও তারিখ : 'হরগাছা, রংপুর ; ১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।'

'জাগরণ' সাপ্তাহিক 'জাগরণ' পত্রিকায় এবং 'তরুণের গান' ১৩৩৫ শ্রাবণের মোয়াজ্জিনে প্রকাশিত হয়।

'চল্ চল্ চল্' ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র দ্বিতীয় বার্ষিক (১৩৩৫) 'শিখা'য় 'নতুনের গান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উহার পাদটীকায় মুদ্রিত আছে : 'দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন-সঙ্গীত।" ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৩৩৫ ফাল্গুনের সওগাতে "নতুনের গান' পুনর্মুদ্রিত হয় ; তাহার পাদটীকায় মুদ্রিত আছে : "নিখিল-বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মিলনীতে এই গানটি গীত হইয়াছিল।" শিখায় ও সওগাতে প্রকাশিত গানটিতে ১১শ ও ১২শ এবং ১৭শ ও ১৮শ চরণগুলি নিম্নরূপ—

তাজা-ব-তাজার গাহিয়া গান
সঞ্জীব করিব গোরস্থান
*　　*　　*
নয়া জমানার মিনারে মিনারে
নব-উষার আজান।

'ভোরের সানাই' ১৩৩৫ অগ্রহায়ণের' সওগাতে প্রকাশিত হয়। তাহার পাদটীকায় মুদ্রিত আছে : "নিখিল-বঙ্গ মুসলিম যুবক-সম্মিলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত।"

'যৌবন-জল-তরঙ্গ' ১৩৩৫ কার্তিকের ও 'রীফ-সর্দার' ১৩৩৫ আশ্বিনের সওগাতে প্রকাশিত হয়।

'বাংলার আজীজ' (চট্টগ্রামের পরলোকগত স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বি.এ. সাহেবের স্মরণে রচিত) ১৩৩৪ কার্তিকের মাসিক মোহাম্মদীতে ও 'সুরের দুলাল' (দিলীপকুমার রায়ের ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন-উপলক্ষে রচিত) ১৩৩৪ মাঘের কল্লোলে প্রকাশিত হয়।

'শরৎচন্দ্র' ১৩৩৪ আশ্বিনের নওরোজে প্রকাশিত হয়। পাদটীকায় বলা হয় : "স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।" রচনার স্থান ও তারিখ : 'কৃষ্ণনগর, ২৯ ভাদ্র ১৩৩৪।' শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর (১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮ মুতাবিক ২রা মাঘ ১৩৪৪, রবিবার), পর কবিতাটি ১৩৪৪ মাঘের বুলবুলে পুনর্মুদ্রিত হয়।

পু ন শ্চ

সন্ধ্যা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে (আগস্ট ১৯২৯) প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ২+৫৮ ; মূল্য পাঁচ সিকা। *নজরুল-রচনাবলী*র নতুন সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

প্রলয়-শিখা

'প্রলয়-শিখা' প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক মৌলভী মঈনউদ্দীন হোসয়ন তাঁহার 'নিবেদন'-এ প্রসঙ্গত: বলিয়াছেন : 'কবি নজরুল নিজের নামে ও নিজের দায়িত্বে 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ নিজেই প্রকাশক ও মুদ্রাকর হইলেন।' তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার বহি-খানি বাজেয়াফত করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র মুতাবিক ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখের সাপ্তাহিক 'আহ্‌লে হাদিস্‌' পত্রিকায় কবি নজরুল ইসলামের রাজদ্রোহ-অভিযোগ হইতে মুক্তি' শীর্ষক সংবাদে বলা হয় :

> '... প্রলয়-শিখা' নামক এক কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করিয়া রাজদ্রোহ অপরাধ করার সুপ্রসিদ্ধ কবি নজরুল ইসলাম প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৬-মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাইকোর্টে আপিল করায় জামিন-মুচলেকায় মুক্ত ছিলেন। গান্ধী-আরউইন-চুক্তির পর সরকারপক্ষ আপত্তি না করায় তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।'

'প্রলয়-শিখা' প্রথম সংস্করণের পরিবেশক বর্মণ পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী পরলোকগত ব্রজবিহারী বর্মণ ১৩৬৫ শ্রাবণ-আশ্বিনের 'ফসল' পত্রিকায় লিখেন :

'১৯৩০ সালে কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয়-শিখা' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করি। ইচ্ছাকৃতভাবেই, গরম গরম কবিতা তাতে রাখা হয়। রাজদ্রোহের ভয়ে যে-সব কবিতা পূর্বে কোন বইয়ে দেওয়া হয়নি, সেগুলি এবং কয়েকটি নয়া কবিতাও এতে সংযোজিত হয়। বর্তমান প্রকাশিত বইয়ে সেগুলোর সব নেই।'

১৩৩৬ সালে, ভাদ্রের 'ছাত্র' পত্রিকায় 'নমস্কার', আশ্বিনের সওগাতে 'হবে জয়', সাপ্তাহিক জাগরণে 'পূজা-অভিনয়' এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণের মোয়াজ্জিনে 'খেয়ালী' প্রকাশিত হয়।

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৩৩৫ সালে 'খেয়ালী' নামে একটি 'স্বল্পায়ু মাসিক প্রকাশ' করেন এবং কবি তাহারই জন্য 'আশীর্বাণী'-স্বরূপ 'খেয়ালী' কবিতাটি লিখিয়া দেন।

পু ন শ্চ

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ৫০/২ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক *প্রলয়-শিখা* প্রকাশিত হয়। মুদ্রাকর হিসেবেও তাঁর নাম মুদ্রিত হয়। 'বিধিমতে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ উৎপাদন করা হইয়াছে বা তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে', এই অভিযোগ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ বইটি বাজেয়াফত করা হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে ৬ নভেম্বর ১৯৩০ কবিকে গ্রেপ্তার করা হয়। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারের সময়ে আসামীপক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, নজরুল ইসলাম উক্ত গ্রন্থের লেখক হলেও প্রকাশক বা মুদ্রাকর নন এবং তিনি কাউকে বইটি প্রকাশ বা মুদ্রণ করতে দেন নি। ব্রজবিহারী বর্মণও বইটি প্রকাশ ও মুদ্রণের দায়িত্ব স্বীকার করেন নি। সরকারপক্ষ বলেন যে, পুস্তকটি গ্রন্থকারের অজ্ঞাতে প্রকাশিত হয়নি, তিনি বর্মণ পাবলিশিং প্রেসে প্রকাশের জন্য লেখাগুলি দিয়েছিলেন, ওই প্রকাশকের কাছ থেকে আংশিকভাবে টাকা পেয়েছিলেন এবং মুদ্রিত বইয়ের এক শ কপি গ্রহণ করেছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩০ তারিখে *প্রলয়-শিখা* গ্রন্থের 'নবভারতের হলদিঘাট', 'যতীন দাস' ও 'জাগরণ' কবিতা তিনটি আপত্তিকর বিবেচিত হওয়ায় বিচারক কবিকে ছ-মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। কবি পূর্বাপর জামিনে মুক্ত ছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

'নব-ভারতের হলদিঘাট' কবিতাটি রচিত হয় বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীনের (১৮৭৯-১৯১৫) স্মরণে। ১৯০৩ সালে তিনি অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং পরে যুগান্তর সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পরে তাঁর দল পরিকল্পনা করে যে, একটি

জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র নিয়ে বালেশ্বর রেললাইন অধিকার করে ইংরেজ সৈন্যদের কলকাতা যাবার পথ রুদ্ধ করা হবে। পুলিশ তা জানতে পেরে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চারজন সঙ্গীকে ঘিরে ফেলে। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। একজন ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং গুরুতরভাবে আহত যতীন্দ্রনাথ পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে দুজনের ফাঁসি ও অপরজনের ১৪ বছর কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ড ভোগকালে পুলিশের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে ১৯২৪ সালে ইনি মারা যান।

হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬) মুঘল সেনাপতি মানসিংহ মেবারের রানা প্রতাপ-সিংহকে পরাজিত করেছিলেন। পরে প্রতাপসিংহ হৃত রাজ্য অনেকখানি উদ্ধার করেন।

প্রলয়-শিখায় 'নব-ভারতের হলদিঘাট' কবিতাটির পরেই 'যতীন দাস' কবিতাটি বিন্যস্ত হওয়ায়, মনে হয়, যতীন্দ্রনাথ দাসের (১৯০৪-২৯) আত্মাহুতিই উভয় কবিতার প্রেরণা জুগিয়েছিল। যতীন দাস অল্প বয়সে বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং তরুণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে তিনি লাহোর জেলে প্রেরিত হন এবং জেল-কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন করেন। তাঁকে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করলে অভ্যন্তরীণ শারীরিক আঘাতে ৬৩ দিন অনশনের পর তাঁর মৃত্যু হয়। যতীন দাসের মৃতদেহ কলকাতায় আনা হলে বিশাল মিছিল তাঁর শবানুগমন করে। প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা *ধূমকেতুতে* (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) যতীন দাসের মৃত্যুসংবাদ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের *সমকালে নজরুল* (ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২১৬) গ্রন্থে সংকলিত ১৩৫২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা *সওগাতের* 'সাময়িকী' শীর্ষক রচনার নিম্নলিখিত অংশ এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ...আমরা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি বই দুখানার [*বিষের বাঁশী* ও *প্রলয়-শিখা*] উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। তবে '*প্রলয়-শিখা* সম্বন্ধে এই শর্ত দেওয়া হইয়াছে যে, 'নব ভারতের হলদিঘাট', 'যতীন দাস' ও 'জাগরণ'— এই তিনটি কবিতা বাদ দিয়া বইখানা ছাপিতে হইবে। এটা 'সর্বনাশের অর্ধেক ভালো'র মতো ব্যাপার। ঐ তিনটি কবিতা যাঁরা কখনো পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, ঐগুলি বাদ দিয়া ছাপিলে 'প্রলয়-শিখা'র মূল্য খুবই কমিয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, গভর্ণমেন্ট যখন গোটা বইটাকেই তাঁদের আইনের বেড়াজাল হইতে মুক্তি দিলেন, তখন ঐ তিনটি কবিতা নিয়াও তাঁরা অতঃপর মাথা না ঘামাইলে পারিতেন।...

প্রলয়-শিখার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে (আগস্ট ১৯৪৯)। প্রকাশক : মঈনউদ্‌দীন হোয়ায়ন, বি.এ., নূর লাইব্রেরি, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। পৃ. ৫০+৮+পরিশিষ্ট ; মূল্য আড়াই টাকা। এই সংস্করণে 'নব-ভারতের

হলদিঘাট' ও 'যতীন দাস' কবিতাটি মুদ্রিত হলেও 'জাগরণ' স্থান পায় নি। *নজরুল-রচনাবলী*তে এই সংস্করণের পাঠই অনুসৃত হয়েছে।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে রুবাইয়াখ-ই-হাফিজ' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। মূল্য ২ টাকা।১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠের 'জয়তী'তে ৬, ৭, ৮, ১২, ১৫, ৩২, ৪১, ৪৯, ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক ১০টি রুবাই ছাপা হইয়াছিল। ৫৪-সংখ্যক রুবাইটি জয়তীতে ছাপা হয় এরূপ—

তোমার বিরহে গো আমি
কাঁদি মোমের বাতির চেয়ে।
আরক্তধার অশ্রু ঝরে
নদের কুঁজোর মতো বেয়ে।

পান-পেয়ালার মতো আমি,
হৃদয় যখন কৃপণ হেরি
দূর বাঁশরির বিলাপ শুনে,
রক্ত ধারায় উঠি ছেয়ে॥

৩২, ৪১ ও ৫৩-সংখ্যক ৩টি রুবাইও গ্রন্থে সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন : 'হাফিজের সমস্ত কাব্য 'শাখ-ই-নবাত' নামক কোনো ইরানি সুন্দরীর স্তবগানে মুখরিত।' ১৩৩৭ আষাঢ়ের 'সওগাতে' নজরুল ইসলাম 'শাখ-ই-নবাত' আখ্যায় একটি সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন ; আখ্যার নীচে বন্ধনীর মধ্যে বলেন :

> 'শাখ-ই-নবাত' বুলবুল-ই-শিরাজ কবি হাফিজের মানসী প্রিয়া ছিলেন।
> 'শাখ-ই-নবাত' অর্থ 'আঁখের শাখা'।

কবিতাটির প্রথম শ্লোক—

শাখ-ই-নবাত ! শাখ-ই-নবাত ! মিষ্টি রসাল 'ইক্ষু-শাখা' !
বুলবুলির গান শেখাল তোমার আঁখি সুর্মা-মাখা'।

গ্রন্থের মুখবন্ধে নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন : 'বাঙলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন।' পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন :

'কথিত আছে, বাঙলার কোন শাসনকর্তা হাফিজকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।'

বাঙলার স্বাধীন সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (রাজত্বকাল : ১৩৮৯–১৪১০) যে-সালে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠান, বোধ হয় তাহা হাফিজের জীবনের অন্তিম-সাল। হাফিজ তাঁহার একটি গজলে এই আমন্ত্রণের উল্লেখ করিয়াছেন এভাবে—

হাফিজ যে শওক মজলিশে সুলতানে গিয়াস-দীন
খামুশ মশও কেঃ কারে তু আয নালঃ মিয়াওয়াদ॥

হাফিজ, সুলতান গিয়াস-উদ্-দীনের দরবারে যাওয়ার আগ্রহ
স্তব্ধ রেখো না ; কেননা তোমার কাজ হচ্ছে আহাজারি থেকে যাওয়া॥

পু ন শ্চ

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ প্রথম সংস্করণের শেষে নিম্নলিখিত শব্দার্থমালা মুদ্রিত হয় :

চন্দ্রবিন্দু

'চন্দ্রবিন্দু' প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার বইখানির প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া উহার সমস্ত কপি বাজেয়াফ্‌ত্ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

'তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী', ১৩৩৭ কার্তিক-অগ্রহায়ণের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়।

'কারা-পাষাণ ভেদি জাগো', পূজা-দেউলে মুরারি শঙ্খ নাহি বাজে' এবং 'নাহি ভয় নাহি ভয়' ১৩৩৭ পৌষ-মাঘের জয়তীতে 'কারাগার-এর গান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'কারাগার' শ্রীমন্মথ রায়ের লেখা মঞ্চাভিনীত নাটক।

'জাগো হে রুদ্র জাগো রুদ্রাণী' পূর্ববর্তী 'প্রলয়-শিখা' কাব্যে 'গান' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু' ১৩৩৭ ফাল্গুন-চৈত্রের এবং 'হিতে বিপরীত' ১৩৩৭ শ্রাবণের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়।

'বক্ষে আমার কাবার ছবি' গানটি হিজ মাস্টার্‌স্ ভয়েস্ রেকর্ডে সুররূপ দিয়াছেন মরহুম মোহাম্মদ কাসেম মল্লিক।

পু ন শ্চ

চন্দ্রবিন্দু সেপ্টেম্বর ১৯৩১এ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ ১৯৩১ এর ১৪ অক্টোবর বাজেয়াফ্‌ত হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর ১৯৪৬ (ফাল্গুন ১৩৫২) সালে 'চন্দ্রবিন্দু'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : মঈনউদ্‌দীন হোসয়ন, বি.এ., নূর লাইব্রেরি, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা। মুদ্রাকর : তেজেন্দ্রনাথ সরকার ক্লাসিক প্রেস, ২১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮+১১, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

'সর্দা-বিল' কবিতাটি *নজরুল-গীতিকার* অন্তর্ভুক্ত 'সারদা-আইন' গানের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ।

*নজরুল-রচনাবলী*তে *চন্দ্রবিন্দু* দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

সুর-সাকী

১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসে 'সুর-সাকী' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স, মানিকতলা স্পার, কলিকাতা। মুদ্রাকর : শ্রীক্ষেত্রমোহন দালাল, কালিকা প্রেস, ২১ নং নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। ৮+১০৪ পৃষ্ঠা ; দাম দেড় টাকা।

'গানগুলি মোর আহত পাখির সম' এবং 'প্রিয় তুমি কোথায় আজি' ১৩৩৮ বৈশাখ-আষাঢ়ের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়। প্রথম গানটির অন্তরার শেষাংশ 'জয়তী'তে ছাপা হইয়াছিল নিম্নরূপ—

তোমার চরণে লভিবে মরণ
সুন্দর অনুপম॥

'কত সে জনম কত সে লোক' ১৩৩৮ আষাঢ়ের 'উত্তরা'য় বাহির হয়। গানটির শেষ কলি 'উত্তরা'য় ছাপা হইয়াছিল এরূপ—

কত আশা আছে কত সে সাধ
অভিমানী, তাহে সেধো না বাদ।
না মিটিতে সাধ, স্বপন-চাঁদ
মিলনের রাতি করো না ভোর॥

'কে দুয়ারে এলে মোর তরুণী ভিখারী' ১৩৩৮ সালের বার্ষিক 'প্রাতিকা'য় প্রকাশিত হয়।

'কত আর এ মন্দির-দ্বার' ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' স্বরলিপিসহ বাহির হয়।

'নিরালা কানন-পথ', 'এল ফুলের মরশুম' ও 'প্রিয় তব গলে দোলে' গীতিত্রয় ১৩৩৯ বৈশাখের 'জয়তী'তে গজল-গুচ্ছ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

১৮ ও ৬৩-সংখ্যক দুইটি গান ('আজি দোল-ফাগুনের দোল লেগেছে') অভিন্ন। কেবল অন্তরার প্রথম চরণে 'তরুর' স্থানে অপরটিতে আছে 'পাতার'।

'বিরহের ফুলবাগে মোর' ১৩৩৯ শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' বাহির হয়।

'তুমি কোন পথে এলে হে মায়াবী কবি' ১৩৩৮ শ্রাবণ-আশ্বিনের 'জয়তী'তে এবং ১৩৩৮ আশ্বিনের 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৮ সালের ৬ই ভাদ্র কলিকাতা বেলঘরিয়ায় রসচক্র সাহিত্য-সংসদের উদ্যোগে পরলোকগত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সম্বর্ধনা উপলক্ষে এক উদ্যান-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে নজরুল ইসলাম এই কীর্তনটি গাহিয়া 'অগ্রজোপম' কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন।

'থাক সুন্দর ভুল আমার' ১৩৩৮ সালে বার্ষিকী 'প্রাতিকা'য় বাহির হয় ; তাহাতে গানটির অস্থায়ী ছাপা হয় নিম্নপ্রকার—

> থাক সুন্দর মিথ্যা আমার
> ছলনা মধুর তব মন।
> মিথ্যা করিয়া 'ভালোবাসি' বলে
> দিও গো মিথ্যা হরষণ॥

'আজিকে তনু-মনে লেগেছে রং' এবং 'কে এলে গো চির-চেনা অতিথি' ১৩৩৮ কার্তিক-পৌষের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়।

'সাত ভাই চম্পা জাগো রে' ১৩৪০ ভাদ্রের 'বুলবুল' পত্রিকায় বাহির হয়।

জুলফিকার

১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে 'জুলফিকার' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : বি. দোজা, এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা 'শ্রীরাম প্রেস' হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাচস্পতি দ্বারা মুদ্রিত। ৫৬ পৃষ্ঠা ; মূল্য—এক টাকা।

'খুশি লয়ে খোশরোজের' ১৩৩৮ মাঘ-চৈত্রের, 'তোমারি মহিমা সব বিশ্বপালক করতার' ১৩৩৯ বৈশাখের 'দেখে যা রে দুলা-সাজে' ও 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে' ১৩৩৮ কার্তিক-পৌষের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়।

'আয় মরু-পারের হাওয়া' ১৩৩৯ আশ্বিনের মাসিক মোহাম্মদীতে বাহির হয়।

'খুশি লয়ে খোশরোজের' এবং 'আয় মরু-পারের হাওয়া' মরহুম মোহাম্মদ কাসেম মল্লিক কলিকাতায় হিজ মাস্টারস্ ভয়েসে রেকর্ড করেন।

এই গীতিগ্রন্থের ১, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৮ ও ১৯ সংখ্যক গজলগুলি মরহুম আব্বাসউদ্দীন আহমদ রেকর্ড করেন। কিন্তু রেকর্ডে 'মোহর্‌রমের চাঁদ এল ঐ' গজলটির তৃতীয় কলি, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে' গজলটির ৫ম ও ৭ম কলি এবং 'সাহারাতে ফুট্‌ল রে রঙিন গুলে-লালা' গজলটির ৪র্থ কলি বিধৃত হয় নাই। 'আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি ভয়' গজলটির শেষ কলি রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে এভাবে—

> আরব মেসের চীন হিন্দ কুল-মুসলিম জাহান মোর ভাই।
> কেহ নয় উচ্চ কেহ নীচ, মানুষ সমান সবাই।
> এক জাতি এক দিল এক প্রাণ আমির ফকিরে ভেদ নাই।
> এক তক্‌বীরে জেগে উঠি, আমার হবেই হবে জয়॥
>
> —[আব্বাসউদ্দীনের গান : ২য় সংস্করণ, ১৪ পৃ:]

আলেয়া

১৩৩৮ সালের ৩রা পৌষ তারিখে কলিকাতার 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গমঞ্চে 'আলেয়া' প্রথম অভিনীত হয়। পরে ঐ সালেই 'আলেয়া' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ : ডি. এম. লাইব্রেরি ; ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। মুদ্রাকর : শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। ৮+৭২ পৃষ্ঠা ; দাম এক টাকা।

১৩৩৬ আষাঢ়ের 'কল্লোল' পত্রিকার 'সাহিত্য-সংবাদ' বিভাগে বলা হইয়াছে :

> 'নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'মরুতৃষ্ণা'। সম্প্রতি তার নাম বদলে 'আলেয়া' নামকরণ হয়েছে। গীতি-নাট্যখানি সম্ভবত মনোমোহনে অভিনীত হবে। এতে গান আছে ত্রিশখানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশা করি এ অপেরাখানি জনসাধারণের মন হরণ করবে।'

কিন্তু 'আলোয়া' গীতিনাট্যে আছে মোট ২৮টি গান।—'আলেয়ার গান' শিরোনামে ১৩৩৮ কার্তিক-পৌষের 'জয়তী'তে ছাপা হইয়াছিল এই ৬টি গান : (১) 'ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙাতে কি', (২) 'দুলে আলো-শতদল ঝলমল ঝলমল', (৩) 'আজিকে তনু-মনে লেগেছে রং', (৪) 'কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে', (৫) 'কেন রঙিন নেশায় মোরে রাঙালে' ও (৬) 'কে এলে গো চির-চেনা অতিথি দ্বারে মম।' মনে হয়, ৩, ৪ ও ৬-সংখ্যক ৩টি গান পরে পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত পরিমার্জনকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

'আলেয়া' নাটকের গান : 'বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধব গো' ও 'জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা' ১৩৩৭ বৈশাখের এবং 'নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল' ১৩৩৮ শ্রাবণ-আশ্বিনের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩৩৭ শ্রাবণের 'সওগাতে' এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়—

> 'আগামী বর্ষে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মায়ামৃগ' উপন্যাস ধারাবাহিকরূপ বাহির হইবে।'

'মরুতৃষ্ণা' গীতিনাটিকা ভ্রমক্রমে 'মায়ামৃগ' উপন্যাস বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল কিনা, কে বলিবে?

১৩৩৮ আষাঢ়ের ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 'স্বদেশ'-এ ঘোষণা করা হইয়াছিল :

> 'আগামী সংখ্যায় কবি নজরুল ইসলামের গীতিনাট্য 'আলোয়া' আরম্ভ হইবে।'

কিন্তু 'আলেয়া' কোনো সাময়িকপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই।

শিউলিমালা

১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসে 'শিউলিমালা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি ; ৬১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। মুদ্রাকর : শ্রীশশিভূষণ পাল, মেটকাফ প্রেস, ১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, কলিকাতা। ১১২ পৃষ্ঠা ; মূল্য এক টাকা। 'পদ্ম-গোখরো' মেটকাফ প্রেস-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দুন্দুভি'তে পত্রস্থ হয়।

'জিনের বাদশা' ১৩৩৭ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের, 'অগ্নিগিরি' ১৩৩৭ আষাঢ়ের এবং 'শিউলিমালা' ১৩৩৭ শ্রাবণের 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়।

'অগ্নিগিরি' ও শিউলিমালা' সম্বন্ধে পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-পরিচিতি' নামক পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত মৎলিখিত 'কবির জীবন-কথা' ও 'নজরুলের ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বলা হইয়াছে—

> 'নজরুলের 'অগ্নিগিরি নামক সুবিখ্যাত গল্পে বীররামপুর গ্রামের উল্লেখ আছে ; বোধ হয় 'দরিরামপুর' নামটিই গল্পে বীররামপুর হয়েছে। ...
>
> 'নজরুল কৈশোরে মৈমনসিংহের দরিরামপুর গ্রামে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন ; তাঁর তৎকালীন জীবনের যৎকিঞ্চিৎ ছায়া এ গল্পে আছে—এ তথ্য তাঁরই মুখে একদা শুনেছিলাম...।
>
> '১৯২৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নজরুল ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ; ... সে-সময় অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ঘটে ; সেই সৌহার্দ্যের স্মৃতি তাঁর সুবিখ্যাত 'শিউলিমালা' গল্পে কিছু ছায়া ফেলেছে।'
>
> —[নজরুল পরিচিতি ; তৃতীয় সংস্করণ, ৩, ৮৩ ও ১৬ পৃঃ]

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯	১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।
১৯০৮	পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।
১৯০৯	গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।
১৯১১	মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।
১৯১২	স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।
১৯১৪	কাজী রফিজউল্লাহ্র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।
১৯১৫-১৭	রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।
১৯১৭-১৯	সৈনিক জীবন, প্রধানত, করাচিতে গন্জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।
১৯২০	মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফ্তরে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম

ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন, মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা গমন, কান্দির পাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা গমন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর

মাসে 'অগ্নি–বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক।'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, শনিবারের চিঠিতে নজরুল–বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'–এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু–মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল–পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী

হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ', প্রবন্ধ 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইব্রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মিস্ ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহি সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ ও কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে মুক্তি। কবির প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশ-গ্রহণ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৩ গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

১৯৩৪ গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার সভাপতিত্ব।
ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃসরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

সৈয়দ বদরুদ্দোজা
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে কবি ও কবিপত্নীকে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন প্রেরণ। মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক্ ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের মৃত্যু যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির অসুস্থতার সপ্তবিংশ বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্‌শান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না— সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে কবির জাতীয় পতাকা শোভিত মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির

মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮–২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।
পুবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণার-বিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ--'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ—'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ—'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়–শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

কুহেলিকা — উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।

নজরুল–স্বরলিপি — স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১।

চন্দ্রবিন্দু — গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।

শিউলিমালা — গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।

আলেয়া — গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট–নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।

সুরসাকী — গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।

বন–গীতি — গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।

জুলফিকার — গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।

পুতুলের বিয়ে — ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।

গুল–বাগিচা — গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'

কাব্য–আমপারা — অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে–নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।

গীতি–শতদল — গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।

সুরলিপি — স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।

সুরমুকুর — স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।

গানের মালা — গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

নজরুলের 'ধূমকেতু'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের 'লাঙল'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। হরফ প্রকাশনী কলকাতা।

'নজরুল-রচনাবলী'-তে অন্তর্ভুক্ত গানের বাণীর সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর পাঠান্তর

নজরুল-সঙ্গীতের কোনো কোনো বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তেও এই ধরনের পার্থক্য পাওয়া যায়। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত এবং নজরুল অনুমোদিত নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে না মিলানোর দরুন এবং নজরুলের গানের বইয়ে ও পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বাণীর উপর নির্ভর করার ফলে কোথা কোথাও এই পার্থক্য ও বাণীর পাঠান্তর রয়ে গেছে। 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশিত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর যে পার্থক্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে তা নীচে 'নজরুল-রচনাবলী' থেকে এবং নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী থেকে যতদূর সম্ভব পাশাপাশি তুলে ধরে দেখানো হলো। এই তুলনামূলক বিষয়টি দেখানো হয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত বিভিন্ন নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ এবং 'আদি গ্রামোফোন রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন' শীর্ষক গ্রন্থের ভিত্তিতে।

নজরুল-সঙ্গীত গ্রন্থ 'সুর-সাকী'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর	বাণীর পার্থক্য
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূরে	প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূরে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূরে (রেকর্ডে গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং TWINFT 865 শিল্পী : মিস মানিক মালা নিম্নোক্ত দুটি স্তবক আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই : ১. 'ছিনু অচেতন বেদনা পিয়ে জাগালে সোনার পরশ দিয়ে জাগিনু যখন ভেঙেছে স্বপন প্রিয় তুমি নাই ঝুরিতেছে সুর।' ২. 'কাঁদি মোরা একূল ও-কূল মাঝে বহে স্রোত বিরহ বিপুল নাহি পারাপার, বেদনা বিথার কাঁদন-পাথর লুটায় ব্যথাতুর।'	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে : 'কাহারবা'/'সুর-সাকী' গ্রন্থে 'পিলু-কার্ফা'

১	২	৩	৪
২. বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ	বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	‘বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ’ (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.P 71743 শিল্পী : মিস্ আঙ্গুর বালা আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : ‘ধরণীর প্রেম কুসুম-প্রায় ফুটিয়া নিমেষে শুকায়ে যায় সে ফুলে যে মালা গাঁথিতে চায় তার চোখে চির-অশ্রু ধার’	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ‘মিশ্র ভীম পলশ্রী – একতাল’ ‘সুর-সাকী’ গীতি-গ্রন্থে ‘ভীম পলশ্রী–একতালা।’
৩. আজি গানে গানে ঢাকব আমার	‘আজি গানে গানে ঢাকব আমার’ (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	‘আজি গানে গানে ঢাকব আমার’ (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : ‘আমার সুরের ঝর্ণা তীরে রচব গানের উর্বশীরে তুমি সেই সুরেরই ঝর্ণাধারায় উঠবে করে স্নান’	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ‘পিলু খাম্বাজ–কাহারবা’ ‘সুর-সাকী’ গীতি-গ্রন্থে ‘পিলু খাম্বাজ–কার্ফা’

১	২	৩	৪
৪. আমার নয়নে নয়ন রাখি	'আমার নয়নে নয়ন রাখি' 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা দুই)	'আমার নয়নে নয়ন রাখি' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং TWIN 2357 শিল্পী : মিস বীণা পাণি রেকর্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'আমারে কর গুণী, তোমার বীণা, কাঁদিব সুরে সুরে কণ্ঠ-লীনা, আমার মুখের মুকুরে কবি হেরিতে চাহ কোন মানসীর ছবি। চাহ যদি-মোরে কর গো চন্দন তপ্ত তনু তব শীতল করিও।'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থে 'মালশ্রী মিশ্র-কার্ফা'

১	২	৩	৪
৫. নিরালা কানন-পথে কে তুমি একেলা	'নিরালা কানন-পথে কে তুমি একেলা' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'নিরালা কানন-পথে কে তুমি একেলা' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'সুর সাকী' গীতি গ্রন্থের কয়েকটি চরণ গ্রামোফোন রেকর্ডে ভিন্নরূপ। যেমন : রেকর্ডে 'ওগো চলিবে বলি' বনতল ফুলেরা পরাগে রাঙায়', 'চলিয়া যেয়োনা যেয়োনা বলি' লতারা চরণে জড়ায়, 'রোধিতে কন্টক-তরু, আঁচল ছাড়িতে না চায়।' উপরোক্ত পংক্তিগুলো 'সুর-সাকী'তে নিম্নরূপ : 'চলিবে বলি' পথতল ফুলেরা রাঙায়' 'চলিয়া যেয়োনা বলি লতারা চরণে জড়ায়' 'টানিছে কন্টক তরু, আঁচল ছাড়িতে না চায়।'	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' 'সুর-সাকী' গ্রন্থে 'পিলু মিশ্র-লাউনী'

১	২	৩	৪
৬. গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়	গোল্যব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায় (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায় (গানের স্তবক সংখ্যা চার) আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'হাসির যে ফূর্তি ওড়ায় তার চোখের জলের দেনা হিসাব করিয়া কে দেখে, হায় তুমি বুঝিবেনা বুকের ক্ষত তাই লুকাই পরি' রাঙা ফুলের মালা।' রেকর্ড নং N. 7054 শিল্পী : ধীরেন দাস	'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থে 'পিলু মিশ্র-কার্ফা'

১	২	৩	৪
৭. সই ভালো করে বিনোদ-বেণী বাঁধিয়া দে	সই ভালো করে বিনোদ-বেণী বাঁধিয়া দে (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থে গানের বাণী : 'সই ভালো করে বিনোদ-বেণী বাঁধিয়া দে মোর বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুণী ফাঁদে॥ সই চপল পুরুষ সে, তাই কুরুশ কাঁটায় রাখিব খোঁপার সাথে বিঁধিয়া লো তায়। তাহে রেশমি জাল বিছায়ে দে ধরিতে চাঁদে। বাঁধিতে সে বাঁধন-হারা বনের হরিণ, জড়ায়ে দে জরীণ ফিতা মোহন ছাঁদে। প্রথম প্রণয়-রাগের মত আলতা রঙে রাঙায়ে দে চরণ মোর এমনি ঢঙে পায়ে ধরে বঁধূ যেন আমারে সাধে।	সই ভালো করে বিনোদ-বেণী বাঁধিয়া দে (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং TWIN 2316 শিল্পী : মিস্ বীণা পাণি আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে গানের বাণী : 'সই ভালো করে বিনোদ-বেণী বাঁধিয়া দে মোর বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুনী ফাঁদে। সই বাঁধিতে সে বাঁধন-হারা বনের হরিণ জড়িয়ে দে জরীণ-ফিতা মোহন ছাঁদে। সই চপল পুরুষ সে তাই কুরুষ কাঁটায় রাখিব খোঁপারি সাথে বিঁধিয়া লো তায়। তাহে রেশমি জাল বিছায়ে দে ধরিতে চাঁদে। প্রথম প্রণয় রাগের মত আলতা রঙে রাঙায়ে দে চরণ মোর এমনি ঢঙে পায় ধরে চোরা যেন আমারে সাধে।	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা" 'সুর-সাকী' গ্রন্থে 'সিন্ধু-কার্ফা'

১	২	৩	৪
৮. বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ	'বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ' (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং TWIN FT 2288 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ রেকর্ডে : 'মরণ আজ মধুর হলো পেয়ে তব চরণ রাতুল' পংক্তিটি দ্বিতীয় স্তবকের শেষে। 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থে উক্ত 'মরণ আজ মধুর হলো পেয়ে তব চরণ রাতুল' পংক্তিটি তৃতীয় স্তবকের শেষে।	রেকর্ডে 'তেওড়া' 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থে 'পাহাড়ী মিশ্র-রূপক'
৯. ভুলিতে পারিনে তাই	ভুলিতে পারিনে তাই (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	ভুলিতে পারিনে তাই (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং TWIN FT 2288 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'চাহ মোর মুখ প্রিয়, এসো গো আরও কাছে হয়ত সেদিনের স্মৃতি তব নয়নে আছে হয়ত সেদিনের মতই প্রাণ উঠবে আকুলি।'	রেকর্ডে 'দাদরা' 'সুর-সাকী' গীতি গ্রন্থে 'গৌড় সারং-দাদ্‌রা'

১	২	৩	৪
১০. আয় গোপিণী খেলবি হোরী	আয় গোপিণী খেলবি হোরী (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	আয় গোপিণী খেলবি হোরী (গ্যানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N. 11762 শিল্পী : মিস ইন্দু বালা	রেকর্ডে 'দাদরা' 'সুর–সাকী' গীতি–গ্রন্থে 'ধাণী–হোরী'
১১. শ্যামের সাথে চল সখি খেলি সবে হোরী	শ্যামের সাথে চল সখি খেলি সবে হোরী (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) নিম্নোক্ত স্তবকটি 'নজরুল–রচনাবলী'র অন্তর্গত 'সুর–সাকী' গীতি–গ্রন্থে নেই : 'আগুন–রাঙা ফুলে ফাগুন লাগে লাল কৃষ্ণচূড়ার পাশে অশোক গালে–গাল। আকুল করে ডাকি' বকুল বনের পাখি, যমুনার জল লাল হল আজ আবির, ফাগের রঙে ভরি।	শ্যামের সাথে চল সখি খেলি সবে হোরী (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং N. 7043 শিল্পী : মানিক মালা গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি আছে : 'আগুন রাঙা ফুলে ফাগুন লাগে লাল কৃষ্ণ–চূড়ার পাশে অশোক গালে–গাল আকুল করে ডাকি' বকুল বনের পাখি যমুনার জল লাল হল আজ আবির, ফাগের রঙে ভরি'	রেকর্ডে : রাগ–পিলু 'সুর–সাকী: গ্রন্থে 'পিলু–হোরী'

১	২	৩	৪
১২. একেলা গোরী জলকে চলে গঙ্গাতীর	'একেলা গোরী জলকে চলে গঙ্গাতীর' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থে নিম্নোক্ত দুটি পংক্তি শেষ-স্তবকে রয়েছে : 'রাঙা উষার রাঙা সতীন পথ-ভোলা ছন্দ কবির'	'একেলা গোরী জলকে চলে গঙ্গাতীর' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং FT 2218 শিল্পী : উষা রাণী রেকর্ডে নিম্নোক্ত দুটি পংক্তি নেই : 'রাঙা উষার রাঙা সতীন পথ-ভোলা ছন্দ কবির'	রেকর্ডে 'জৌনপুরী-দাদ্‌রা' 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থেও 'জৌনপুরী-দাদ্‌রা'
১৩. ও-কূল-ভাঙা নদীরে	'ও কূল-ভাঙা নদীরে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'ও কূল-ভাঙা নদীরে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N 7261 শিল্পী : গোপাল চন্দ্র সেন (অন্ধ-গায়ক) রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'তোর জোয়ার সাগর ঠেলে ফেলে দেয় তবু ভাটির স্রোতে তুই ফিরে ফিরে যাসরে নদী সেই সাগরের পথে নদী তেমনি অবুঝ আমারো মন তোরই পিছে ফিরে।'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'সুর-সাকী' গীতি-গ্রন্থে 'ভাটিয়ালি-কার্ফা'

১	২	৩	৪
১৪. না মিটিতে মনোসাধ	'না মিটিতে মনোসাধ' (গানের স্তবক সংখ্যা আট)	'না মিটিতে মনোসাধ' (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) রেকর্ড নং TWIN FT 861 শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী গীতি-গ্রন্থ 'সুর-সাকী'র অন্তর্গত নিম্নোক্ত স্তবকগুলো 'নজরুল-রচনাবলী'তে আছে, কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই : ১. 'তারে বুঝালে বুঝে না ধৈরয নাহি বাঁধে হে। তারে ত্যাজিয়া যাইবে শ্যাম কোন্ অপরাধে হে॥ সে যে নয়ন মেলিতে হেরে তুমি ময় সবি হে, হেরে নয়ন মুদিলে শ্যাম তোমারি সে ছবি হে রহি সুনীল গগন-তলে ভুলিবে সে কোন ছলে ও সুনীল রূপ অভিরাম। রহি শ্যামল ধরার কোলে ভুলিবে সে কোন ছলে ও শ্যামল রূপ অভিরাম। ২. 'না শুনে তা রসময় যেয়োনা হে অসময়	রেকর্ডে 'তাল-ফেরতা' 'সুর-সাকী'তে 'কীর্তন'

১	২	৩	৪
		অভিমান থাকে যদি মনে, যে কথা মুখে না বলে হের তা চোখের জলে বিদায়ে হের গো, যাহা পেলে না মিলনে।' ৩. 'মোরা নিজেরে নিজেই ছলতে পারি মুখে তবু বলতে নারি' ৪. 'কাঁদিসনে যমুনা নদী শুকাইয়া শোকে, বাঁচিয়া রহিবে লো তুই শ্রী রাধার চোখে। সেথা বইবি উজান, তুই রাধার চোখে বইবি উজান তার দুই নয়নের দুকূল ছেপে বক্ষ ব্যাপে বইবি উজান বইবি উজান শুনিবি দু-কূলে রোদন শ্যাম শ্যাম নাম।'	

১	২	৩	৪
১৫. যে ব্যথায় অন্তরতল হে প্রিয়	'যে ব্যথায় অন্তরতল হে প্রিয়' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত নিম্নোক্ত স্তবকটি 'নজরুল–রচনাবলী'র অন্তর্গত 'সুর–সাকী' গীতি–গ্রন্থে নেই : 'আলোর লাগি জাগে ফুল নদী ধায় সাগরে যেমন, চকোর চায় চাঁদ, চাতক মেঘ। যারে চায় তায় চাহে এই রে মন। নিয়ে যায় সুদূর অমরায় পূজে তায় বাণী–দেউলে।'	'যে ব্যথায় অন্তরতল হে প্রিয়' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং TWIN F.T 2287 শিল্পী : ধীরেন্দ্র নাথ দাস গ্রামোফোন রেকর্ডে 'নজরুল–রচনাবলী'র অন্তর্গত 'সুর–সাকী' গ্রন্থের নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'আমার হৃদি যারে চায় নিয়ে যায় তারে অমরায়, পূজি তায়, হে সুন্দর মোর নিশিদিন বাণী দেউলে॥'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'সুর–সাকী' গীতি–গ্রন্থে 'ভীমপলশ্রী–কাওয়ালি'
১৬. আজ ভারতের নব আগমনী জাগিয়া উঠেছে মহাশশ্মান	'আজ ভারতের নব আগমনী জাগিয়া উঠেছে মহাশশ্মান' 'সুর–সাকী' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত। উক্ত 'সুর–সাকী' গ্রন্থে একটি পংক্তি : 'জাগরণী গায় প্রভাতের পাখি মরুতে বসেছে ফুল–বাথানে' গ্রামোফোন রেকর্ডে উক্ত পংক্তিটি : 'জাগরণী গায় প্রভাতের পাখী ফুলে ফুলে হাসে গোরস্থান।'	'আজ ভারতের নব আগমনী জাগিয়া উঠেছে মহাশশ্মান' রেকর্ড নং MEGAPHONE NG 26 শিল্পী : ধীরেন্দ্র নাথ দাস রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'ধ্যানের ভারত নবরূপ ধরে গড়িয়া উঠিছে গৌরব ভরে, বিদূরিত হবে বিশ্বে এবার হিংসো–দ্বন্দ্ব অকল্যাণ।'	রেকর্ডে 'দাদ্‌রা' 'সুর–সাকী' গ্রন্থে 'ভৈরবী–দাদ্‌রা'

বি. দ্র. : শত সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ভুল–ত্রুটি ঘটে থাকতে পারে। গানের বইয়ে এর গানের রেকর্ডে ও স্বরলিপি–গ্রন্থে বাণীর স্তবক–বিন্যাসে পার্থক্য আছে। এখানে স্বল্প–পরিসরে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

চন্দ্রবিন্দু
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৫২
নূর লাইব্রেরী পাবলিশার্স
১২/১, সারেঙ্গ লেন, কলকাতা

পাঠভেদ

১। গানের প্রথম পংক্তি : 'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা,
মূল বই 'চন্দ্রবিন্দু'র নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো
'নজরুল-গীতিকা'য় নেই :

কোরাস :

'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ, নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

২। কবিতার নাম 'প্যাক্ট
মূল বইয়ে আছে :
'লাগিল হেঁচ্‌কা হেঁইয়ো হাঁইয়ো
টিকি-দাড়ি ওড়ে শূন্যে—,
'নজরুল-গীতিকা'য় আছে :
'লাগে টানাটানি হেঁইয়ো হাঁইয়ো, টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,

উপরোক্ত পংক্তি 'নজরুল-গীতিকায় সংযোজিত হয়েছে

নজরুলের গানের বই 'জুলফিকার'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর
গানের প্রথম পংক্তি	গানের প্রথম পংক্তি	গানের প্রথম পংক্তি	৪
১. খুশি লয়ে খোশরোজের আয় খেয়ালী খোশ-নসীব	খুশি লয়ে খোশরোজের আয় খেয়ালী খোশ-নসীব (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল-রচনাবলী'তে নিম্নোক্ত কথাগুলো রয়েছে : 'খোদার হবিব শেষ নবী, তুই হবি নবীর হবিব॥'	খুশি লয়ে খোশরোজের আয় খেয়ালী খোশ-নসীব (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং এন. ৭০২৭ শিল্পী : মহম্মদ কাশেম	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত কথাগুলো নেই : 'খোদার হবিব শেষ নবী, তুই হবি নবীর হবিব॥' উপরোক্ত কথাগুলোর বদলে রেকর্ডে আছে : 'রোজ হাশরে করবেন পার, মেহেরবান খোদার হাবিব।'
২. মোহ্‌রমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়া।	মোহ্‌রমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়া। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	মোহ্‌রমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়া। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং TWIN. 2595 শিল্পী, আব্বাসউদ্দীন আহমদ	
৩. ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।	ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং এন. ৪১১১ শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক) 'যাঁরা জীবন ভরে রাখছে রোজা নিত-উপবাসী সেই গরীব এতিম মিসকিনে দে যা কিছু মফিদ॥' খ) 'তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে প্রেমেরি মসজিদ॥'

১	২	৩	৪
৪. সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা।	সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং F.T.3217 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	নজরুল–সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : 'সেই ফুলেরি গুলিস্তানে আসে লাখো পাখি, সে ফুলেরে ধরতে বুকে দোলেরে ডাল–পালা।'
৫. দেখে যারে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী	দেখে যারে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	দেখে যারে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং এন. ৪	নজরুল–সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : 'মেরাজের পথে হজরত যান চড়ে ঐ বোরাকে, আয় কলেমা শাহাদতের যৌতুক দিয়ে তাঁর চরণ ছোঁবি
৬. আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়	আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয় (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয় (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) রেকর্ড নং এন. ৭১০৯ শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	নজরুল–সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক) 'আরব মেসের চীন হিন্দ্ মুসলিম জাহা মোর ভাই, কেহ নয় উচ্চ কেহ নীচ, এখানে সমান সবাই।' খ) 'এক দেহ এক দিল্ এক প্রাণ আমির ফকির এক সমান, এক তকবিরে উঠি জেগে, আমার হবে হবে জয়।'

১	২	৩	৪
৭. ইসলামের ঐ সওদা লয়ে	ইসলামের ঐ সওদা লয়ে (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	ইসলামের ঐ সওদা লয়ে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং এন. ৪১১১ শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : 'কলেমার ঐ কানাকড়ির বদলে দেয় এই বণিক শাফায়াতের সাত রাজার ধন, কে নিবি আয় ত্বরা কর॥'
৮. আহমদের ঐ মিমের পর্দা	আহমদের ঐ মিমের পর্দা (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল-রচনাবলী'তে গানের শেষ স্তবকটি নিম্নরূপ : 'তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস চিন্‌বি খোদাকে, তোর রুহানী আয়নাতে দেখরে সেই নূরী রওশান॥'	আহমদের ঐ মিমের পর্দা (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 4198 শিল্পী : ফখরে আলম কাওয়াল	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে শেষ স্তবকটি নিম্নরূপ : তুই খোদাকে যদি চিনতে পারিস চিনবে খোদাকে তুই দেখরে তাই তারি চোখে সেই নূরী রওশন

১	২	৩	৪
৯. খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে	খোদার প্রেমের সরাব পিয়ে (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	খোদার প্রেমের সরাব পিয়ে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং F.T. 3217 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : 'পুড়ে মরার ভয় না রাখে, পতঙ্গ আগুনে ধায় ; সিন্ধুতে মেটে না তৃষ্ণা, চাতক বারি-বিন্দু চায় ; চকোর চাহে চাঁদের সুধা, চাঁদ সে আসমানে কোথায় ; সুরুয থাকে কোন সুদূরে সূর্যমুখী তারেই চায় ; তেমনি আমি চাহি, খোদায়, চাহি না হিসাব করে।'

১০. রাখিসনে ধরিয়া মোরে	রাখিসনে ধরিয়া মোরে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল-রচনাবলী'তে আছে: ক) 'যে দেশের পাহাড়ে মুসা দেখিল খোদার জ্যোতি যাব রে যাব সেইখানে রবোনা পড়িয়া হেথায়।' খ) 'যে দেশের বাতাসে আছে নবীজির দেহের খোশবু যে দেশের মাটিতে আছে নবীজির দেহ মিশে হায়।'	রাখিসনে ধরিয়া মোরে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং এফ.টি ২২৯১ শিল্পী : তকরিমুদ্দীন আহমদ	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে দুটি স্তবক নিম্নরূপ : ক) 'যে দেশে পাহাড়ে মুসা দেখিল খোদার জ্যোতি, রব না দারুল হরবে যেতে দে যেতে দে সেথায়॥' খ) 'যে দেশের মাটিতে আছে নবীজির মাজার শরিফ নবীজীর দেহের পুষ্প ভাসে রে যে দেশের হাওয়ায়।' [দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। সম্পাদনায় : আবদুল আজীজ আল আমান, পরিমার্জিত সংস্করণের সম্পাদক : ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, ২০০৪]
১১. কে এলে মোর ব্যথার গানে	কে এলে মোর ব্যথার গানে (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	কে এলে মোর ব্যথার গানে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং এইচ.এম.ভি. ৪১৮৭ শিল্পী : ধীরেন দাস	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম গান গেয়ে কি ভেঙেছি ঘুম, তোমার ব্যথার শীথ নিঝুম হেরে কি মোর গানের স্বপন।'

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ই

উ

এ

ঢ

ত

থ

প

ফ

ব

য

র

ল

শ